৫১ পীঠ



হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সত্যের সন্ধানে

৫১ পীঠ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

৪৫০

দীপ প্রকাশন
১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩


Scanned By
Daenerys
Mother of
Dragons

51 PITH

by

Himansu Chattopadhyay

ছবি

সিন্‌হা স্টুডিও, সাঁইথিয়া

কিছুক্ষণ স্টুডিও, লাভপুর

গোপাল দেবনাথ

ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী

অনির্বাণ সেন

অন্যান্য ছবি : সংগৃহীত

কৃতজ্ঞতা

রাসেদ ইকবাল, বাংলাদেশ

দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, মুর্শিদাবাদ

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেতুগ্রাম

দীপিকা ভট্টাচার্য, কলকাতা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬ ◆ প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

পরিবর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১০

সংযোজিত সংস্করণ ঃ জুন ২০১১

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১২

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

দাম : ১৫০ টাকা

উৎসর্গ

কুলকুণ্ডলিনী নামে একটা অংশ আমাদের শরীরের মধ্যেই থাকে বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যার সন্ধান পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। আমার জ্ঞান হবার পর দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই দুর্লভ বস্তুর সন্ধান করার তাগিদ যিনি আমার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন—

সেই স্নেহময়, বহু দূরদর্শী পিতা
ঁবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়কে

এই পর্যায়ে বই-এর কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না যদি না বাংলাদেশের রাসেদ ইকবাল, মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত দিলীপ ভট্টাচার্য, কেতুগ্রামের কালো মায়ের পুরোহিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

পরিশেষে, আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শঙ্কর মণ্ডলের কাছে। তিনি এই বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে অধরাই থেকে যেত এই গূঢ় তথ্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা।

স্থান : কলকাতা
২১ নভেম্বর, ২০০৯

বিনীত
হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যেদিন শুনেছিলাম একান্নটি সতীপীঠের কথা, সেদিন থেকেই ভাবতে শুরু করেছি সৃষ্টির এই বিচিত্র রহস্য। ১৯৮২ সালে একটি বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম গুয়াহাটিতে। এক পড়ন্ত বিকেলে প্রথম গিয়েছিলাম সতীপীঠ কামাখ্যায়। সেদিন মা-কে স্পর্শ করতেই শিহরণ জেগেছিল সারা শরীরে। বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে মা সেখানে 'স্ব'শরীরে অবস্থিতা। তারও অনেকদিন আগে জানি না কিসের টানে গিয়েছিলাম বীরভূমের কঙ্কালীতলায়। শেষ সতীপীঠ। এখানে নাকি সতীর শেষ দেহখণ্ড কাঁকাল অর্থাৎ কঙ্কাল পড়েছিল। জানি না, এ-সব কথার কোনও ভিত্তি আছে কিনা। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যা শোনা যায়, তার কি কোনও সারবস্তু নেই? আছে বৈকি, তা না হলে আজও কেন অগণিত মানুষ ছুটছে অজানাকে জানা তথা অচেনাকে চেনার সন্ধানে। আমিও একই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছি কয়েক দশক ধরে। সতীপীঠের অনুসন্ধান করার সময় ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে অনেক মানুষের সঙ্গে। সতীপীঠ তথা দেব-দেবীর সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা এতই দৃঢ় যে তা দেখার পর আমার মনও ক্রমশ সংশয়মুক্ত হচ্ছে। সেই বিশ্বাস আর উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করেই এই প্রতিবেদন আমার প্রিয়-পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে নিবেদন করছি।

পীঠ শব্দের অর্থ হল আসন। দেবী যেখানে আসীন সেটিই হল পীঠ। তবে তন্ত্রমতে সবপীঠই সতী-পীঠ নয়। অনেক জায়গায় দেবীর মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছেন অনেক সাধক-সাধিকা। কালক্রমে তা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে খ্যাতিলাভ করেছে। সেইসব জায়গা পীঠ হিসেবে পরিচিতি পেলেও একান্নটি নির্দিষ্ট পীঠের মধ্যে অনেকগুলিই চিহ্নিত হয়নি। কারণ, সেখানে সতীর কোনও অঙ্গ পড়েনি।

দেবী ভাগবতে একশ আটটি পীঠের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু অবশ্যই সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও অঙ্গ পড়েনি। অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করে, কিভাবে তৈরি হয়েছে একান্নটি সতীপীঠ। শোনা যায়, দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের পর তাঁর দেহ কাঁধে (মতান্তরে মাথায়) করে নিয়ে মহাদেব উন্মত্তের মতো সারা পৃথিবী নৃত্য করে বেড়াতে শুরু করলেন। একসময় মনে হল, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে চলে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে ত্রিভুবন। তখন এই মহাপ্রলয়ের হাত থেকে ত্রিভুবনকে রক্ষা করার জন্য সবাই শরণাপন্ন হলেন ভগবান বিষ্ণুর। সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। একসময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটতে থাকেন।

স্বাভাবিক ভাবেই সেইসব খণ্ড ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। এ নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। একটি মত হল, স্বয়ং মহাদেব নাকি তাঁর প্রিয়তমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটার পর তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তরে। মতান্তর যাই হোক না কেন, সতীর দেহের অংশ যেখানে যেখানে

পড়েছে সেখানেই তৈরি হচ্ছে সতীপীঠ। পুরাণে আছে, স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন।

মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে কিন্তু মহাদেবের স্ত্রী সতী দক্ষরাজের মেয়ে হিসাবে বর্ণিত হননি এবং দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগও করেননি। বিজ্ঞজনের মতে, চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের সময়কালে দক্ষযজ্ঞের কথা মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। ব্রহ্ম পুরাণ, মৎসপুরাণ, কর্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণে দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ আছে। দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর দেহত্যাগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, দেবী ভাগবত ও কালিকা পুরাণে।

প্রাচীন তন্ত্রমতে চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। এগুলি হল, জলন্ধর, উড্ডীয়ান বা ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল ও কামরূপ (প্রাণ তোষিণী তন্ত্র)। বৌদ্ধতন্ত্রেও (হে বস্তু তন্ত্র) চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। কোনও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে (সাধনমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৩) জলন্ধরের পরিবর্তে শ্রীহট্ট, বা সিরি হট্টের উল্লেখ করা হয়েছে। তন্ত্রসারের এক জায়গায়, জলন্ধর-কামরূপ-শ্রীহট্ট-উড্ডীয়ান এবং পূর্ণগ্রীব তথা পূর্ণগিরি, এই পাঁচটি পীঠের উল্লেখ আছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্ন পীঠের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, তন্ত্রসারে উল্লেখ আছে একান্নটি পীঠের। কুব্জিকাতন্ত্রে বিয়াল্লিশ, পীঠ নির্ণয়-একান্ন এবং শিবচরিতে একান্ন পীঠের উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ছাব্বিশটি উপপীঠেরও সন্ধান পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, শক্তি পীঠের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনীর সঙ্গে প্রায় অবিকল এক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় মিশর দেশে। সেখানে ওসাইরিসের ভাই সেথ ওসাইরিসের অস্থিগুলি দেশের দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মিশরের মন্দিরগুলিতে ওসাইরিসের যে-সব দেহাবশেষ দেখানো হত, বলা হত সেগুলি তার অস্থি।

কালিকাপুরাণের চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় মুনির মাধ্যমে জানা যায়, একসময়ে ঘটেছিল মহাপ্রলয়। পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-বেগ নিবৃত্ত হলে কূর্মরূপ ধারণ করে পর্বতের সহিত পৃথিবীকে পৃটে গ্রহণ করত উন্নত অবনত দেশসকল সমান করলেন। শরভ এবং বরাহের যুদ্ধকালে পৃথিবীর যে সকল দেশ বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেইসকল দেশকেও সমভূমি করিলেন। এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান বরাবর অনন্তকে কূর্মরূপে ধারণ করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, মনু সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষকে সম্বোধন করত নরনারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,—হে মহাত্মাগণ, বরাহ এবং শরভের যুদ্ধে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্বার যে রূপে সৃষ্টি করিতে হইত তাহা শ্রবণ কর। ...স্বয়ম্ভুব মনো! তুমি ধরাতলে বীজ বপন কর; পৃথিবীও সকলদিকে শস্য-রাশিতে পরিপূর্ণা হউন। ওষধি লতা বৃক্ষ বল্লী প্রভৃতি নানা জাতীয় উদ্ভিজ বসন্ত রোপণ কর। দক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইহাদের অমৃত সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তৃপ্ত করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রদেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিত্রয় দ্বারা যজ্ঞ করুন।

কালিকাপুরাণের চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ে আরও উল্লেখ করা আছে দক্ষের উদ্দেশে:

মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন, দক্ষ-যজ্ঞীয় বৃক্ষ এবং লতা শষ্যাদি সকল সম্যকরূপে উৎপন্ন এবং দিকপাল দেবগণ পৃথক পৃথক রূপে প্রতিপন্ন হইলে কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া দ্বাদশ-বৎসর-সাধ্য জ্যোতিস্টোম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিত্রয়কে বারংবার হোমদ্বারা আরাধনা করিলে এবং বরাহদেব যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হইল। তদনন্তর দক্ষ, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রজাবিস্তারে চ্ছায়-রূপ-স্তন-প্রভৃতি সুলক্ষণ সম্পন্না হয়ে দশটি কন্যা সৃষ্টি করিলেন এবং মহাত্মা মুনিকে ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন।

কশ্যপের ঔরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভ সম্ভূত প্রজাপতিই সকলের জনক। উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল। এরাই অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, প্রবা, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা, কদ্রু—এই ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা জগৎ বিখ্যাত।

প্রসঙ্গত জানা যেতে পারে, দক্ষের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? কালিকাপুরাণের উল্লেখ অনুযায়ী, ব্রহ্মার ধ্যানকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গে-মর্ত্যে তিনি দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হন।

কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শুক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, তৃষ্টা—এই বারোজন জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠজন সূর্যালোকে নিজ কিরণ বিস্তার করতে থাকেন এবং তাঁর বংশই বেশি সম্প্রসারিত হয়। দক্ষের দ্বিতীয় কন্যা দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে এক বলবান ছেলে জন্মগ্রহণ করে। এই হিরণ্যকশিপু-র চারটি ছেলে— প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, বাস্কল এবং শিবি। প্রহ্লাদের তিন ছেলে— বিরোচন হল জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দু'জন— কুম্ভ ও নিকুম্ভ।

বিরোচনের ঔরসে বলি নামে এক ছেলের জন্ম হয়। যাঁকে মহান দাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বলির ছেলের নাম বনি। তিনি মহাবলী ছিলেন। বনিকে স্বয়ং মহাদেব খাইয়ে দাইয়ে লালনপালন করতেন। হয়ত সেই কারণে, বনিকে বলা হয় মহাকাল।

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কন্যা দনু-র গর্ভে বিপ্র, চিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্জয়, অয়ঃশিরা, অশ্বশীর্য, ক্ষয়, শঙ্কু, বিয়নমূর্ধা, বেগবান, কেতুমান, সূক্ষ, তুরুণ্ড, নহুষ, উর্দ্ধবাহু, একচক্র, বিরূপাক্ষ, হর, অহর, নিশ্চিক্র, অন্নচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শালভ, দিবাকর ও নিশানাথ এই চল্লিশজন মহাবলশালী ছেলের জন্ম হয়। দক্ষের চতুর্থ মেয়ে দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষর, রস এবং বৃত্র নামে মহাপরাক্রমশালী চারটি ছেলের রূপ-গুণ-বল সমন্বিত একশটি করে ছেলে হয়। দক্ষের পঞ্চম মেয়ে কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধ-হন্তা ও ক্রোধশত্রু নামে চারটি ছেলের জন্ম হয়।

ষষ্ঠ মেয়ে সিংহিকার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য, বিমর্দ্দন, রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা, চন্দ্র বিম দুর্গের জন্ম হয়। সপ্তম মেয়ে ক্রোধার গর্ভে ক্রোধ-বশ ক্রুরকর্ম্মা এবং বিমর্দ্দনের উৎপত্তি হয়।

দক্ষের মেয়েদের মধ্যে ক্রোধা এবং সিংহিকা—এই দু'জন অত্যন্ত ক্রূর— তাই এদের গর্ভে যাদের জন্ম হয়, তারাও মাতৃদোষে ক্রুর হয়েছিল।

দক্ষের অষ্টম মেয়ে বিনতার গর্ভে তার্ক্ষ্য অরিষ্ঠ নেমি অনুরু গড়ুর অরুণ এবং অরুণিদের জন্ম হয়।

নবম মেয়ে রুদ্রুর গর্ভে অনন্ত, বাসুকি, ঈশ, তক্ষক, কুলিক, কূর্ম্ম সুমনাদের জন্ম হয়।

দক্ষকন্যা বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সুপর্ণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য, চন্দ্র পুষ্ঠবান অর্কপৃষ্ঠ, প্রমুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুতি, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সর্ববিৎ, বলী, শালিশীর্ষ, পর্জ্জন্য,

কলি এবং নারদের জন্ম হয়। এঁদেরই কেউ দেব, কেউ গন্ধর্বতে পরিণত হন।

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয় মেয়ে দিতি—অনবদ্যা, সানুরাগা, সমুরা, মাগণী, প্রিয়া, অসূয়া, সুভগা, ভীমা—এই আটটি মেয়ের জন্ম দেন।

দক্ষের দশম মেয়ে প্রধান গর্ভে কশ্যপ ঔরসে বিশ্ববসু, সুচন্দ্র, সুপর্ণ, সিদ্ধি, বর্হিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাঙ্ক, ব্রহ্মচারী, রতিপ্রিয় এবং ভানু নামে দশটি ছেলের জন্ম হয়।

দক্ষের মেয়ে—অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যুৎপন্না, রম্ভা, অরুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহু, সুরতা, তিলোত্তমা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অপ্সরাদের জননী। অতিবাহু, তুম্বুরু, হাহা, হুহু ইত্যাদি নামের গন্ধর্বশ্রেষ্ঠরা প্রধার ছেলে।

মার্কণ্ডেয় মুনি জানিয়েছেন, দ্বাপরের শেষদিকে শোণিতপুরে বাণ ও সুরে বনি নামে অসুরের জন্ম হয়। বন্ধু ছিলেন শিব। বলিপুত্র এই মহাত্মা ক্রমে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন এবং নরক রাজার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। একসময় বাণ মহাদেবকে আরাধনা করে অকুতোভয়ে অসুরের মতো বিচরণ করতে থাকে। তাঁর সংসর্গে নরকও একই ধরনের আচরণ করতে থাকেন।

একদিন কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। কিন্তু নরক তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেননি। তখন মুনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তুই যাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিস, মানুষের রূপ ধারণ করে সেই মহাত্মা তোর বিনাশ করবেন। তুই যতদিন জীবিত থাকবি, ততদিন জগজ্জননী কামাখ্যা এখান থেকে অন্তর্ধান করবেন।

এরপর রাজ্যে নামে ঘোর অন্ধকার। একসময় নরক বুঝতে পারলেন, ব্রহ্মশাপে তাঁর মরণ খুব কাছে এসে গেছে। তিনি তখন ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপতি। নরক সমস্ত পরিস্থিতির কথা দূতমারফৎ জানালেন বলিপুত্র বাণকে। তিনি নরককে বললেন, এই পৃথিবীতে মানুষ, দানব, অসুর, রাক্ষস, কিন্নর কেউ ঐশ্বর্যশালী হবেন—ইন্দ্র তা কিছুতেই সহ্য করবেন না। তাদের মনমতো দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু। তাই তাঁর আরাধনা করলেও ইন্দ্র ও বিষ্ণু কখনই তার অন্যায় বরদাস্ত করবেন না।

কালক্রমে নরকের চারটি ছেলে হয়। এদের নাম হল, ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান ও সুমালী। বশিষ্ঠ মুনির শাপের পর নরক প্রাথমিকভাবে মুষড়ে পড়লেও পরে তিনি অনেককে সংঘবদ্ধ করে দেবতাদের উৎপীড়ন শুরু করেন। এমনকি তারা ইন্দ্র ও অন্যান্য মুনিদেরও পীড়ন করতে থাকেন। এইসব অসুরদের মধ্যে অত্যন্ত বলবান হিসেবে পরিচিত ছিলেন, বলিপুত্র বাণ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ঠ, প্রলম্ব, মল্লচাণুর, জরাসন্ধ, নরক, সুগ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরুপাক্ষ, পঞ্চজন, হিড়িম্ব, বক, জটাসুর, কির্ম্মীর, অনায়ুধ, অলম্বুষ, গৌভ, শ্রুতয়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র সুবাহু, অতিবাহু, হিরণ্যপুরনিবাসী, কালকঞ্জ প্রমুখ।

এই অবস্থায় ভগবান অসুরদের হাত থেকে জগতকে মুক্ত করতে স্বয়ং দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতারা সনাতন হরি অবতীর্ণ হয়েছেন শুনে, রম্ভা, তিলোত্তমার মতো রূপ ও গুণসম্পন্না ষোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করেন। তাদের হরণ করে ভূমিপুত্র নরক প্রাগজ্যোতিষপুরে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে বিষ্ণু, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নন্দগৃহে বড় হচ্ছিলেন। তিনিই বিনাশ করেন কংস, কেশী ও প্রলম্বের মতো দৈত্যদের।

পুরাণের ঋষিদের মতো আমরাও জানার জন্য সচেষ্ট হব, কীভাবে জগৎপ্রসবিনী কালী

দাক্ষায়ণী গিরিসুতা হলেন? কীভাবে তিনি মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন? কী জন্যই বা তিনি পিনাকীর অর্ধ শরীর গ্রহণ করেছিলেন?

মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন, যে সময় দক্ষকন্যা সতী শিবসহ হিমালয়ে খেলা করেছেন, সেইসময় মেনকা তাঁর হিতৈষিণী ছিলেন। তাই আমি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করব, একথা মনে করে সতী প্রাণত্যাগ করে হিমালয়সুতা হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সময়ে দাক্ষায়নী দক্ষের প্রতি কোপে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন সেই সময়ে মেনকা, শিবকে আরাধনা করতেন।

মহামায়া জগদ্ধাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রাস্বরূপা সর্বভূতমোহিনী সর্বলোকের শরণ সেই জগদম্বাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করে নবমীতে মোদক, পিষ্টক, পায়েস, ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সপ্তবিংশতি বছর পর্যন্ত পুত্র কামনা করে মেনকা প্রত্যহ পুজো করতেন।

গঙ্গাতে মৃণ্ময়ী মূর্তি তৈরি করে কোনওসময় নিরাহারে, কোনওসময় মহামায়াতে মন অর্পণ করে সপ্তবিংশতি বছর পর্যন্ত মেনকাদেবী তাঁর পুজো করেছেন। এইভাবে পুজো করার সময় একদিন জগন্মাতা মহামায়া তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, তুমি যা প্রার্থনা করছ আমি তা পূরণ করব। তখন মেনকাদেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীরূপ দেখে প্রণাম করলেন। দেবী তখন আশীর্বাদ করে মেনকাকে বলেন, তুমি তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। মেনকা প্রথমে বীর্যবান, আয়ুস্মান এবং ধনসম্পন্ন শত পুত্র প্রার্থনা করেন। তার পরে সুরূপ ও গুণশালিনী কুলদ্বয়ের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-দুর্ল্লভা একটি কন্যা প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনা শুনে দেবী বললেন, তোমার বীর্য্যবান একশটি ছেলে হবে। তার মধ্যে প্রথম ছেলে অত্যন্ত বলবান হবে। দেবতা, রাক্ষস ও মানুষের তথা জগতের হিতের জন্য আমি তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাব। তুমি নিত্য, সুখপ্রসবা, নিত্য পতিব্রতা এবং অম্লান-রূপ-সম্পন্না ও সুভগা হবে। এ-কথা শুনে মা জগদ্ধাত্রী অন্তর্ধান করলেন। তারপর কালক্রমে মেনকাদেবী মৈনাককে প্রসব করেন। তারপর জগন্মায়া যোগনিদ্রা কালিকা আগের সতীদেহ ত্যাগ করে আবার জন্মের জন্য মেনকার কাছে যান। সেই পূর্বসূত্রেই দেবী বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে মাঝরাতে জন্মগ্রহণ করেন।

হিমালয় তাঁকে 'কালী' ও বন্ধুরা 'পার্বতী' নাম রাখেন। একসময় নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি গিরিরাজ হিমালয়কে বলেন, এই মেয়েকে শিব ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাববেন না। এটা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। এমনকি দেবতাদের কাছেও একথা প্রকাশ করবেন না। তিনি আরও জানান, আপনার মেয়েই হলেন সতী। এ বিষয়ে কোনও সংশয়ই নেই যে তিনি শিবের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সতীপীঠগুলির উদ্ভব কি করে হল তার উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে, দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের পর তাঁর দেহ কাঁধে করে মহাদেব উন্মত্তের মতো সারা পৃথিবী নেচে বেড়াতে লাগলেন। একসময় রসাতলে যাবার উপক্রম হয় সৃষ্টির। এই ধ্বংসের হাত থেকে সৃষ্টিকে বাঁচানোর জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন বিষ্ণু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সতীদেহে প্রবেশ করে তা খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। কোনও কোনও মুনিঋষির মতে, স্বয়ং মহাদেব নাকি সতীদেহ কাটার সময় সে ব্যাপারে তৎপরতা দেখান। যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাবিষ্ণুর চক্র দিয়ে কেটে মহাদেবী সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে সব জায়গায় ফেলেছিলেন, ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপিণী জগন্মাতা ভক্তদের মুক্তি ও সাধকদের সিদ্ধির জন্য পাথরের

মূর্তি ধারণ করে নিত্য পূজিতা হচ্ছেন। শিবও প্রতিটি ক্ষেত্রে ভৈরব হিসেবে উপস্থিত। সাধক মনমোহন বলেছেন,

দেহের সর্ববিদ্যা সকল দেবতা
সর্বতীর্থ বিরাজিত আছে মাতা পিতা।।

রুদ্রযামলতন্ত্রে দশটি প্রধান পীঠের স্থান উল্লেখ করা আছে। (১) মেরুদণ্ডমূলের মূলধারাচক্রে রামরূপ পীঠ (২) হৃদয়ে জলন্ধর পীঠ (৩) ললাটে পূর্ণগিরি, (৪) তার সামান্য ওপরে ওড্ডীয়ান পীঠ (৫) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে বারাণসী (৬) নয়নত্রয়ে জ্বালামুখী, (৭) মুখবিবরে মায়াবতী (৮) কণ্ঠে মধুপুরী বা মথুরা (৯) নাভিদেশে অযোধ্যা এবং (১০) কাঞ্চীপীঠ। 'তন্ত্রসারে' দেহের একান্নটি দেবীপীঠের যে ভাবনা আছে তা হল (১১) মূলাধারে কামরূপ (২) মুখবৃত্তে বারাণসী, (৩) ডান চোখে নেপাল (৪) বাঁ চোখে পৌণ্ড্রবর্ধন, (৫) ডান কানে কাশ্মীর (৬) বাঁ কানে কান্যকুব্জ (৭) ডান নাকে পুরস্থিত (৮) বাঁ নাকে চরস্থিত (৯) ডান গালে পূর্ণশৈল (১০) বাঁ গালে অর্বুদ (১১) ওষ্ঠে আম্রাতকেশ্বর (১২) অধরে একাম্র (১৩) উপরের দাঁতে ত্রিস্রোত (১৪) নীচের দাঁতে কামকোট্ট (১৫) ব্রহ্মরন্ধ্রে কৈলাস (১৬) মুখে ভৃগু (১৭) ডান বাহুমূলে কেদার (১৮) ডান কনুইতে (কূর্পর) চন্দ্রপুর (১৯) ডান মনিবন্ধে শ্রী, (২০) ডান অঙ্গুলি মূলে ওঙ্কার (২১) ডান অঙ্গুলির অগ্রভাগে জলন্ধর (২২) বাম বাহুমূলে মালব (২৩) বাম কনুইতে কুলান্তক (২৪) বাঁ মনিবন্ধে দেবীকোট্ট (২৫) বাম অঙ্গুলিমূলে গোকর্ণ (২৬) বাম অঙ্গুলির অগ্রভাগে মারুতেশ্বর (২৭) দক্ষিণ পাদমূলে অট্টহাস (২৮) দক্ষিণ জানুতে বিরজ (২৯) ডান গুলফে রাজগৃহ (৩০) ডান পদাঙ্গুলিমূলে কোল্বগিরি (৩১) ডান অঙ্গুলির অগ্রে এলাপুর (৩২) বাম পাদমূলে কামেশ্বর (৩৩) বামজানুতে জয়ন্তী (৩৪) বামগুলফে উজ্জয়িনী (৩৫) বাম পাদাঙ্গুলিমূলে ক্ষীরিকা (৩৬) বামপাদঙ্গুলির অগ্রে হস্তিনাপুর (৩৭) ডান পার্শ্বে উড্ডীশ (৩৮) বাম পার্শ্বে প্রয়াগ (৩৯) পিঠে বিন্ধ্য (৪০) নাভিতে মায়াপুর (৪১) উদয়ে জলেশ্বর (৪২) হৃদয়ে মলয় (৪৩) ডান কাঁধে শৈল (৪৪) স্কন্ধের ঝুঁটিতে (কুকুদ) মেরু (৪৫) বামস্কন্ধে গিরি (৪৬) হৃদাদি ডান করে মহেন্দ্র (৪৭) হৃদাদি বাম করে বামন (৪৮) হৃদাদি ডান পায়ে হিরণ্যপুর (৪৯) হৃদাদি বামপদে মহালক্ষ্মীপুর (৫০) হৃদাদি উদরে উড্ডীয়ান (৫১) হৃদাদিপুরে ছায়াছত্রপুর পীঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪র্থ স্কন্ধ-২-৪ অধ্যায়) উল্লেখ আছে, একদা বিশ্বস্রষ্টাদের যজ্ঞে সমস্ত দেব ও ঋষিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন দক্ষ প্রজাপতি। তিনি আসায় দেবতা ও ঋষিরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালেও শিব কিন্তু তাঁর জায়গায় বসে থাকেন। নিজের জামাই-এর এহেন আচরণে দক্ষ প্রজাপতি শিবের নিন্দা করেন ও অভিশাপ দিয়ে বলেন, ওই ব্যক্তি যেন যজ্ঞের ভাগ না পায়। সেই ক্রোধের ওপর ভিত্তি করে দক্ষ, শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। ওই যজ্ঞে সব দেবতা ও ঋষিদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও নিমন্ত্রণ করা হয়নি শিব ও সতীকে। বাপের বাড়িতে যজ্ঞ হচ্ছে শুনে সতী সেখানে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে সেখানে যেতে বারণ করেন শিব। কিন্তু একসময় সতী বাপের বাড়ি যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করেন।

ভাগবতে বলা হয়েছে, সতী এই সময় দশমহাবিদ্যা রূপ দেখিয়ে তাঁর স্বামীকে হতচকিত করে দেন। তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন, হে শিব, আমি সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। পূর্ব স্বীকৃতির জন্য পুরুষরূপী তোমাকে পেতে ইচ্ছুক হয়ে তোমার পত্নী হবার জন্য গৌরদেহ ধারণ করেছি। সেই আমিই এখন পিতার মহাযজ্ঞ বিনাশ করার জন্য ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেছি। হে মহেশ্বর তুমি ভয় পেয়ো না। এই ভয়ঙ্করী দশমূর্তি ওঁরা সবাই আমারই স্বরূপ। তোমাকে মহাভিতচিত্তে দশদিকে ধাবিত হতে দেখে আমি দশদিক নিবারণ করে দশরূপে নিবারণ করছি।

তিনি মহাদেবকে বলেন, আমি তোমার সতী। তুমি আমার অতি প্রিয়। আমি পিতা দক্ষ প্রজাপতির দর্পনাশের জন্য সত্ত্বর সেখানে যাব। তুমি নিজে সেখানে না গেলে, আমায় যাবার অনুমতি দাও। প্রত্যুত্তরে শিব বলেন, তুমি যে পূর্ণা পরমা প্রকৃতি তা আমি জানি। তুমি আদ্যা, পরমা বিদ্যা, তুমি সর্বভূতে অবস্থিতা, তুমি স্বতন্ত্রা পরমাশক্তি। তুমি দক্ষযজ্ঞে যেতে চাইলে আমার এমন কোনও শক্তি নেই যে তোমায় আটকাতে পারি, হে মহেশানি, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

সতী যজ্ঞস্থলে পৌঁছে বাবার কাছে জানতে চান, তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে এই যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কেন? দক্ষ বলেন, শিবের বেশভূষা রুচিসম্মত নয়। তিনি সবসময় ভূত পিশাচদের সঙ্গ করেন। তাঁর অনুচরেরা সবসময় নগ্ন অবস্থায় থাকে। তাই তাঁর স্বামীকে নিমন্ত্রণ করলে সব দেবতা ও ঋষিদের সামনে তাকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। দক্ষ বলেন, সতীকে ব্রহ্মার অনুরোধে যখন আমি শিবের কাছে সম্প্রদান করি, তখন আমি জানতাম না তিনি শিবরূপী। আমি জানতাম না শিব বিরূপাক্ষ, বৃষবাহন, বিষপায়ী, শ্মশানচারী, শূলী, নরকপালধারী, নাগসংসর্গী ও জটাধারী। তিনি জানতেন না যে, শিব কখনও দিগম্বর, কখনও বা কৌপিনধারী, আবার কখনও চামড়া পরে ভিক্ষে করে বেড়ান। তাঁর জাতি বলতে কিছুই নেই। কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় জানে না। তাই যজ্ঞের মতো মঙ্গলকাজে কোনও অমঙ্গলের প্রতীককে তিনি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না। দক্ষ প্রজাপতির এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ডে।

দক্ষ প্রজাপতির মুখে এ ধরনের পতি নিন্দা শুনে সতী বলেন, ইহলোকে যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, কারও সঙ্গে যাঁর বিরোধ নেই, আমার স্বামীর প্রতি আপনি ছাড়া আর কে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে? দেবতারা জানেন, শিবই মঙ্গলস্বরূপ। আপনি ভগবান নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী। আপনার থেকে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হয়েছে, তা আমি আর ধারণ করব না। সিদ্ধ সাধক স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী তার 'জপসূত্রম' গ্রন্থে বলেছেন, 'দক্ষ প্রজাপতি শিবহীন যজ্ঞে (সৃষ্টিকর্মে) প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে সতীর দেহত্যাগ। শিবের স্কন্ধে সতীশব।.... এখানে তিনিই তাণ্ডব নৃত্যপর। সৃষ্টি প্রলয়োন্মুখ। বিষ্ণু তাঁর 'সুদর্শন' চক্রে সতী অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাতে সৃষ্টির রক্ষা ও পালন হইল। সতী-অঙ্গ সমূহে হইল একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ। এক পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ জানা আছে। কিন্তু এটি এক রহস্য সংখ্যা ৫ x ১০+১=৫১; ২ x ২৫+১=৫১; ৩ x ১৭=৫১; পাঁচে পঞ্চ মহাভূত; দশে দশধা অভিব্যক্ত প্রাণ; এবং মূলে অক্ষর বস্তু এক। পাঁচটি ভূতসূক্ষ্ম (তন্মাত্র), দশপ্রাণ (অথবা ইন্দ্রিয়), মন এবং বুদ্ধি (অথবা অহংকার

ও বুদ্ধি)—এইসব মিলে ১৭। (জপসূত্রম, চতুর্থ খণ্ড ১৩৬৩ পৃষ্ঠা ২৪৬)। স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী মাতৃকাবর্ণে বলেছেন, সতীদেবীর পবিত্র দেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ঋৃং, ৯ং ৯ৃং এং ঐং, ওং, ঔং ইত্যাদি একান্নটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। এই একান্নটি বর্ণই হল একান্ন পীঠ।

'সতীপীঠ পরিক্রমা' গ্রন্থের লেখক অমিয় কুমার মজুমদার তাঁর বই-এর মুখবন্ধে লিখেছেন, শঙ্করাচার্য, তাঁর আনন্দলোহীর স্তোত্রে একান্ন পীঠের তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধাদি, পঞ্চ তন্মাত্র, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ত্বগাদি সপ্তধাতু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, অহংকার, খ্যাতি (জ্ঞান), সত্ত্বাদি গুণত্রয়, প্রকৃতি, পুরুষ, রাগ, বিদ্যা, কলা, নিয়তি, কাল, মায়া, শুদ্ধ বিদ্যা, মহেশ্বর (রজোগুণাবিষ্ঠা সৃষ্টিকর্তা), সদাশিব (সৃষ্টিস্থিতিকর্তা), শক্তি (মহেশ্বর ও সদাশিবের রক্ষণ-সর্জনশক্তি এবং কালাত্মিকা সংহারিনী শক্তি) এবং শিবতত্ত্ব (শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ) ইত্যাদি একান্নটি পীঠ। 'ললিতা সহস্র নাম' গ্রন্থে শ্রীচক্রের মুখ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবিদ্যা বা ললিতাম্বার একটি নাম 'মাতৃকাবর্ণরূপিনী'। কোনও যুগে সত্যি সত্যিই সতীর অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল কিনা সে নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে বা আজও চলছে। কিন্তু কথায় আছে না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এছাড়াও এবিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন কিছু মানসিক অনুভূতি হয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুরু করছি, সতীপীঠ নিয়ে নানান পীঠের বিস্তৃত অনুসন্ধান।

কেন এই বই

উপনয়নের দু'বছর পর থেকেই প্রথাগত পুজোর ব্যাপারে মন কখনও সায় দেয়নি। কিন্তু কেন জানি না, কৈশোর থেকেই বিচিত্র টান অনুভব করতাম বিভিন্ন সতীপীঠ সম্পর্কে। স্কুলের পড়া শেষ করার মুখে একা একাই চলে গিয়েছিলাম অন্যতম সতীপীঠ বীরভূমের কঙ্কালীতলায়। তারপর দুমকার কাছে ম্যাসানজোড় বাঁধের কাছে এক আশ্রমে পরিচয় হয় কঙ্কালীতলায় দীর্ঘদিন সাধনভজনে যুক্ত সতী দেবীর সঙ্গে। সেইসূত্রে প্রাথমিকভাবে আলোকিত হই সতীপীঠ সম্পর্কে। '৮২ সালে কাজের তাগিদে গিয়েছিলাম গুয়াহাটিতে। সেবারই প্রথম গিয়েছিলাম বিখ্যাত কামাক্ষা মন্দিরে। বলা বাহুল্য, বিন্দুমাত্র কুসংস্কার ছিল না মনের মধ্যে। কিন্তু বিচিত্র এক অনুভূতি হয় মন্দিরে প্রবেশ করার পর। তারপর '৮৪ সালে কলকাতা বইমেলায় পরিচয় হয় 'সতীপীঠ পরিক্রমা' বইটির লেখক অমিয় কুমার মজুমদারের সঙ্গে। বইমেলার মাঠেই দীর্ঘসময় তাঁর সঙ্গে সতীপীঠ, তন্ত্রসাধনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। কখন জানিনা, আমার অজান্তেই শ্রী মজুমদার আমার মননে বিচরণ করতে থাকেন, যা আজও বর্তমান। তাই অকপটে স্বীকার করতে চাই, এই বইটি লেখার প্রতিটি ছত্রে তাঁর প্রভাব আমার ওপর পূর্ণমাত্রায় পড়েছে।

৫১ পীঠের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু একবার গিয়ে মনের আশা মেটেনি। এই কাজ করতে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, যার সুবাদে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে, স্বয়ং মা দুর্গা আমায় এই কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। বর্ধমানের ক্ষীরগ্রামের শ্রী সনৎ কুমার চক্রবর্তী 'মা যোগাদ্যা' সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের সংগ্রহ তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। আমার দাদা গোপাল চট্টোপাধ্যায় এনে দিয়েছেন, 'কালীক্ষেত্র দীপিকা' নামক দুষ্প্রাপ্য বই। ত্রিপুরার খ্যাতনামা প্রকাশক গৌর দাস সাহা 'রাজমালা'-র মতো মূল্যবান বই উপহার দেওয়ায় সেখানকার সতীপীঠ সম্পর্কে লিখতে খুবই সুবিধা হয়েছে। কালিকানন্দ অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বইটি থেকেও হিংলাজতীর্থ সম্বন্ধে আলোকিত হয়েছি।

নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ঈশ্বরের কৃপা না হলে এই অসাধ্যসাধন করার ক্ষমতা আমার নেই। বিভিন্ন পীঠে যাওয়া এবং সেখানে কিছুদিন থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন প্রভূত অর্থ। আগামীদিনে এই বিশাল বাধা কাটিয়ে উঠতে পারব বলে আমার

মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। বুঝতে পেরেছি, এই পৃথিবীতে এখনও অনেক কিছু আছে যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পীঠনির্ণয়, তন্ত্রচূড়ামণি, শিবচরিত তথা অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থে 'তারাপীঠ'-কে পীঠ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। তা সত্ত্বেও মনের টানে তারাপীঠকে 'মোক্ষতীর্থ' হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

এই পর্বে তারাপীঠসহ দশটি পীঠের বর্ণনা দেওয়া হল।

এই কাজটি করার সময় যাদের সাহায্য আমায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তারা হলেন, রেণুকা চট্টোপাধ্যায়, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য নস্কর, তপন ধর, সঞ্জয় সরকার, শৈলেন শীল, শিহরণ সেন, অনন্ত ঘোষ, গীতিকণ্ঠ মজুমদার, জগন্ময় মিশ্র এবং প্রসাদ পত্রিকার উপদেষ্টা তথা বর্তমান কর্ণধার কল্লিতা বোস। এই বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দীপ প্রকাশনকে।

পরিশেষে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তাহলে এই বইটির পরবর্তী খণ্ড কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

কলকাতা-৭০০০২৬ বিনীত
১৭ জানুয়ারি, ২০০৬ **হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়**

সূচিপত্র

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা

বর্ধমান স্টেশন থেকে বাসে ঘন্টা দেড়েকের পথ। এখানে দেবী যোগাদ্যা নিত্যপূজিতা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা কুব্জিকাতন্ত্রে ক্ষীরগ্রামকে সিদ্ধ পীঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নেপাল রাজদরবারে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই তন্ত্রের যে হাতে লেখা পুঁথি পেয়েছিলেন সেখানে ক্ষীরগ্রামের নাম পাওয়া যায়। (এই ৩১৭৪ নম্বর পুঁথিটি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাখা আছে)। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানীয়াদ্দাম লোচনে।
কামরূপং মহাপীঠং সর্ব্বকাম ফলপ্রদস্।।

ক্ষীরগ্রামের সতীদেহের চরণের আঙুল পড়ায় দেবীকে বলা হয় যোগাদ্যা বা যুগাদ্যা ও ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠক। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উদ্ধৃত তন্ত্র চূড়ামণিতে একটি শ্লোকে উল্লেখ করা আছে—

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগাদ্যা মা মহাদেবী দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম।।

ব্রহ্মানন্দ গিরি রচিত শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীতে গান্ধর্বতন্ত্রের উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়, এটি রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকে। পীঠমাহগান্ধর্বে বলা হয়েছে—

পীঠমুজয়নী চৈব ক্ষীরকা মেবচ।
বৃহন্নীলতন্ত্রে উল্লেখ আছে,
ক্ষীরপাঠে যুগাদ্যা চ ক্ষীরাখ্যা নিয়মপ্রভা।
রাজেশ্বরী মহালক্ষ্মী হস্তিনা পুরবাসিনী।।
বৃহন্নীলতন্ত্রের পঞ্চম পটলে পাওয়া যায়,
জয়দশ্চ জয়পুরম উজ্জয়িনীপুরং তথা।
হরিদ্রাপীঠকশ্চৈব প্রিয়ং ক্ষীরপুরং প্রিয়ম্।।

ভারতীয় যাদুঘরে রাখা পুঁথিতে উল্লেখ আছে—
ভূতধাত্রী মহাদেবী ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকভাক্।
যুগাদ্যা সা মহাবিদ্যা বিখ্যাতা ভুবনত্রয়ে।।

শিবচরিতে বলা হয়েছে—
ক্ষীরগ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগাদ্যাসা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোমম।।

দেবী যোগাদ্যা সম্পর্কে জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ত্রেতা যুগে। তখন লঙ্কায় চলছে রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের ছেলে মহীরাবণের আরাধ্যা দেবী ভদ্রকালী তথা যোগাদ্যা থাকতেন পাতালে। প্রতিদিনই দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত। একসময় মহীরাবণ মায়াবলে রাম এবং লক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গিয়ে দেবীর সামনে বলি দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। হনুমান রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ শুরু করলেন মহীরাবণের সঙ্গে। একসময় মহীরাবণ নিহত হলেন হনুমানের হাতে। তারপর রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে হনুমান মা যোগাদ্যাকে মাথায় করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষীরগ্রামে। প্রবাদ আছে, দেবী স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে ক্ষীরগ্রামে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, পীঠ নির্ণয় বা মহাপীঠ বা মহাপীঠ নিরুপণম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা হয়। সেখানে উল্লেখ আছে—

ক্ষীরগ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ।
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদোমম।।

কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির ৩৪০০ নম্বর পুঁথিতে (মহাপীঠ নিরুপণম) পাওয়া যায়—
ভূতধাত্রী মহামায়া বাম পদাঙ্গুলী মম।
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষ পদাঙ্গুলী মম।।

এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯৬ নম্বর পুঁথিতে উল্লেখ আছে—
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠ পদৌ।

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য আগমবাগীশের তন্ত্রসার অনুযায়ী—
তধংক্ষীরিকা পীঠায় নমো বামপদাঙ্গুলিমূলে।

অর্থাৎ ক্ষীরগ্রামে দেবীর বাম বা ডান কোন পায়ের আঙুল পড়েছে সেই নিয়ে অনেক মতের সন্ধান পাওয়া যায়।

রামতোষণ বিদ্যালংকারের 'প্রাণতোষণী গ্রন্থে' (১৮২০ খ্রীঃ) ও 'বাচস্পত্য পীঠে' একই ধরনের (কুব্জিকাতন্ত্রের মতো) সিদ্ধপীঠের বর্ণনা আছে—

ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানীয়াদ্বামলোচনে।

তন্ত্রচূড়ামণির পাণ্ডুলিপিতে এবং ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী'র পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে—

পীঠমুজ্জয়িনীশ্চৈব বিচিত্রং ক্ষীরিকা ভিধম্।
হস্তিনাপুর পীঠশ্চ (পুরকংপীঠং) উড্ডীশশ্চ প্রয়াগকম্।।

কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারতে (২য় খণ্ড) বলা হয়েছে—

শান্তিপর্ব-মহীরাবণ বধ

পাতাল হইতে তবে বীর হনুমান।
রাম-লক্ষ্মণ কান্দে করি করিল পয়াণ।
হেন কালে ভদ্রকালী বলেন বচন।
আমারে লইয়া চল পবন-নন্দন।।
এতেক শুনিয়া হনু হাসিয়া তখন।
মাথে করি ভদ্রকালী কান্ধে দুইজন।।
লঙ্কাতে আইলা রাম-লক্ষ্মণ সহিত।
দেখিয়া সকল সৈন্য হৈল আনন্দিত।।
তবে বীর হনুমান দেবীরে লইয়া।
ক্ষীরগ্রামে রাখে তারে স্থাপন করিয়া।।
তবে হনুমান আইলা লঙ্কার ভবন।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ।।

অন্নদামঙ্গলে বর্ণনা আছে—
ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব।।

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত, কৈচর রেল স্টেশনের কাছে ক্ষীরগ্রাম। গ্রামের মধ্যে মূল মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের সামনে আছে প্রবেশ মণ্ডপ ও তারপরে রয়েছে গর্ভগৃহ। মন্দিরের চূড়াটির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে ওড়িশার বিভিন্ন মন্দিরচূড়ার। মন্দিরে কোনও প্রতিমা নেই। গর্ভগৃহের দেওয়াল ঘেঁষে একটি বেদী আছে। তার মাঝখানে রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ মুখ। জানা গিয়েছে, আগে এই সুড়ঙ্গ মুখটি অনেক বড় ছিল। কিন্তু অনেক সাধক এখানে সাধনা করার সময় সুড়ঙ্গ পথে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেন বলে স্থানীয় রাজার নির্দেশে ওই মুখটি অনেক ছোট করে দেওয়া হয়। আপাতভাবে বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গর্ভগৃহের দেওয়ালে ফুটে উঠেছে দেবী দুর্গা ও কালীর সমন্বিত রূপ। কিভাবে তা সম্ভব হয়েছে তা কোনও ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এই বেদীতেই করা হয় নিত্য পুজো।

বর্ধমানের মাড়গ্রামবাসী প্রভুবাদ পণ্ডিত নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত পরম ভাগবতে উল্লেখ করেছেন লঙ্কাকাণ্ড-মহীরাবণ বধ। অহীরাবণ বধ। পৃঃ ৭৭৪-৭৭৬।

মহীর মরণ-বার্তা মহীর বণিতা।
শ্রবণ করিয়া শোকে হয়ে ক্রোধান্বিতা।।
আলুথালু বেশে আসি যোগাদ্যা-সদনে।

বলে, কী জননী, তব এই ছিল মনে।।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে অঞ্জনা নন্দন।
লঙ্কায় আসিতে হন উদ্যত যখন।।
ভদ্রকালী কহিলেন হনুর সদনে।
স্বকার্য্য সাধিয়া লয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।।
যাইতেছ লঙ্কাপুরে রাবণ-বধিতে।
আমি কি রহিব পাতালপুরীতে।।
এখানে কে আর মম করিবে পূজন।
রাক্ষসের দেবী আমি জানে সর্বজন।।
শুনি হনু শিরে লয় দেবীরে আনন্দে।
শ্রীরাম ও লক্ষণেরে লয়ে দুই স্কন্ধে।।
পাতাল হইতে হনু গমন করিল।
ক্ষীরগ্রামে আসি তথা দেবীরে স্থাপিল।।
তথায় যোগাদ্যা নামে দেবী খ্যাত হন।
তথা হতে স্কন্ধে হয়ে শ্রীরাম-লক্ষণ।।
লঙ্কাপুরে বানর-কটকে দেখা দিল।
রাম জয়ধবনি সবে করিয়া উঠিল।।

ক্ষীরগ্রামে রয়েছে খুব বড় একটি জলাশয়, যা সকলের কাছে পরিচিত ক্ষীরদীঘি নামে। শোনা যায়, দীঘির দক্ষিণ দিকের মাঝখানে দেবীসতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল। এই দীঘির জলের তলায় দেবীমূর্তি রাখা হয়েছে। প্রতিবছর বৈশাখী সংক্রান্তির আগের দিন রাতে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। সেখান থেকে দেবীমূর্তিকে তুলে আনা হয় তিনদিক খোলা উৎসব মণ্ডপে। একমাত্র ওই দিন দেবীমূর্তি দর্শন ও স্পর্শ করা যায়। ভোরের দিকে দেবীমূর্তিকে আবার জলের তলায় রাখা হয়। তখন দীঘির পাড়ে বেশ বড় মেলা বসে। চলে জ্যৈষ্ঠ মাসের চার তারিখ পর্যন্ত। শেষের দিন অভিষেকের জন্য দেবীমূর্তিকে আবার জল থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। ওইদিন ভক্তেরা ঘণ্টা তিনেকের জন্য দেবীমূর্তিকে দর্শন ও স্পর্শ করার সুযোগ পান। এছাড়াও আষাঢ়ী নবমী, বিজয়া, দশমী, ১৫ পৌষ ও মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীতে দেবীর বিশেষ পুজো হয়। কিন্তু বৈশাখী সংক্রান্তি ও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ছাড়া বছরের আর কোনও দিন সাধারণ দর্শকের মূর্তি দর্শন নিষিদ্ধ। পরের চারদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে দেবীমূর্তিকে জল থেকে তুলে এনে পুজো করা হয়। পুজোর শেষে দেবীমূর্তিকে আবার জলের তলায় রাখা হয়। পুজোর সময় ছাগল বলি দেওয়া হয়।

বর্তমানকালে দেবী যোগাদ্যার বর্ণনা করা হয়েছে,
সিংহপৃষ্ঠে শোভা পায় দক্ষিণ চরণ,

বামাঙ্গুষ্ঠে করিয়াছে মহিষমর্দন,
বিগলিত কুণ্ডল শোভিছে পৃষ্ঠ পরে,
কনক কীরিট শোভে মস্তক উপরে।
শ্রবণ কুণ্ডল দোলে গজে গজমতী,
দিব্যবস্ত্র পরিহিতা দেবী হৈমবতী।

দেবী বন্দনার যে রূপের বর্ণনা, তা দেখে নতুন বিগ্রহ তৈরি করেছেন দাঁইহাটের এক শিল্পী। অতীতে ক্ষীরগ্রামের সতীপীঠের কোনও প্রাকৃত মূর্তি ছিল না। তবে তখনও দেবীর পুজো হত। ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তকে রাজা দেখা দেন উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে। রাজার আদেশে দেবী যোগাদ্যা (নামান্তরে যুগাদ্যা) নামে পূজিত হন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলায় যেখানেই আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বাস আছে, সেখানেই যোগাদ্যাতলা আছে। সর্বত্র যে যোগাদ্যার মূর্তি আছে, তা নয়। কোথাও গাছতলায় নোড়ানুড়ির স্তূপ, কোথাও একটিমাত্র শিলাখণ্ড, কোথাও সিন্দুর-চন্দন-হলুদ মাখানো বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, নিম, খাজুর বা শেওড়া মা যোগাদ্যার প্রতীক হিসেবে পুজিত হন।

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন যেসব গ্রামে মা যোগাদ্যার পুজো হয়, সেগুলি হল বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার ইট্টা, গোবর্ধনপুর, কোঁয়ার পুর (বেশ বড় পাথরের মূর্তি আছে), চুরুলিয়া, ভাতাড় থানার নাসিগ্রাম, বড়বেলুন, বর্ধমান থানার কুড়মুন, কালিগ্রাম, ভিটা, বারাশতী, মন্তেশ্বর থানার মূলগ্রাম, ধান্যখেরুড়, খাঁপুর, মাঝেরগাঁ, পূর্বস্থলী থানার পলাশপুলী, গলসী থানার মল্লসারুল, রায়না থানার শিবরামপুর, ভীমপুর, আনগুনা, দেরিয়াপুর সাঁকটিয়া, বোকড়া, পাঁইটা, শেরপুর, কাটনাবিল, উচালন, খণ্ডঘোষ থানার ন'পাড়া, গোপাল বেড়া, সরঙ্গা, কেঁদুড়, কাটোয়া থানার দেবগ্রাম-বরমপুর, গোশুম্বা, করুই, পাঁজোয়া, দোনা, কুরচি, পোটগ্রাম, জামড়া, কাঁটারিয়া, কারুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার কোটলিপুর, ঈশ্বরপুর রাদড়া, ছাতারকানালী, শুঁড়ি পুকুর, হুগলী জেলার আরামবাগ থানার মলয়পুর। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বৈশাখ মাসে একদিন করে লাঙ্গল পালা হয়।

কবি কৃত্তিবাস যুগাদ্যা বন্দনায় লিখেছেন ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাদেবীর শাঁখা পরার কাহিনী। প্রায় তিনশ বছর আগে বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য রচনা করেছেন যুগাদ্যা বন্দনা। মহিলা কবি তরু দত্ত ইংরেজিতে কবিতার আকারে লিখেছেন মা যুগাদ্যার শাঁখা পরার কাহিনী।

850

BALLADS OF HINDUSTAN
By
T. Dutt
JOGADHYA UMA

(i)

"Shell bracelets ho! Shell bracelets ho!
Fair maids and matrons come and buy!"
Along the road, in morning's glow,
The pedler raised his wonted cry.
The Khirogram, for cream renowned,
Through pasture meadows where the kine,
In knee deep grass, stood magic bound,
And half awake, in volved in mist,
That floated in dum coils profound,
Till by the sudden sunbeams kist
Rich rainbow nues broke all around.

(ii)

Shell-bracelets ho! Shell-bracelets ho!
The road side tree still dripped with dew,
And hung their blossoms like a snow
Who heard the cry T was but a few,
A ragged herd-boy, here and there,
With his long stick and naked feet;
A plough man wending to his care,
The field from which he hopes he wheat;
An early traveller, hurrying fast
To the next town; an urchin slow
Bound for the school; these heard and past,
Unheeding all, 'Shell-bracelets ho!

(iii)

Pellucid spread a lake-like tank
Beside the road now lonelier still,
High on three sides arose the bank
Which fruit trees shadowed at thin will,
Up on the fourth side was the Ghat,
With its broad stairs of marble white,

And at the entrance arch there sat,
Full face against the morning light,
A fair young woman with large eyes,
And dark hair falling to her zone,
She heard the pedlar's cry arise,
And eager seemed his ware to own.

(iv)

"Shell-bracelets ho! See, maiden, see!
The rich enamel sunbeam-kist!
Happy, oh! happy shalt thou be,
Let them but clasp that slender wrist;
These bracelets are a mighty charm,
They keep a lover ever true,
And widowhood evert, and harm,
Buy them, and thou shalt never rue.
Just try them on!" She stretched her hand,
"Oh what a nice and lovely fit!"
No fairer hand, in all the land
And lo! the braceled matches it!"

(v)

Dazzled the pedelar on her gazed
Till came the shadow of a fear,
While she the bracelet arm upraised
Against the sun to view more clear,
Oh she was lovely, but her look
Had something of a high command
That filled with awe. Aside she shook
Intruding curls by breezes fanned
And blown across her brows and face
And asked the price, which when she heard
She nodded, and with quiet grace
For payment to her home referred.

(vi)

"And whre, o maiden, is thy house
But no, that wrist ring has a tongue,

no maiden art thou, but a spouse,
Happy, and rich, and fair, and young"
"For otherwise, my lord is poor,
And him at home thou shalt not find,
Ask for my father, at the door
knock loudly, he is deaf, but kind,
Seest thou that lofty gilde spire
Above these tufts of foliage green?
That is our place, its paint of fire
Will guide thee o'er the tract between.

(vii)

"That is the temple spire." "Yes, there
We live; my father is the priest,
The manse is near, a building fair
But lowly, to the temple's east.
When thou hast knocked and seen him, say,
His daughter, at Dhamaser Ghat
Shell-bracelets bought from thee to day,
And he must pay so much for that
Be sure, he will not let thee pass.
Whithout the value, and a meal,
If he damur, or cry alas!
No money hath he, then reveal,

(viii)

"Within the small box marked with streaks
Of bright vermilion, by the shrine,
The key whereof has lain for weeks
Untouched, he'll find some coin 'tis mine.
That will enable him to pay
The bracelets' price, now fare thee well."
She spoke, the pedlar wont away,
Charmed with her voice, as by some spell;
White she, left lonely there, prepared...
To plunge into the water pure,
And like a rose her beauty bared,
From all observance quite secure.

(ix)

Not weak she seemed, nor delicate,
Strong was each limb at flexile grace
And full the bust; the mien elate;
Like hers, the goddess of the clase
On Latmos hill, and oh, the face
Framed in its cloud of floating hair,
No painter's hand might hope to trace
The beauty and the glory there!
Well might the pedlar look with awe,
For though her eyes were soft, a ray
a ray lit them at times which kings who saw,
would never dare to disobey.

(x)

Onwards through groves the pedlar sped
Till full in front the sunlit spire
Arose before him, paths which led
To gardens trim, in gay attire
Lay all around. and lo! the manse,
Humble but neat with open door!
He paused, and blest the lucky chance
That brought his bark to such a shore'
Huge straw ricks log huts full of grain,
Sleek, cattle, flowers, a tinkling bell,
Spoke in a language sweet and plain,
"Here smiling peace and plenty dwell."

(xi)

Unconsciously he raised his cry
"Shell-bracelets ho!" And at his voice
Looked out the priest, with eager eye
And made heart at once rejoice.
"Ho, Sankha pedlar! passnot by
But step thou in, and share the food
Just offered on our altar high,
If thou art in a hungrymood,
Welcome are all to this repast!
The rich and poor, the high and low!'

Come, wash thy feet, and break thy fast,
Then on thy Journey strengthened go'.

(xii)

Oh thanks, good priest! observance due
And greetings! May thy name be blest!
I came on business, but I knew,
Here might be had both food and rest.
Without a charge; for all the poor
Ten miles around thy sacred shrine
Know that thou keepest open door,
And praise that generous hand of thine;
But let my errand first be told,
For bracelets sold to thine this day,
So much thou owest me in gold,
Hast thou the ready cash to pay?

(xiii)

"The bracelets were enamelled, so
The price is high." "How! sold to mine?
who bought them, I should like to know."
"Thy daughter, with the large black eyne,
Now bathing at the marble Ghat,"
Loud laught the priest at this reply,
"I shall not put up, friend, with that,
No daughter in the world have I,
An only son is all my stay ;
Some minx has played a trick, no doubt,
But cheer up, let thy heart be gay,
Be sure that I shall find her out."

(xiv)

"Nay, nay, good father, such a face
could not deceive, I must aver,
At all events, she knows thy place,
"And if my father should demur
To pay these, thus she said, or cry
He has no money, tell him straight
The box vermilion streaked to try,



শ্রীলঙ্কায় সতীপীঠে গৌরী আম্মার মন্দির



নর্মদার সতীপীঠে


সুনন্দা ভৈরব, ত্রম্বক শিব
শিকারপুর তারাবাড়ী
উজিরপুর, বরিশাল।
পুনঃনির্মাণঃ- ২০০৩-০৪ ইং।
অর্থায়নেঃ ডাঃ পীযুষ কান্তি দাস।
(স্বাগতম হে মহান অতিথি)

বরিশালের সতীপীঠ



সতীপীঠ চট্টগ্রামে সীতা মন্দির



চট্টগ্রামের সতীপীঠ



সতীপীঠে দেবী বর্গভীমা



সতীপীঠ জ্বালামুখী মন্দির



সতীপীঠ কামাখ্যা মন্দির



সতীপীঠে কামাখ্যা মন্দিরের একাংশ



উত্তরবঙ্গে জয়ন্তীয়া সতীপীঠে যাবার দুর্গম পথে



বাংলাদেশের শ্রীহট্টের সতীপীঠ



সতীপীঠ মানস সরোবর



সতীপীঠ পুরীর মন্দির



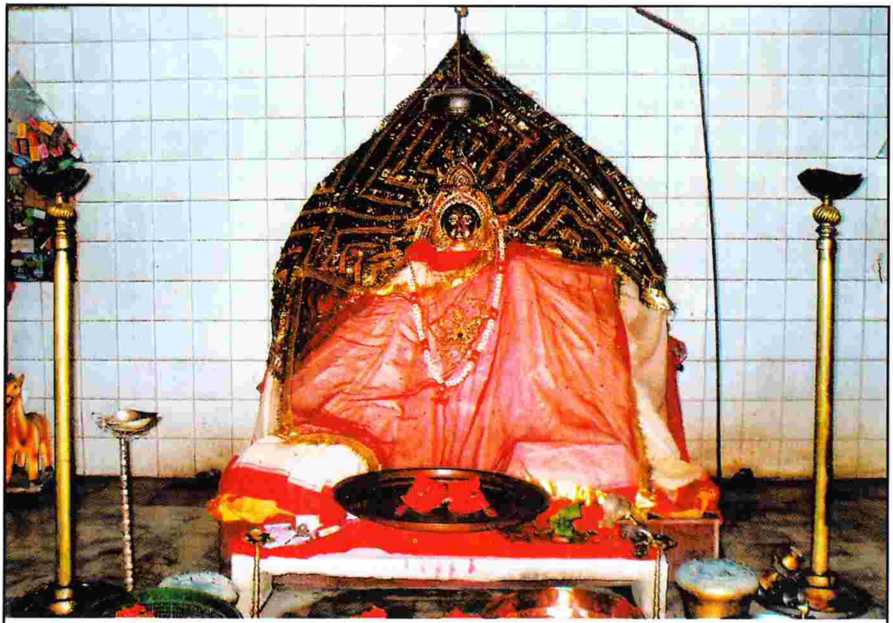
সতীপীঠ কিরিটেশ্বরী



শ্রীলঙ্কার সতীপীঠে গৌরী আম্মার মূর্তি



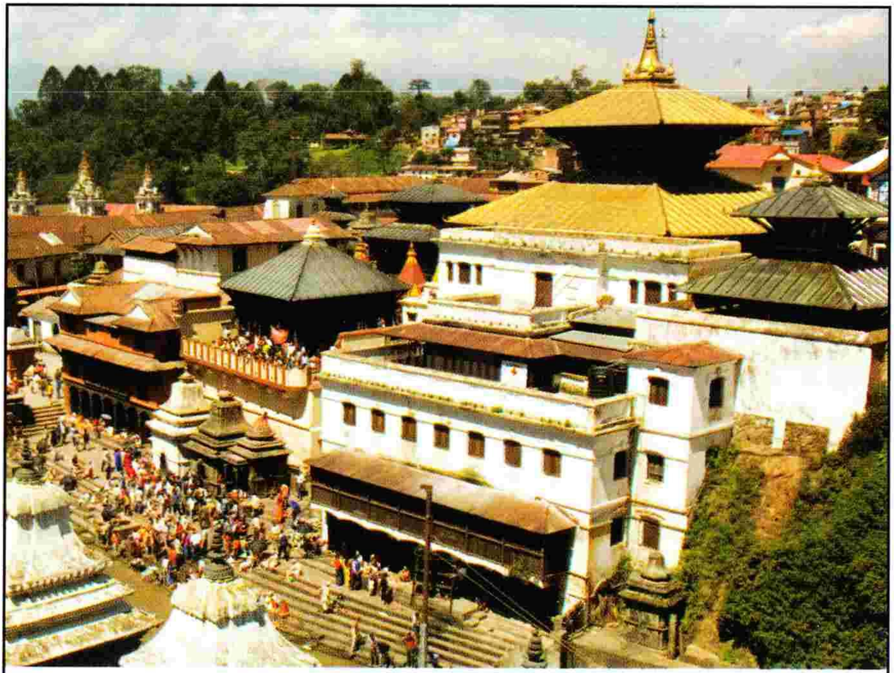
সতীপীঠ জয়ন্তীয়ায় হর-পার্বতী



সতীপীঠ বগুড়ায় অপর্ণা মা



সতীপীঠ যশোহরেশ্বরী মন্দির



নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের সতীপীঠ



গুহার মধ্যে মরুতীর্থ হিংলাজ মাতা



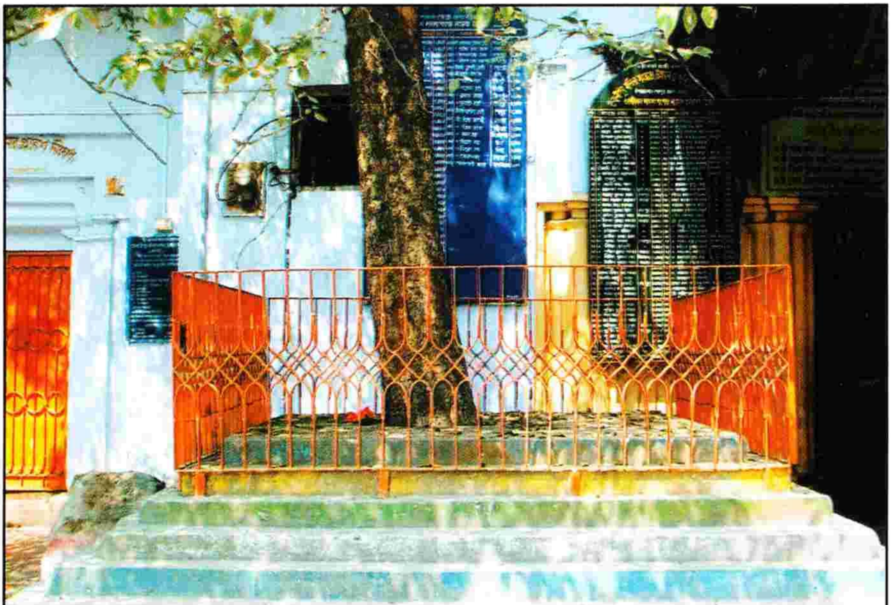
সতীপীঠ ক্ষীরভবানী



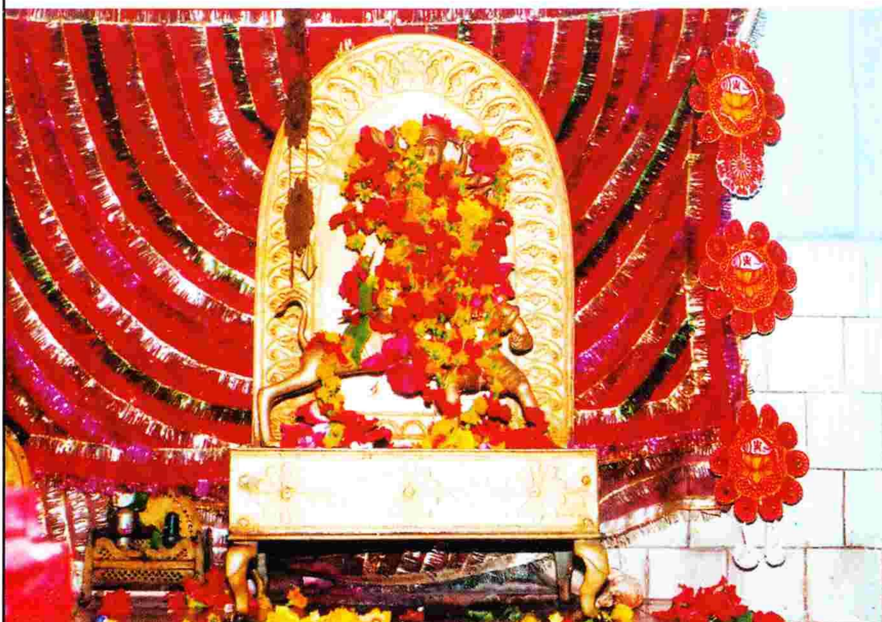
বরিশালের সতীপীঠে উগ্রতারা



কেতুগ্রামের সতীপীঠে বহুলা মা



বগুড়ায় এখানেই পড়েছিল সতীর দেহখণ্ড



বক্রেশ্বরের সতীপীঠ

That's near the shrine, "well, wait,
Friend, wait,
The priest said thoughtful and he ran
And with the open box came back,
"Here is the price exact, my man,
No surplus over, and no lack,

(xv)

"How strange, how strange, Oh blest art thou
To have beheld her, touched her hand
Before whom vishnu's self must low
And brahma and his heavenly band!
Here have I worshipped her for year
And never seen the vision bright,
Vigils and fasts and secret tears
Have almost quenched my out ward sight;
And yet that dazzling from and face
I have not seen, and thou dear friend;
To thee, unsought for, comes the grace,
What may its pur-port be and end?

(xvi)

How strange! How strange! oh happy thou
And could thou ask no other boon
Than thy poor bracelet's price?
That brow
Resplendent as the autumn moon
Must have bewildered thee, I trow
And made thee loss thy senses all,"
A dim light on the pedlar now
Began to dawn, and he let fall
His bracelet basket in his haste,
And backward ran the way he came
What meant the vision fair and chaste
Whose eyes were they,–those eyes of flame?

(xvii)

Swift ran the pedlar as a hind
The old priest followed on his trace,

They reached the Ghat but could not find
The lady of the noble face
The birds were silent in the wood,
The lotus flowers exhaled a smell,
Faint, over all the solitude,
A heron as sentinel
Stood by the bank. They called in vain,
No answer came from hill or fell,
The landscape lay in shumber's chain,
E'en Echo slept within her cell.

(xviii)

Broad sunshine, yet a hust profound!
They turned with saddened hearts to go;
Then from after there come a sound
Of silver bells; the priest said low,
"O, mother, mother, deign to hear,
The worship-hour has rung, we wait,
In meek humility and fear,
Must we return home desolate?
Oh come, as late thou cam'st unsought
Or was it but an idle dream?
Vive us some sign if it was not
A world, a breath, or passing gleam."

(xix)

Sudden from out the water sprung
A rounded arm, on which they saw
As high the lotus buds among
It rose, the bracelet white, with awe,
Then a wide ripple tost and swung
Then blossoms on that licuid plain,
And lo! the arm so fair and young
Sank in the waters down again,
They bowed before the mystic power,
And as they have returned in thought,
Each took from thence a lotus flower
In memory of the day and spot.

(xx)

Years, centuries have passed away
And still before the temple shrine
Descendants of the pedlar pay
Shell-bracelets of the old design
As annual tribute, Much they own
In lands and gold, but they confess.
From that evenful day alone
Dawned on their industry,–success.
Absurd may be the late I tell
I'll suited to the marching times,
I loved the lips from which it fell
So let it stand among my rhymes.

'ছন্দের যাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তরু দত্তের কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। কবিতাটির নাম 'যোগাদ্যা'।

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখারি চলেছে হেঁকে—
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"
সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
হেসে উঠে রাঙা পথটি গাঁয়ের বাঁকা।
রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চলে
ক্ষীরের জন্য বিখ্যাত ক্ষীর গাঁয়ে;
দুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে
ঘনঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে।
গরু ও বাছুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা
ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর;
সহসা রৌদ্র ফুটিল আবীর মাখা,—
রামধনু রঙ—শোভার নাহিক ওর ...

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে যত শাখা;
চড়ুই নাচিয়া খাদ্য খুঁজিছে খড়ে।
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"

ফিরিওলা হেঁকে ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে;
দু-একটি লোক ভিন্ গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মন্থর গতি চলে,
ড্যাবা-ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
"শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!"

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হ্রদের মতন ঠাট,
ফলন্তগাছ তিন দিক করে ছায়া,
তিনদিকে গাছ একদিকে শুধু ঘাট।
বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ধব ধব করে চাঁদ্নী ঘাটের পাকা,
চাঁদনির তলে শ্বেত-পাথরের পিঁড়ি
প্রভাতের আলো খিলানে খিলানে আঁকা!
বসেছিল সেথা আয়তলোচনা নারী,—
কালো-কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতিউতি ছুটে।

(৪)

"শাঁখা চাই! ভাল শাঁখা নেবে? ওগো মেয়ে!
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
ভারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে,
অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীশঙ্খ এ-নানান্ গুণ এ রাখে;
হাত দিয়ে দেখ, দেখি মা তোমার হাত"—
কৌতুক ভরে হস্ত বাড়াল নারী,

"ঠিকটি হয়েছে মিলে গেছে সাথে সাথ!
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।"

(৫)

সোনালী রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারি!
সুন্দরী বটে!...তবু (তবে?) সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চরনেরি পানে টানে!—
প্রাণভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!.
গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,
'শাঁখার মূল্য?' পুছে শাঁখারিরে নারী,
দাম শুনি শেষে, খুসী হয়ে কহে হাসি'
পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ি।"

(৬)

"বাড়ি! কোন্ পাড়া? দাম নেব বাড়ি যেয়ে?
না, না—সন্দেহ তোমারে আমি না করি;
মা লক্ষ্মী তুমি ঘরাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে হয় রাণী রাজেশ্বরী!"
'না বাছা, পড়েছি আমি, গরিবের হাতে'
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী;
বাপের ভিটায় রয়েছি বাপের বাড়ি।
সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ?—ওই আমাদের ঘর;
বাবা ঘরে আছে, বলো গিয়ে তুমি তাঁকে,
কড়ি পাবে, দেরি হবে না, নাহিক ডর।"

(৭)

"ওযে—দেউল গো!"...দেউলেই মোরা থাকি,
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা,
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁকে ডেকো হাঁকি'
জোরে না ডাকিলে, তাঁকে বাপু ডাকা বৃথা।

দেখা হ'লে পরে, ব'ল, 'ধামাসেরা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে দেয়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা।'
দামতো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—
অভুক্ত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ি—
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহ্লাদ,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে দেন্ না ছাড়ি।"

(৮)

"হ্যাদে দ্যাখ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
তা'হলে পিতারে ব'ল মোর নাম ক'রে,—
প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা আছে পড়ি'
—সে টাকা আমার, তাই যেন দ্যান ধরে;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে;
এস বাছা, তবে...বেলা হ'ল নাহিবার।"
মুগ্ধ শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,—
'মধুমাখা কথা-জনমে সে ভোলা ভার।"
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের সোপানে নামিতে লাগিল নারী,
নিরমল জল করিল আলিঙ্গন
পদ্মের মতো চরণ দুখানি তারি।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার;
তরবারি সম প্রখরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ-সার।
কুন্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-গুরু প্রদ্যোত-দ্যুতিহার!
শান্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?

রাজা মহারাজা, সে দিঠিরে ভয় বাসে!
পথের ভিখারী শাঁখারি সে কোন ছার?

(১০)

শাঁখারি চলেছে বাঁকা পথ খানি ধ'রে
আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় একা;
সোনার কলস ঝলসে দেউল পরে,
পূজারীর ঘর পাশে তার যায় দেখা।
খাসা ঘরখানি! দুয়ার রয়েছে খোলা;
ডাহিনে গোহাল, বাঁয়ে পোয়ালের গাদা।
আঙিনার কোণে একটি ধানের গোলা,
রাঙা জবা গাছ, করবী রাঙা ও শাদা।

'টুংটাং' বাজে ঘণ্টা গরুর গলে,
মরা'য়ের পাশে চড়ুই শালিক নাচে;
অতিথি পথিকে মিলি সবে যেন বলে
'সুখ এইখানে,—শান্তি সে হেথা আছে।'

(১১)

'শাঁখা চাই,—শাঁখা।' হাকিল শঙ্খ বেনে
স্বর শুনি দ্বারে পূজারী এলেন ছুটে;
ডাকিলেন দ্বিজ তারে অভুক্ত জেনে,—
শাঁখারির মুখে আহ্লাদে হাসি ফুটে!
ডাকেন বিপ্র 'শাঁখারি, দাঁড়ারে দাঁড়া,
অতিথি আজিকে হ'তে হবে মোর ঘরে;
মায়ের প্রসাদ—নেমেছে ভোগের হাঁড়া,
আয় বাপু, আয়, কোথা যাবি দুপহরে?
ঠাকুরের ভোগ,—তাতে বামুনের বাড়ি;
হাত মুখ ধুয়ে ব'সে পড় পাত পেতে;
বেলাও দুপুর, ঠান্ডা ক'রে নে নাড়ী,
ভিন্‌গাঁয়ে যাবি,—কত দূরে হবে যেতে!

(১২)

কহিল শাঁখারি 'ঠাকুর দণ্ডবৎ,
কাজের বরাতে এসেছি তোমার কাছে;

তবু জানি মনে,— ভেবেছি সারাটি পথ—
বামুন বাড়ির প্রসাদ কপালে আছে।
পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা;
পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মতো ?
তোমার জন্য স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভালকথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু'গাছি শাঁখা;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি?—আছে ত নগদ টাকা?

(১৩)

'খুব ভালো শাঁখা—ভরা সে মীনার কাজে—
তাই এত দাম।' 'সে কিরে আমার মেয়ে?
কি বলিস্ তুই? কি বকিস্ তুই বাজে?
'তোমারি তো মেয়ে, চলনা দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ঐ পাথর-বাঁধানো ঘাটে,
ডাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা।'
হাসিয়া পূজারী কহে, তাই নাকি? বটে!
বাপু হে! তোমার সকল কথাই ফাঁকা।
কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয়;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে,—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয়!'

(১৪)

'বল কি ঠাকুর? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে?
ঠকাবার মতো চেহারা তো তার নয়;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে গেছে,
বলিস্ বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুর ঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা।' 'দাঁড়া, বাপু দাঁড়া দেখি'।
ঘরে গেল দ্বিজ—শাঁখারিরে দ্বারে রেখে।
ফিরে এসে বলে, 'তাইত! তাইত!' একি!

শাঁখার্ যে দাম বলেছিস তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই!
ঠিক পূরাপূরি কম বেশি নাই, ওরে!
কম বেশি নাই একটা পয়সা পাই!'

(১৫)

'অবাক! অবাক! বিস্ময় মানি মনে!
ধন্য শাঁখারি! জনম ধন্য তোর!
ব্রহ্মা বিষ্ণু পড়ি' যার শ্রীচরণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর!
বুড়া হয়ে গেনু পূজা-অর্চনা করি,—
তবু দরশন পাই নাই তার আমি;
ব্রত উপবাস করিনু জনম ভোর,
ঝাপসা দু'চোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী;
দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চোখে!
কি দোষে না জানি মোরে দেবী দয়াহীন
না জানি কি গুণে অভয়া সদয়া তোকে!'

(১৬)

'অবাক! অবাক! দেখা যদি গেল তার
বর মাগি' কোন্ পূরালি মনস্কাম?
চতুর্বর্গ করতলে সদা যার,—
তার কাছে তুই চাহিলি শাঁখা,
বুঝেছি, বুঝেছি...।

(১৭)

হরিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেনে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্খলিত-গতি;
ঘাটে পৌছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে
ধামসেরা-ঘাটে নাই লাবণ্যবতী!
নীরব পাখীরা, নাহিক কলধ্বনি,
নির্জন দীঘি সারস ঝিমায় একা;
সুপ্তবাতাসে উঠে মৃদু রণরণি'
পদ্মফুলের ক্ষীণ সৌরভ-লেখা!

হাঁকিল শাঁখারি, পূজারী ডাকিল কত,
নাই সাড়া নাই, বুকে নাই স্পন্দনই!
স্থল জল মূক-মুগ্ধ-মূর্ছাগত
ঘুমায়ে বুঝি বা পড়েছে প্রতিধ্বনি।

(১৮)

দিন দুপহরে নিশীথের নীরবতা
নীরব ভুবনে আঁলো ঝলমল করে;
আশাহত হিয়া-আকুল...

(১৯)

পরানে বিথারি 'অনুপম পরভাব'।
সহসা শঙ্খ-বলয়িত কার পাণি
জাগিয়া উঠিল পদ্ম দীঘির বুকে!
তারপরে ধীরে নধর সে হাতখানি
হ'ল তিরোহিত,—চক্ষেরি সম্মুখে!
শাঁখারি পূজারী—অবাক হইয়া রহে
বার বার তা'রা প্রণমে দেবোদ্দেশে;
ধামসেরা-ঘাটে পদ্ম আহরি' দোঁহে
নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল দিন শেষে।

(২০)

দিন চলে গেছে,—গেছে শতাব্দী কত,—
আজো ক্ষীর গাঁয়ে হাজারো যাত্রী মেলে
যবে দিতে আসে শাঁখা পূর্বের মতো
সেই শাঁখারির বংশের কোন ছেলে;
হরষে তাহারা দেবীরে জোগায় শাঁখা
বরষে বরষে আসি দেউলের দ্বারে,
যদিও তাদের এখন অনেক টাকা,—
ধনী তারা শাঁখা পরায় যোগাদ্যারে!
ধনী তারা নাকি দেবীর নিয়োগ পেয়ে!
দেবীর প্রসাদে দুঃখ গিয়েছে ঘুচি;
দুধে ভাতে আছে, শাঁখারির ছেলেমেয়ে
আঁচলে বেঁধেছে পরশমণির কুচি!

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অতিশয়,
মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মৃতি এরে রেখেছি খাতার পাতে।

যোগাদ্যা মন্দিরের পুরোহিত বংশের সদস্য সনৎকুমার চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বৈশাখ মাসে ক্ষীরগ্রামের কোন মানুষ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জমিতে হাল-লাঙ্গল দেন না। বৈশাখ মাস যদি তিরিশ তারিখে শেষ হয় তাহলে ঊনত্রিশে আর যদি একত্রিশে শেষ হয় তাহলে তিরিশ তারিখ বিকেলে মামা-ভাগ্নে সম্পর্ক যুক্ত যারা কোনওদিন লাঙ্গল টানেনি, এমন দু'টি ষাড় দিয়ে লাঙ্গল বের করা হয়। তার আগে ওই একমাস মা যোগাদ্যার বেদি ক্ষীরকলস নামে একটি কলসীতে জল ভর্তি করে জল রাখা হয়। হাল লাঙ্গল করার আগে যোগাদ্যা মা'র বাড়ি থেকে জল সিঞ্চন করতে করতে বিভিন্ন জমির ওপর দিয়ে যাওয়া হয় তার জন্য একসময় একটা 'ম্যাপ' করা হয়েছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক, সেই ম্যাপটা এখন আর পাওয়া যায় না।

বলাবাহুল্য, যোগাদ্যা মা'র প্রায় সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেও কৃষির সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু ক্ষীর গ্রামের কোন মানুষ বৈশাখ মাসে লাঙ্গল চালান না, তাই উপরিউক্ত দিনে লাঙ্গল চালিয়ে চাষের সূচনা করা হয়।

শ্রী চক্রবর্তীর অভিমত হল, কৃষির ওপরেই তো মন দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর করে থাকে। কুব্জিকা তন্ত্র-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিতদের ধারণা, এটি লেখা হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। মা যোগাদ্যার নাম একসময় সুদূর অবধি পৌঁছে গিয়েছিল। তা না হলে কুব্জিকাতন্ত্রে যোগাদ্যামা'র নাম উল্লেখ করা হবে কেন?

যোগাদ্যমা'র সম্পর্কে বিভিন্ন সময় সাধারণ এবং গবেষণামূলক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬৯ পৃঃ৯৯) রামানন্দ যতি বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বলা হয়েছে,

যুগাদ্যা ভবানী বন্দো ক্ষীরগ্রাম পীঠ।
বন্দিব কিরিটেশ্বরী সতীর কিরীট।।

কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী রচিত কালিকামঙ্গল-এ মা যোগাদ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্য পাওয়া যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৫৯, ৬২৬৫ নম্বর পুঁথিতে। কবি শেখর বলরাম চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। ওঁর বাবার নাম দেবী দাস আচার্য, মায়ের নাম কাঞ্চনী। কবিশেখর কাশী জোড়ার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (রাজত্বকাল ১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ ছিলেন। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যার বন্দিনু চরণ।
পাড়া অম্বুরায় কামার বুড়ি বন্দ একমন।।

রূপরাম চক্রবর্তী রচনা করেছেন ধর্মমঙ্গল। তাঁর এই রচনাকাল ১৫৮৪ শকাব্দ (১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ)। জাতিতে তিনি কৈবর্ত। বাবার নাম রঘু। বাড়ি হুগলী জেলার আরামবাগের দক্ষিণে হায়াৎপুরে। 'অনাদিমঙ্গল' নামে বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৪৫) এই কাব্যে বলা হয়েছে,

ক্ষীরগ্রামে বন্দিলাম যুগাদ্যার পা।
বলিতে না পারি মায়ের অমঙ্গল রা।।

মানিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলের রচনাকাল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। তাঁদের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বেলডিহা (অধুনা বেলটে) তিনি লিখেছেন,

ভাণ্ডার গড়ে ভাতার চণ্ডী ভয়াবিনাশিনী।
বন্দিলাম ক্ষীরগ্রামে নৃমুণ্ড-মালিনী।।

সনৎবাবু জানিয়েছেন, ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা মূলত উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দেবতা।

যুগাদ্যা মায়ের মূল বেদি থেকে একটি সুড়ঙ্গ নেমে গিয়েছে। সনৎবাবুর কাছে জানা গেছে, এই সুড়ঙ্গ কত গভীর তা জানা যায়নি। মন্দিরের চারদিকেই ছিল পুকুর। সেই পুকুরের সব জল ওই সুড়ঙ্গে ঢালা হলেও এক মুহূর্তের জন্যও তা উপছে ওঠেনি। এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে। তাই এই সুড়ঙ্গ যে অনেক নীচে নেমে গেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কিছুদিন আগে ওই সুড়ঙ্গে একটা সুতো নামিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেসময় বোঝা গিয়েছিল, ওই সুড়ঙ্গ সরাসরি নীচে নেমে যায়নি। একটু আঁকাবাঁকা আছে। যার জন্য সুতো সরাসরি নামানো যায়নি। তিনি বলেছেন, আমরা হাত দিয়ে দেখেছি, 'একহাত যাবার পরে তা উত্তরদিকে বেঁকে গেছে। সমস্ত জল সেখান দিয়ে চলে গিয়েছে।

সনৎবাবুর কাছে জানা গেছে আরও একটি বিস্ময়কর তথ্য। তাঁর ভাষায়, ওই সুড়ঙ্গ পথে চিরকাল বাস করে একটি গোখরো সাপ ও একটি ব্যাঙ। অনেকেই তাদের দেখেছে। যেমন, আমি ওই ব্যাঙটাকে দেখেছি। আমার বাবা গোখরো সাপটাকে দেখেছিলেন। অনেক পূজারী পুজোর সময় ফুল দিতে গিয়ে দেখেছেন ফুলের সাজির মধ্যে সাপটা রয়েছে। একজন পূজারী চোখে কম দেখতেন। দেখতে পাননি যে সেখানে সাপ রয়েছে। তিনি ফুলে হাত দিতেই সে ফোঁস করে ওঠে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটা প্রাইমারী স্কুল ছিল। পূজারীর চিৎকার শুনে ছাত্ররা ছুটে এসে দেখে, বেদির ওপর গোখরো সাপ ফণা তুলে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আবার সে আস্তে আস্তে ফিরে গেছে সুড়ঙ্গের ভেতরে। সাপ ও ব্যাঙ দুজনকেই দেখা গেছে রক্তবর্ণ, সিঁদুর মাখা অবস্থায়।

আর একদিন সন্ধ্যারতি সবেমাত্র শেষ হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। আমি তখন মন্দিরের মধ্যে ছিলাম। ঝড়বৃষ্টির দাপটে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম মন্দিরের মধ্যে থাকতে। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন আশ্রয় নিয়েছেন মন্দিরের মধ্যে। তখন মন্দিরের মধ্যে কোনও আলো ছিল না। শুধু একটা প্রদীপ জ্বলছিল। হঠাৎ দেখা গেল,

একটা বিরাট বড় ব্যাঙ সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এসে বেদির ওপর বসল। বলাবাহুল্য, তাঁর শরীরও সিঁদুরে রক্তবর্ণ হয়ে রয়েছে। তারপর থপথপ করে সে গর্ভ মন্দিরের মধ্যে ঘুরল। কয়েক মিনিট পরে চন্দনপিঁড়ির ওপর বসে টুকটাক কি সব খেতে শুরু করল। তবে একসঙ্গে দু'জনকে কেউ দেখেনি। আশ্চর্যের বিষয় হল, সাপ এবং ব্যাঙ—দু'জনের তো খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। কিন্তু দু' জন কি করে একজায়গায় থাকে তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

অন্নদামঙ্গলের রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম আজ আর কারও অজানা নয়। ওঁর বাবার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিনি বর্ধমান প্রদেশের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়া, পোঁড়া, পোঁড়ো বসন্তপুর, পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়। ওঁর বাবা 'রায়' এবং 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ তথা সবচেয়ে ছোট ছেলে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে, তাঁর জন্ম ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন বাংলার নবাব আলি বর্দি খাঁ। নদীয়ার নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) কবিকে 'কবিগুণাকর' উপাধি দান করেন। তিনি উক্ত রাজার সভাকবি ছিলেন। রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

তিনি পারস্য, ব্রজবুলি, হিন্দি, সংস্কৃত ও যাবনিক শব্দেও কবিতা রচনা করিয়া ভাষাজ্ঞতার চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। অন্নদামঙ্গলের তিনটি খণ্ড। ১ম অন্নদামঙ্গল, ২য় বিদ্যাসুন্দর, ৩য় ভবানন্দ মজুমদার (কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ; মজুন্দার—রাজস্বের হিসাব লেখক)-এর পালা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রায়গুণাকর "ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে সতীর ডান পায়ের আঙুল পড়েছিল তার উল্লেখ আছে। 'রায় ভ্রমণ' প্রবন্ধের লেখক পঞ্চানন রায় রাঢ় ভ্রমণের সময় ১৩০৮ সালে যোগাদ্যা মা'র মূর্তির নির্মাতা প্রস্তরশিল্পী নবীন চন্দ্র ভাস্করের, তাঁর দাঁইহাটের বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তখন শিল্পীর বয়স ছিল ৭০ বছর। পাথর ছাড়াও ভিন্ন ধাতুর দেবীমূর্তির গঠনেও নবীন্দ্রচন্দ্রের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। দিনাজপুরের মহারানী শ্যামমোহিনী, নবীন ভাস্করের তৈরি কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্তির শিল্পনৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নবীনচন্দ্রকে সোনার বাঁটালি পুরস্কার দিয়েছিলেন। ইংরেজি ১৯০৮ সালে শিল্পী নবীনচন্দ্রের জীবনাসান হয়। ওই সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের রাজবংশের দেবীমূর্তি তৈরি করতেন।

ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা মা'র মূর্তিটিও তৈরি করেন নবীনচন্দ্র। ওই মূর্তির ছবি তোলার জন্য দৈবাদেশ পাওয়া যায়। এই মূর্তি বারোমাস স্থানীয় একটি বড় পুকুরে রাখা হয়, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কথিত আছে, একদিন দেবী রাজা হরিদত্তকে স্বপ্নে আদেশ দেন, প্রতিদিন একটি করে নরবলি না পেলে তিনি রাজ্য ধ্বংস করবেন। দেবীর এই আদেশ শুনে ক্ষীরগ্রামের অধিবাসীরা ভয়ে যে যেদিকে পারলেন পালাতে থাকেন। বীরাচার পরায়ণ শক্তিভক্ত রাজা হরিদত্ত সাতদিনে সাতছেলে বলি দিয়ে স্বপ্নাদেশ পালন করেন।

একদিন পুরোহিতের ছেলের নরবলির পালা আসে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেকে হারানোর ভয়ে রাতে সপরিবারে পালানোর উদ্যোগ নেন। এই সময় ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে পুরোহিতকে দেবী অভয় দিয়ে বলেন, 'ব্রাহ্মণ! তুমি নিজগৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আজ রাত্রিতে রাজাকে প্রত্যাদেশ করিব যে, কল্য হইতে নরবলি রহিত হইবে।' ব্রাহ্মণ কন্যার সেই আশ্বাসে ব্রাহ্মণ বাড়িতে ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে রাজা ভদ্রকালীর প্রত্যাদেশের কথা ঘোষণা করেন। সেই থেকে আর নরবলি দেওয়া হয় না ক্ষীরগ্রামে। একই সঙ্গে দেবীর আদেশে ভদ্রকালী মূর্তির পরিবর্তে পৌরাণিক ধ্যানের অনুযায়িনী দশভূজা মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজা নবীনচন্দ্র ভাস্করকে আগের মূর্তির মতো অবিকল একটি মূর্তি গড়ার আদেশ দেন। কিন্তু মূর্তি তৈরি হবার পর কোন্‌টা নতুন, কোন্‌টা পুরনো তা বোঝা যায়নি।

নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'-র মাধ্যমে জানা যায়, আরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে হিজরী ১০৯০ (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরডিহি নিবাসী উত্তর রাঢ়ীর কায়স্থ ও মিত্রবংশ সম্ভূত বঙ্গাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত অর্ধবঙ্গে কানুনগো হরিনারায়ণ রায় প্রসিদ্ধ পীঠস্থান যোগাদ্যা দেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য ১৬ শত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন (৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

মাটিয়ারী নিবাসী নিবারণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কাটোয়ার ইতিহাস বইতে কিছু অভিনব বিষয় জানা যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

'যোগাদ্যাবির্ভাব সময়ে ক্ষীরগ্রামে হরিদত্ত নামাজনৈক পরমধার্মিক প্রজাবৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রবল পরাক্রম, অতুল দান, পাণ্ডিত্য, বিপুল যশোখ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। একদিন যামিনীর তৃতীয় যামে হরিদত্তর প্রতি জগদম্বার স্বপ্নাদেশ হইল যে, উৎস! আমি তোমার ধর্ম-প্রবণতার আকৃষ্ট হইয়া কৈলাসধাম পরিত্যাগপূর্বক তোমার ক্ষীরগ্রামে আবির্ভূতা হইলাম। তুমি নিত্য নরবলি দ্বারা আমায় তৃপ্তিসাধন কর এবং আমার এই আদেশবাক্য যথাযথ প্রতিপালন করিবে। তাহার অন্যথা হইলে তোমার রাজ্য ধ্বংস এমনকি বংশ পর্যন্ত লোপাপত্য হইবে।

আমার আদেশে পুণ্যময় বৈশাখমাসে ক্ষীরগ্রামে কেহ মৃত্তিকা খনন করিবে না, কেহ দীপবর্তিকা প্রস্তুত করিবে না; কেহ পাকান্নে দণ্ড প্রদান করিবে না এবং তোমার ক্ষীরগ্রামে যেন কখনও কুণাল চক্র ঘূর্ণিত না হয়। সমস্ত বৈশাখ মাস স্ত্রী-পুরুষে একশয্যায় শয়ন করিবে না এবং এ মৃত্তিকায় বৈশাখ মাসে যেন কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়। কেহ রৌদ্র তাপক্লিষ্ট হইয়াও তন্নিবারনার্থে বৈশাখ মাসে মস্তকে ছত্রাবরণ করিবে না! কেহ ধান্য হইতে তণ্ডুল উৎপাদন করিবে না এবং আদ্যন্ত বৈশাখের পঞ্চম দিবসে অলক্ত ব্যতীত কেহ মসীদ্বারা লিখন কার্য সমাধান করিবে না! কেহ বৈশাখ মাসে ক্ষীরগ্রামে ভূমিতে হালচালনা করিবে না এবং উত্তরদ্বারী ঘরে কেহ বসবাস করিবে না! প্রতি বৈশাখ সংক্রান্তিতে আমার প্রস্তরময়ী প্রতিমা পূজা চিরতরে স্থিরত্তর থাকিবে! কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমার সান্নিধ্যে আরত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবে!

ওই গ্রন্থে দেবীর নরবলি দেওয়ার আদেশে যখন পূজারী ব্রাহ্মণ গ্রাম থেকে পালাচ্ছিলেন তখন দেখেন ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে দেবীকে-একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকন্যাবেশী দেবীকে ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, 'আমি দায়ে পড়িয়া ক্ষীরগ্রাম ত্যাগ স্থির করিয়া পলায়ন করিতেছি। ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যানাম্নী এক রাক্ষসী আসিয়াছে। নরবলি ভিন্ন রাক্ষসীর উদর পূর্ণ হয় না। আমাদের মহারাজের সাতপুত্র এবং গ্রামবাসীর সকলেরই এক একটা সন্তান ভক্ষণ করিয়াছে। মা! এই কালরাত্রি প্রভাত হইলেই আমারই সর্বনাশের দিন আসিবে। আমার বংশধর একমাত্র পুত্র, সেই রাক্ষসীর কবলিত হইলেই আমাকে নির্বংশ হইতে হইবে। দেবি! আমি কেবল বংশ রক্ষার জন্যই রাজাদেশ লঙঘন করিয়া গ্রামান্তরে পলায়ন করিতেছি। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা যোগাদ্যা হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস!

যে ভয়ে পালাও তুমি।
সেই মহাদেবী আমি।।

তুমি ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে অভয় দিতেছি;... কল্য হইতে আর কাহাকেও নরবলি দ্বারা আমাকে পূজা করিতে হইবে না।

নিবারণ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাটোয়ার ইতিহাস' বইতে উল্লেখ করা আছে, ক্ষীরগ্রামে দেবীর শাঁখা পরার অত্যাশ্চর্য কাহিনী—

ক্ষীরগ্রামে ধামাচ নামে একটি দীর্ঘায়তন দিঘী আছে। সেই দিঘীর ঘাটে একটি অসামান্যরূপা লাবণ্যময়ী বালিকা একদিন একাকিনী স্নান করিতেছিলেন। ঘাটে জনমানবের সমাগম নেই। এমন সময় ভানু দত্ত নামক জনৈক শঙ্খ বণিক দীর্ঘিকা তীরস্থ বর্ত্মে শঙ্খ বিক্রয়ার্থে ক্ষীরগ্রামে গমন করিতেছিলেন। স্নাননিরতা বালিকা বণিককে ডাকিয়া কহিলেন, আমাকে শাঁখা পরাইয়া দাও। আমি যোগাদ্যার পূজক ব্রাহ্মণের কন্যা। শাঁখা পরাইয়া আমাদের বাড়ি গিয়া বলিবে,

গম্ভীরের কোলঙ্গিতে পাঁচতঙ্কা আছে।
শাঁখা দিয়া লবে গিয়া জনকের কাছে।।

শাঁখারি নিঃশঙ্কমনে শঙ্খেশ্বরীকে শাঁখা পরাইয়া গ্রামে গিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে, বলিলেন, ঠাকুর! তোমার কন্যা ধামাচের ঘাটে আমার নিকট শাঁখা পরিয়া গম্ভীরের কোলঙ্গীতে পাঁচটা টাকা আছে, তাহা আমাকে লইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক। একি আমার তো কন্যা নাই! তবে কে শাঁখা পরিল। তাহার পর টাকার জন্য কোলঙ্গী সন্ধানে গিয়া দেখিলেন, সত্যই পাঁচটা টাকা রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল! হৃদয় মধ্যস্থিত ভক্তি তরঙ্গিনী নয়ন পথে দর দর প্রবাহিত হইয়া গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিল। ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বণিককে বলিলেন, ভাই! তোর পরম সৌভাগ্য, আশীর্বাদ কর; যেন তোর সৌভাগ্যের অংশভাগী হইতে পারি।

এ শঙ্খ হইতেই তুই নিঃশঙ্খ হইলি। তুই ভাই যে কন্যাকে শাঁখা পরাইয়াছিস, তিনি

কন্যারূপিণী যোগমায়া যোগাদ্যা। তুই যুগে যুগে কত যোগ সাধন করিয়া আজ যোগাদ্যার দর্শন পাইলি। আয় ভাই আয় তোর ঐ যোগাদ্যা স্পর্শিত পবিত্রদেহ স্পর্শ করিয়া আমার এই পাপদেহ পবিত্র করি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শঙ্খবণিককে অঙ্কে স্থাপন করিলেন। বলিলেন, চল, ভাই চল, একবার সেই মেয়েটাকে আমায় দেখাইয়া দে। তুই সঙ্গী না হইলে তাঁর সাক্ষাৎ পাইব না। শাঁখারির সঙ্গে ধামাচের ঘাটে উপস্থিত হইয়া মা মা শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। বহ্বায়াসে মায়ের সাক্ষাৎ না পাওয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন—পাষাণ নন্দিনী। তোর দরশন বঞ্চিত হইয়া এই ঘাটে ব্রহ্মহত্যা হইতেছি। ব্রাহ্মণ আত্ম-বধোদ্যত হইলে ভগবতী যোগাদ্যা সলিলমধ্য হইতে সশঙ্খ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। ব্রাহ্মণও তদ্দর্শনে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়া হাস্যবদনে ভবনে গমন করিলেন। অদ্যাবধি সেই শঙ্খবণিকের বংশধর যোগাদ্যা পূজায় বিনামূল্যে শঙ্খপ্রদান করিয়া আসিতেছে।

দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে আজও ঘটে নানান অলৌকিক ঘটনা। বছর কয়েক আগে দেবীর মন্দিরের সামনে জনৈক ব্যক্তি পাপ স্খলনের জন্য হত্যে দিয়েছিলেন। কোনও একসময় ওই ব্যক্তি মাকে পদাঘাত করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তার কুষ্ঠরোগ হয়। রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি জামালপুরে তার গুরুর কাছে শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ওই জায়গায় ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন। ওই রোগগ্রস্ত মানুষটির কাছে শোনা যায়, ধর্মরাজ ঠাকুর তাকে স্বপ্ন দিয়ে বলেন, ক্ষীর গ্রামের মা যোগাদ্যা মন্দিরে তুমি হত্যে দিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হও এবং স্বপ্নাদেশ হয় যে, ওই গ্রামের জনৈক ব্যক্তির পদধূলি নিলে তুমি রোগমুক্ত হবে। দেখা গেল, এক বছরের মধ্যে তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। আজও রাত ন'টার পরে মায়ের মন্দির চত্বরের মধ্যে কেউ থাকেন না। বলা যায়, কোন বিশেষ কারণে ওই সময়ের পরে সেখানে কেউ থাকতে পারেন না।

এখনও প্রতি সংক্রান্তিতে এখানে বলি হয়। এছাড়াও যাদের মানসিক থাকে তারাও এখানে বলি দেন। দুর্গানবমীর দিন বলি দেওয়া হয় মোষ, ছাগ আর ভেড়া। এখানে শক্তি মতে পুজো হয়। উপকরণের মধ্যে থাকে মদ ও মাংস। তবে এখানে কোনও অনাচার হয় না। কখনও কোন ভিন দেশের মানুষ এখানে এলে তাকে কেউ বিরক্ত করে না।

রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বর্ধমান রাজ বংশানুচরিত' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে জানা যায়, কীর্তিচন্দ্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে যে সকল জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাপীঠস্থান ক্ষীরগ্রামও তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপাতিত হয়। তথায় দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব বিরাজমান আছেন। কীর্তিচন্দ্র এই স্থানের অধিকারপ্রাপ্ত অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে দেবীর একটি রত্নবেদি, মন্দির, শয়নগৃহ ও গর্ভমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। রত্ন বেদিতে একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে, কিন্তু তার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই পড়িতে পারা যায় না। অদ্যাবধি দেবীর পূজাদি রাজ সরকার হইতেই সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব রেল বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ (২য় খণ্ডে) বলা হয়েছে, কাটোয়া জংশন হইতে কৈচর ১০ মাইল দূর। ক্ষীরগ্রামের দেবীর দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীর খণ্ডক। দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর ধরিয়া একটি দীঘির জলে ডুবানো থাকে। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন জল হইতে দেবীকে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করা হয় ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে।

যোগাদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, একবার দেবী যোগাদ্যা একটি কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জল মধ্য হইতে শঙ্খশোভিত হস্ত উত্তোলিত করিয়া শাঁখারী ও স্থানীয় ধনী সেবাইতে উহা দেখান। এই কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্তের একটি সুন্দর ইংরেজি কবিতা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবাদ, 'পূর্বে যোগাদ্যার পূজার দিন প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একটি করিয়া নরবলি হইত।'

'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৭২) (পৃষ্ঠা ৯৯) প্রকাশিত শৈলেন্দ্র নাথ সামন্ত তাঁর বর্ধমানের লোক সংস্কৃতি প্রবন্ধে 'বৃন্দাবন দাস'-এর উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় ঃ—

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণ
বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করে।
দেবতা জানেন সভে চণ্ডী বিষহরি
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি
ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, অট্টহাসের ফুল্লরা।

হরিগোপাল ঘোষাল সম্পাদিত 'কাটোয়া দর্পণ'-এর শারদীয় সংখ্যায় উল্লেখ আছে, ক্ষীরগ্রাম—ক্ষীর+গ্রাম। একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ। দেবীর নাম যোগাদ্যা। দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। সমুদ্র মন্থনে বিষ উঠেছিল। শিব সেই বিষপান করে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করেন, তারারূপে দেবী স্তন্যদান করে শিবকে বিষমুক্ত করেন। দুধের আর এক নাম ক্ষীর। নীলকণ্ঠ হয় ক্ষীরকণ্ঠ। এই ক্ষীর হতে 'ক্ষীর' নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ মনে করেন 'ক্ষীর' নাম বৈষ্ণব সংস্কৃতিযুক্ত। মাঝিগ্রাম—মাঝি + গ্রাম-মাঝিগ্রাম। সংক্ষেপে মাঝ গাঁ।

ক্ষীরগ্রামে 'যোগাদ্যা' ঠাকুরের প্রাঙ্গনে প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে "গুয়াডাকা" নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন গ্রামের অগ্রহারিকগণ এই গুয়াডাকা অনুষ্ঠানে সমবেত হন। সকলকে 'পানসুপারি' দেওয়া হয়। অবশেষে 'মাঝ' কথাটি উচ্চারিত হলে অনুষ্ঠান শেষ। এক শ্রেণীর অগ্রহারিক এই গুয়াডাকার 'মাঝ' রক্ষা করতেন। যাঁরা মাঝ রক্ষা করেন তাঁদের উপাধি 'মাঝি'। অগ্রহারিক মধ্যে 'মাঝ' উপাধি লক্ষিত হয়। এই মাঝ রক্ষাকারীদের গ্রাম হতে 'মাঝিগ্রাম'। সংক্ষেপে 'মাঝ গাঁ' এই নামের দ্যোতক।

নিউ জার্সির প্রিন্সটন ওয়ান-এর প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত জর্জ মাইকেল সম্পাদিত ব্রিক টেম্পলস্' অব বেঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ আছে :—

Princeton University Press, Princeton 1, New Jercy. 1982 48. The bangla

design was probably quite common for the entrance, only a few examples Surviving, ek-bangla gateway to the Radha Madhava temple at Bishnupur, for bangla gateway to the jogadya temple at kshirgram.

Page 50 : Temples outside regular classification. On the Jogadya temple at Kshirgram the stephas has been repeated a second time higher up as an aesthetic feature.

বর্তমানে ক্ষীরগ্রামের ন'ঘর সেবাইত আছেন। তার মধ্যে সনৎকুমার চক্রবর্তীদের বংশের পালা থাকে সাত মাস। প্রতি মাসে তাদের পালা থাকে ছ'দিন।

দেবীর ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠ। 'রাঢ়ের ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা' বইটির লেখক সনৎকুমার চক্রবর্তীর কাছে জানা গেছে, অনেক সাধক এই সতীপীঠে সিদ্ধি লাভ করেছেন। অনেকেই আসনের মাঝে থাকা সুড়ঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছেন। শেষ যিনি ওইভাবে আত্মত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়, তাঁর নাম গঙ্গাধর। শ্রী চক্রবর্তী জানান, তিনি দেহত্যাগ করেছেন অনেকদিন আগে। আমার বাবা-ঠাকুর্দা এই নাম শুনেছেন। পরে আমরাও শুনেছি। অনেক পণ্ডিতের ধারণা, ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে কুব্জিকাতন্ত্র লেখা হয়। সেখানে ক্ষীরগ্রামের মা যোগাদ্যার কথা উল্লেখ আছে।

মন্দিরটি তৈরি হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের কিউরেটর মন্দিরের একটি ইট নিয়ে গবেষণা করে গবেষণালব্ধ বিষয়টি ১৯৬১ সালে কালনা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, মূল মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়। মন্দিরের গোল গম্বুজটি তৈরি হয় মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আমলে। আনুমানিক সতেরোশ চল্লিশের মধ্যে এটি তৈরি হয়।

নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদের কাহিনী' বইটি থেকে জানা যায়, ঔরঙ্গজেব বাদশার আমলে হিজরি ১০৯০, ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরদিহি নিবাসী উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও মিত্র বংশীয় সম্ভূত গঙ্গাধীকারী উপাধিপ্রাপ্ত হরিনারায়ণ রায়, পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য ষোলশত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁর আর্থিক আনুকূল্যেই মা যোগাদ্যার সেবার কাজ চলত।

তার আগে হরিদত্ত নামে এক স্থানীয় জমিদার ছিলেন। তিনিই এই দায়িত্ব বহন করতেন। কথিত আছে, পাতাল থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন হনুমান এবং রামচন্দ্র এখানে মায়ের পুজো করেন। তখন দেবীর নাম ছিল ভদ্রকালী, পরে নাম হয় যোগাদ্যা। তবে কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায়, মায়ের নাম হল যুগাদ্যা। যুগাদ্যা নামটি এসেছে যুগশ : আদ্যা থেকে আর যোগাদ্যা হল যোগীনাং আদ্যা। যে, যেভাবে দেবীর ব্যাখা করেছেন। আদি গ্রামটি ছিল দীঘির চারধারে, যেখানে মা শাঁখারিকে দর্শন দিয়েছিলেন। এই দীঘির আয়তন প্রায় একশ একর। বর্তমানে যেখানে মায়ের মন্দির রয়েছে, সেটি বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রামটি যখন আবিষ্কার হয়, তখন মাকে কেন্দ্র করে জায়গাটি গড়ে ওঠে। এখানে ব্রাহ্মণ, উগ্র-ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে

আসছেন। আপাতত আনুমানিক হাজার ছয়েক মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

তবে দেবীকে কেন্দ্র করে তেমন কোনও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি।

মাঘ মাসের সাকরী সপ্তমী তিথিতে এখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তখন দু'জনকে বর কনে সাজানো হয়। এই বর কনের সাজে সেজে মালি (মালাকার) ও তাঁর স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ান। সেখানে বর্তমানে যাঁর বাড়ি তিনি তাঁদের বরণ করে নেন। এই প্রথা আজও চলে আসছে।

চৈত্রমাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাদ্যকারেরা মায়ের মন্দিরের সামনে গভীর রাতে (সাড়ে বারোটা-একটা-দেড়টা পর্যন্ত) বাজনা বাজান। সারা মাস তাঁরা হবিষান্ন খেয়ে থাকেন। পরিষ্কার কাপড় পরে ও সাতপুরু কাপড় কোমরে ও চোখে বেঁধে তাঁরা মন্দিরের সামনে যাবে। ওদের গন্তব্যস্থল সীমাবদ্ধ থাকবে আটচালা আর মন্দিরের মাঝের জায়গা অবধি। জনশ্রুতি, এই সময় দেবীর চ্যালাচামুণ্ডারা বাজনার তালে তালে নৃত্য করে। তাই সেই দৃশ্য যদি কারও দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে ভয় পেয়ে যাবে। ওই ঢাকিরা সারা বছর গ্রামের বিভিন্ন জায়গায়, শিবের গাজনের সময় তারা যে তাল বাজায়, ওই সময় সেই বত্রিশটি তালই বাজিয়ে থাকেন। তিনশ বছর আগে এখানে নরবলি হত। ১৮৩৮ সাল থেকে নরবলি প্রথা রোধে আইন প্রণয়ন করা হয়। (এই প্রসঙ্গে জনশ্রুতির বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে এখন নরবলি না হলেও বুক চিরে নররক্ত মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

আজও মায়ের থানে নানান অলৌকিক ঘটনা ঘটে। অনেকে আজও এখানে এসে হত্যে দেন। এমনও হয়েছে, মায়ের ভোগের মাছ চিলে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যথাস্থানে মাছটি রয়েছে। রাত দশটার পরে মন্দির চত্বরে কেউ থাকেন না। নিত্য পূজার উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় ছোলা আর পাটালি। দুপুরে দেওয়া হয়, ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ-পায়েস। আজও একই নিয়মে চলেছে মায়ের পুজো। দেবী জাগ্রতা এ বিশ্বাস রয়েছে সকলের। যুগ যুগ ধরে এই সতীপীঠে মায়ের পূজার্চনা চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

মহাতীর্থ কালীঘাট

পীঠমালায় দেখা যায়, কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়ে বলে জায়গাটি পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানকার দেবতা কালী ও পীঠ রক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বর। চূড়ামণি তন্ত্রে বলা আছে,

নকুলেশঃ কালীঘাটে দক্ষপাদাঙ্গুলিষু চ।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা।।

সতী স্নেহবশত শিব-লিঙ্গরূপ ধারণ করে কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করেন এবং ব্রহ্মা এখানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করেন।

নিগমকল্পের পীঠমালায় সুদর্শন ছিন্ন সতীঅঙ্গ কতটুকু কালীঘাটে পড়েছে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

শ্রী মহাদেব উবাচ।

"মাতঃ পরাৎপরে দেবি সর্বজ্ঞান ময়ীশ্বরী ক্ষেত্রনাং কথ্যতে দেবি কালীক্ষেত্রং বিশেষত দেব্যুবাচ।

"দক্ষিণেশ্বর মারভ্য যাবচ্চবহুলা পুরী।
ধনুরাকার ক্ষেত্রঞ্চ মোজনদ্বয় সংখ্যকং।
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশমাত্রং ব্যবাস্থিতঃ।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মকং।
মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
তত্র ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভং।।
কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্র মভেদোপি মহেশ্বরঃ।
কীটোপহি মরণেমুক্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ।।
ভৈরবী বগলা বিদ্যা (কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডীচাষ্ঠশক্তি বসেৎ সদা।।

যে জায়গাকে এখন কালীঘাট বলা হয়, বিশেষ কোনও প্রাচীন নাম না থাকলেও তা যে পুরাণের 'সমতট' প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা দক্ষিণ বাংলার রসাতল প্রবেশের বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন (Physical Geography by S.A. Hill-Page-44)। তাদের মতে কলকাতা ও তার কাছের জায়গাগুলি ক্রমশ নীচের দিকে এগিয়ে গেছে। এসব জায়গায় প্রাচীন ক্ষেত্রগুলি ওপর দিক থেকে অনেকটাই বসে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে জায়গাটি এখন কালীঘাট

হিসেবে চিহ্নিত আছে, তার অনেক নীচের জমিতে অনেকদিন আগে মানুষেরা বসবাস করতেন। ক্রমশ রসাতলে চলে যাওয়ায় জায়গাটি মানবশূন্য হয়ে যায়। ফলে এই জায়গাটি আবার মানুষের বাসযোগ্য হওয়ার জন্য অনেক সময় লাগে।

মহাভারতে আছে জরাসন্ধের ছেলে সহদেব মগধে রাজত্ব করতেন। পুরাণে সহদেবের পরে অজাতশত্রু পর্যন্ত পঁয়ত্রিশজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অজাতশত্রুর সময় বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হন। এই সময় উত্তর বাংলায় সিংহবাহু নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বিজয় সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে দূষিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও সভাসদেরা ষড়যন্ত্র করে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। বিজয় সিংহ সাতশজন সঙ্গীকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেন ও সিংহলে গিয়ে সেখানকার রাজা হন। বিজয় সিংহের যাত্রা বর্ণনায় দক্ষিণ বাংলার কোনও জায়গার নামের উল্লেখ নেই। হয়তো সেইসময় কালীঘাট ও তার আশেপাশের জায়গা গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। হিন্দুধর্মের প্রচারকেরা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রচারে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক উপাসনার প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাতেন ও সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রচার চালাতেন। বলা হয়, এই সময়ের আগে উপপুরাণ ও তন্ত্র সংকলিত হয়। অন্যদিকে ওইসময় তান্ত্রিক কাপালিকেরা নির্বিবাদে বনের মধ্যে তন্ত্রশক্তির উপাসনা করতেন। তাই উপপুরাণ ও তন্ত্রে যে কালীক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তা এই দক্ষিণ বাংলার কালীঘাটের নামান্তর মাত্র। তন্ত্রের বচনে (৩২ পৃষ্ঠায়) এর উল্লেখ আছে। সুতরাং, সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, এই সময়ের অনেক আগে এবং বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পরে কালীপীঠের প্রকাশ হয়েছিল।

অনুমান করা যায়, হিন্দু বণিকেরা যখন জলপথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি জায়গায় ব্যবসা করতে যেতেন তখন অনেকেই কালীক্ষেত্রে পুজো দিয়ে যেতেন। মাঝি মাল্লারা কালীক্ষেত্রের তীরে যেখানে নৌকা রাখতেন সেই জায়গাকে কালীদেবীর ঘাট বা 'কালীর ঘাট' বলা হত। ক্রমে সেই জায়গাটি কালীঘাট নামে পরিচিত হয়।

কালীঘাটের কালীমূর্তি আবিষ্কারের প্রসঙ্গে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। এর অন্যতম হল :

প্রায় তিনশ বছর আগে কালীঘাটের মন্দির তৈরি হয়। সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশের কোনও ব্যক্তি ওই অঞ্চলে বিশেষ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি, ওই জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির তৈরি করান ও মা কালীর সেবায় ১৯৪ একর ভূসম্পত্তি দান করেন। একমতে, চণ্ডীবর নামে এক ব্যক্তি প্রথম মা কালীর সেবার জন্য পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন। মা কালীর বর্তমান সেবাইত ও অধিকারী হালদারেরা এই চণ্ডীবরের সন্তান। (দ্রষ্টব্য ঃ W.W. Hunter, statistical account of Bengal, Vol 1, Page 101)।

ডবলু ডবলু হান্টার চণ্ডীবরকে মায়ের প্রথম সেবাইত হিসেবে চিহ্নিত করলেও এ

সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। অন্যমতে, খনিয়ান গ্রামের সুরাইমেলের কাশ্যপ গোত্রীয় চণ্ডীবর কালীঘাটের প্রথম সেবাইত ছিলেন না। চণ্ডীবরের ছেলে পৃথ্বীধর তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে আর বাড়ি না ফেরায় ভবানীদাস বাবাকে খুঁজতে কালীঘাটে আসেন। তখন যশোরের কায়স্থ রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কালীঘাটে মা কালীর সেবাইত ছিলেন। ভবানীদাস স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বরের অনুরোধে তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে কালীঘাটে বসবাস করতে থাকেন। কিছুদিন পরে ভবানীদাসের, রাঘবেন্দ্র নামে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে ভবানীদাসের, রাজেন্দ্র নামে আরও একটি ছেলে হয়। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই ভবানীদাস মা কালীর সেবাইত নিযুক্ত হন। তখন ভবানীদাসের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যাদবেন্দ্র কালীঘাটের কাছে গোবিন্দপুরে বসবাস করতে শুরু করেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, চণ্ডীবর পঞ্চদশ শতকের শেষ বা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে সেখানে থাকতেন। বড়িশার সাবর্ণ জমিদারেরা সপ্তদশ শতকের প্রথমে মানসিংহের কাছ থেকে জমিদারী পান। কাজেই সাবর্ণ জমিদারদের চণ্ডীবরকে কালীর সেবাইত নিযুক্ত করা সম্ভব নয়। কালীর বর্তমান সেবাইত হালদাররা চণ্ডীবরের সন্তান শুনেই হান্টার সাহেব সম্ভবত চণ্ডীবরকে মা কালীর প্রথম সেবাইত বলেছেন।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'প্রাচীন কলিকাতা' বইতে লিখেছেন,

কালীকাদেবীর আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর (যাঁর নামানুসারে ওই জায়গা আজও চৌরঙ্গী নামে পরিচিত) বিবরণ—প্রদীপ গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে। ওই গ্রন্থানুসারে পনেরোশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুরে (তখনকার কালীঘাট) মা কালীর পূজার্চনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে আর একটি তথ্যের সংযোজন করা প্রয়োজন। লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (সাবর্ণ চৌধুরী) মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) কাছ থেকে জায়গীর পাওয়ার পর বেহালা গ্রামে বাস করতে শুরু করেন। তিনিই বর্তমান কালীঘাটের মন্দির তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুরে মা কালীর পূজার্চনা শুরু হওয়ার অর্থ হল বর্তমান মন্দির তৈরির আগেই সেখানে মা কালীর পুজো করা হত। কারও কারও মতে, গোবিন্দপুরে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ছিল। তাদের মতে, মা কালীর মন্দির গোবিন্দপুর থেকে বর্তমান কালীঘাটে স্থানান্তরিত করা হয়।

লেখক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, গোবিন্দপুরের পুরনো নাম কালীঘাট এবং বর্তমানে যেখানে জি.পি.ও. (জেনারেল পোস্ট অফিস) আছে সেখানেই ছিল মা কালীর মন্দির। আবার অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, লক্ষ্মীকান্ত বেহালায় বসবাস করার সময় কালীঘাটে মন্দির তৈরি করান। তিনি লিখেছেন, সাবর্ণ চৌধুরীর জীবদ্দশায় ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি হয়। প্রশ্ন জাগে, সাবর্ণ চৌধুরী বলতে লেখক কি লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে বুঝিয়েছেন? তাহলে তো ওই সময় লক্ষ্মীকান্তর

জীবিত থাকার কথা নয়। কারণ তিনি ১৫৭০ থেকে ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণক কলকাতায় আসেন।

প্রমথনাথ মল্লিক তাঁর 'কলিকাতার কথা' বইতে (আদি কাণ্ড পৃষ্ঠা১—২) লিখেছেন, কালীদেবী কবে কলকাতা হইতে কালীঘাটে যান তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরূহ, তবে এই পর্যন্ত শোনা যায় ও প্রবাদ এই যে, বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল। সেই পুরাতন পাথরে বাঁধান ঘাট হইতে বর্তমান পাথুরিয়াঘাটার নাম হইয়াছে। সেকালে বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে ঐ ঘাটের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাত্রীর ও হাটের কথা আছে। ২০৩ নং দরমাহাটা স্ট্রীটে ঠিক পানপোস্তার উত্তরে, দেবীর পুরাতন মন্দির পূর্বে সেইখানেই বর্তমান ছিল (২৩৫ নম্বর দরমাহাটায় শিবের মন্দির আছে)। কাপালিকেরা দেবীকে কালীঘাটে লইয়া যায়। সেকালে তাহাদিগকে সকলেই বড় ভয় করিত, কারণ তাহারা দেবীর নিকট নরবলি দান করিত, তাহাতে তখন কেহই তাহাদের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। শোনা যায় যে, ঐ স্থানের অধিকারীগণের পূর্বপুরুষ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দেবীর স্বপ্নাদেশে সেই জায়গায় তাঁহার মন্দির ছিল জানিতে পারে ও তাঁহার পূজাদি করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি ঐ বংশের সকলেই পৃথক হইয়া গেলে তাহারা পৃথক্ পৃথক কালীপূজা করিয়া থাকে। তাহারা দুর্গাপূজা সেরূপ করে না। বর্তমান বসতবাড়ি হইবার পূর্বে ঐখানে সাগর দত্তের পাটের কল ছিল, উহাতে তিনবার আগুন লাগিয়াছিল ও বর্তমান বসত বাড়িতে বজ্রাঘাত করে।

প্রমথনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, কালীকা-থা থেকে কালীকাথা পরে কলিকাতা হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, কালীদেবী কবে কলিকাতা হইতে কালীঘাট যান তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরূহ। এরপর তিনি অনুমান করে বলেন, বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল এবং এই পাকাঘাটই বাঁধানো বলে পাথুরিয়াঘাটের নাম হয়।

কিন্তু এই নাম পাথরে বাঁধানো থেকে হয়নি। হয়েছে অন্য কারণে। ধর্মানন্দ মহাভারতী 'বঙ্গের রাজবংশ' গ্রন্থের 'কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা' রাজবংশ অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ১৯) পাথুরিয়াঘাটার নামকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

বিহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি নানাস্থানে কুলটাকামিনী অথবা ব্যবসায়িনী বেশ্যার অপর নাম পাথুরিয়া। পতিতাদের পশ্চিমের মানুষজন ভদ্রভাবে 'পাথুরিয়া' নামে সম্বোধন করে। পুরাণ প্রসিদ্ধ অহল্যা, যিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাপমুক্তা হয়েছিলেন, কুলটাপরাধে অভিশাপগ্রস্তা হয়ে পাথরে পরিণত হন। এই পাথর শব্দ থেকে পাথুরিয়া শব্দের উৎপত্তি। হিন্দি ভাষায় 'ঘাটা' অর্থে পাড়া, পল্লী অর্থাৎ মহল্লা বোঝায়। সেই অর্থে পাথুরিয়া শব্দের সঙ্গে ঘাটা যোগ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কালীঘাট ইতিবৃত্ত' বইতে (পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩) অন্য ধরনের কিংবদন্তীর সন্ধান পাওয়া যায়—

'শঙ্করাচার্য মঠের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সন্ন্যাসী বহুস্থান পর্যটন করিতে করিতে একদা ব্রহ্মানন্দগিরির আশ্রমে (নীলগিরি পর্বতে) উপস্থিত হইলেন। নবাগত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি পরমযত্ন সহকারে তাঁহার আদর যত্ন ও অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর তাঁহার ঐ স্থানের আগমনের উদ্দেশ্য ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মচারী নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আমি দেবী—ভাগবতে ও লিঙ্গ পুরাণাদি মাঠে অবগত হইয়াছি যে, দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহ বিষ্ণুচক্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, উহা এক একটি মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে এবং কালীঘাট নামক স্থানে পূজিত দেবীর দক্ষিণপদাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহা সকল পীঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ। ঐ স্থানে দেবাসুর যুদ্ধের সময় পদ্মযোনি ব্রহ্মা বহুকাল যাবত তপস্যা করিয়া অভিলাষিত ফললাভ করিয়াছিলেন। আমি বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে উক্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত তপস্যাচরণ করিতেছিলাম। একদা রাত্রি শেষে মহামায়া দশম বর্ষীয়া কুমারীরূপে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে এই আদেশ করিলেন যে, বৎস! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। আমি বহুকাল্যবধি জনমানবহীন নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মানন্দগিরি নামক এক কঠোর তপস্বীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এক শিলাস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তুমি শীঘ্র এই ব্রহ্মানন্দ গিরির নিকট গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া সেই শিলাস্তম্ভসহ তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস এবং তুমি যে বেদীতে বসে তপশ্চর্য্যা করিতেছ এই ব্রহ্মবেদীর উপর আমার ঐ শিলাতে মূর্তিময় কালী অঙ্কিত ও স্থাপন করিয়া জনমানবে আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর। আমি এস্থানে করালবদনা কালীরূপে আবির্ভূতা হইব। সন্নিকটে যে হ্রদ দেখিতেছ তাহার নৈঋত কোণে আমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি চতুষ্টয় পাষাণ অবস্থায় নিমজ্জিত রহিয়াছে। উহা উদ্ধার করিয়া বেদীমূলে নিহিত করিও। ঈশাণ কোণে গভীর অরণ্যে পীঠাধীশ নকুলেশ লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকেও আবিষ্কার করিও। যাও তুমি অনতিবিলম্বে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।'

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে....বহুদিবস যাবৎ অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া...অদ্য আপনার দর্শন লাভ করাতে ব্রহ্মময়ীর চরণোদ্দেশ্যে আমার মস্তক অবনত হইতেছে। সন্ন্যাসীদ্বয় দৈববাণী অনুযায়ী শিলাস্তম্ভের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং কতক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার তীরবর্তী কালীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন...তদনন্তর তাঁহার দেবীর আদেশানুযায়ী ঐ শিলাস্তম্ভে (দৈর্ঘ্য ১২ হাত প্রস্থ ২ হাত বেড় ১ ১/২ হাত) কালিকামূর্তি অঙ্কিত করিয়া বেদীর উপর স্থাপন করিলেন এবং প্রত্যহ যথাবিধি পূজার্চনা করিতে লাগিলেন।'

আত্মারাম কাশীশ্বরের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। কাশীশ্বর কেশবরামের বাবা

শ্রীমন্তের (১৬২৫-১৬৮১) ভাই। সুতরাং অনুমান করা যায়, আত্মারাম সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জীবিত ছিলেন। বাংলাদেশের যেসব তন্ত্রসাধক তন্ত্রের বই লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দের নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ ষোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 'তন্ত্রকথা'য় (পৃষ্ঠা ৩৬) ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন: পূর্ণানন্দের গুরু ব্রহ্মানন্দগিরি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের জন্মের আগে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসাবিজয়' ও সমসাময়িক কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' কলকাতা এবং কালীঘাটের নাম পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত একটি চিঠির উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কামদেব ব্রহ্মচারীর বংশধর বেহালার হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরীর ছেলে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে জীর্ণ অবস্থায় চিঠিটি পান। চিঠিটি তিনি তাঁর 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৪) প্রকাশ করেন। নীচে চিঠির অংশ দেওয়া হল :

বঙ্গদেশে গোঘাটা গোপালপুর গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। শৈশবাবধি আমি আমার আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া, সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ স্ত্রী পদ্মাবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মচারী বেশধারণ পূর্বক, ইষ্ট সাধনার্থ, পীঠমালাগ্রন্থে লিখিত 'বঙ্গদেশে চ কালিকা' অর্থাৎ আদি গঙ্গাতীরে যে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হয়, তাহা নিরকরণার্থে ও বিশ্বকর্মা নির্মিত পাষাণময়ী মূর্তি ও তাঁহার রক্ষক যে অনাদিলিঙ্গ-ভৈরবে প্রকাশ আছে, তাহা জানিবার জন্য, মাণ্ডুরা পরগণার অন্তর্গত আদি গঙ্গাতীরে স্থান নির্ণয়পূর্বক অরণ্যমধ্যে একটি পর্ণকুটির নির্মাণপূর্বক তথায় স্ত্রী পুরুষে—ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন ছিলাম। প্রতিপর্বে নিশিতে, যথানিয়মে দেবীর অর্চনা করিতাম। একদা আমি পরমতত্ত্ব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পত্নী পদ্মাবতী কহিলেন—'একি আশ্চর্য্য! এতদিন এখানে বাস করিতেছি, এরূপ আশ্চর্য্য অলৌকিক দৃশ্য কখনও তো নয়নগোচর হয় নাই। এই কথা বলিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, 'প্রভো! রাত্রি কি শেষ হইয়াছে? পূর্বদিকে অরুণোদয়ের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কি পদার্থ দেখিতেছি? আপনি ঐ দেখুন।' এই কথা আমার কর্ণগোচর হইবামাত্র, আমি কুঠির দ্বার হইতে পূর্বদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপার আমার নয়নগোচর হইল না। 'কৈ কি দেখিলে বলিয়া প্রশ্ন করায়—বণিতা বারম্বার—'ঐ দেখ ঐ দেখ' বলিতে লাগিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশত কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যায় পতিত হইয়া, অনশনব্রতে জগদম্বার আরাধনা করায়, তৃতীয় দিবসান্তে ঐরূপ নিশাকালে দৈববাণী হইল—'তুমি জন্মান্তরে আমার দর্শনলাভ করিবে আর পদ্মাবতী দেহান্তে আমাতে লীন হইবে। তোমার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে এক অতি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র এ প্রদেশের ভূমাধিকারী ও অতুল ঐশ্বর্যশালী হইবে এবং তাহার বংশ হইতে আমার সেবাদি প্রকাশ হইবেক। তদন্তর

কিয়ৎদিবস মধ্যে পদ্মাবতী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিয়াই স্বর্গারোহণ করিলে আমি তাহার যথারীতি অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, ঐ নবপ্রসূত পুত্রের জীবিকার্থ চিন্তা করিতেছি। ইতিমধ্যে পর্ণকুটিরের চাল হইতে একটি জ্যেষ্ঠির ডিম্ব পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ অণ্ডনিহিত শাবক ক্রমশ সবল হইলে, একটি পিপীলিকা হঠাৎ উহার সম্মুখবর্তী হইবামাত্র সে অনায়াসে ধরিয়া ভক্ষণ করিল। আমি মহামায়ার মায়া বুঝিতে পারিয়া জগদীশ্বরীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম—'মাতঃ! সৃষ্টি, স্থিতি-প্রলয়কারিণী! তোমার সৃষ্ট জীবন, তোমারই পালনাধীনে থাকিল।' এই বলিয়া অপত্যমায়া পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রসম্মত ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক শ্রীশ্রী কাশীধামে অবস্থান করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলাম। পুত্রঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া দৈববাণী সকল প্রকাশ করণার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ইতি

সাবর্ণমুনির সন্তান

শ্রীকামদেব গঙ্গোপাধ্যায়

একান্ন পীঠের অন্যতম কালীঘাট। দক্ষিণা কালী এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পীঠ ভৈরব নকুলেশ্বর।

কালীঘাটের উত্তরসীমা কালীঘাট রোড ও বলরাম বসু ঘাট রোড, পূর্বসীমা রসা রোড (বর্তমানে খণ্ডিত হয়ে বিভিন্ন নাম হয়েছে), দক্ষিণসীমা নেপাল ভট্টাচার্য লেন ও পশ্চিমসীমা আদিগঙ্গা (টলিস্‌নালা)। তবে ভবানীপুরের দক্ষিণ, বেলতলার পশ্চিম, সাহানগরের উত্তর ও আদি গঙ্গার সীমান্ত পর্যন্ত কালীঘাট নামে চিহ্নিত হয়। কালীঘাট ও সংলগ্ন স্থানের ছ'শ বিঘা জমি মা কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি। এরমধ্যে কালীর পুরী অর্থাৎ কালীমন্দির, নাটমন্দির প্রভৃতি জায়গা সবশুদ্ধ ১।।১৯ এক বিঘা এগারো কাঠা তিন ছটাক জমির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। মন্দিরের পূর্বদিকে কালীকুণ্ড হ্রদ। পশ্চিমদিকে তোরণ দ্বার, সামনে গঙ্গার ঘাট। তোরণ দ্বারের ওপরে নহবৎ খানা। মন্দিরের ঈশান কোণে প্রায় দু'শ হাত দূরে নকুলেশ্বর ভৈরবের অবস্থান।

মা কালীর দৈনিক সেবাকাজে নিযুক্ত থাকেন পাণ্ডা হালদারেরা। যেদিন যার পালা পড়ে সেদিন তিনি পুজোর আয়োজন করেন। এছাড়া বেশকার, মিশ্র, পুরোহিত, ঘোড়েল, চৌকিদারদের তত্ত্বাবধান করেন হালদারেরা। ১৮৮৮ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে কালীঘাট কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে বহুলা (কালীঘাটের দক্ষিণদিকে রাজপুরের দক্ষিণপূর্ব দিকে আকনা গ্রামের কাছের জায়গা বোলপুর নামে একসময় পরিচিত ছিল) পর্যন্ত দু'যোজন ধনুকাকার জায়গা কালীক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার মধ্যে এক ক্রোশ ব্যাপী ত্রিকোণাকার জায়গার ত্রিকোণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং মাঝখানে মা কালী বিরাজ করেন। শোনা যায়, সতীর পায়ের যে আঙুল কালীঘাটে পড়েছিল তা আজও

মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। প্রতিবছর স্নান যাত্রার সময় ও অম্বুবাচির শেষদিনে মায়ের পায়ের ওই আঙুলের যথাযথভাবে অভিষেক হয়ে থাকে।

কেউ কেউ অবিশ্বাস করেন এই বিষয়ে। কিন্তু ইজিপ্টীয়দের সংরক্ষিত মমি তাহলে কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। আশা করা যায়, শব সংরক্ষণী বিদ্যা প্রাচীন ভারতের মানুষের অজানা ছিল না। দেবিভাগবতের ১১ অধ্যায়ে এবিষয়ের উল্লেখ আছে,

'ভূমৌনিপতিতা যেতুচ্ছায়াঙ্গাবয়বাঃ ক্ষণাৎ।
জগ্মুঃ পাষাণত্বাং সর্ব্বে লোকানাং হিতহেতবে।।

অর্থাৎ লোকহিতের জন্য সতীর ছায়াদেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ মাটিতে পড়ামাত্র পাথরে পরিণত হয়েছিল। কালীপীঠ তন্ত্র বিশেষে শ্রীপীঠ বা ওঁকারপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এখানে সতীর পায়ের আঙুল পড়েছে, তাই অনেকে এই পীঠকে শ্রেষ্ঠপীঠ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই বিষয়ে তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত শ্লোকটি উল্লেখ করা হল,

দেব্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষাপতিতান্ দেবান মুনীন পাদয়োঃ।
সর্ব্বরাধ্য তয়াচ তত্র পরমোভক্তটং বিদিত্বাপতৎ।।
সা কালীচরণাং গতস্য-কারণং নোবন্ধনং সম্ভবেৎ।
ইত্বাবেদয়িতুং ববন্ধ নচতং তম্মুক্ত কৈশীবভৌঃ।।

দেবতা ও মুনিদের মা কালীর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে দেখে দেবী মুক্তবেশী হলেন।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ শক্তি পুজোর উল্লেখ আছে। সাত্ত্বিক, রাজসী ও তামসী।

কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে,

'চণ্ডিকা পুজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্বিকী, রাজসীচৈব তামসী চেতি বিশ্রুতি।।
সাত্বিকী যপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবৈদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।।
পাঠস্তস্য যপ প্রোক্ত পঠেদ্দে বামনস্তবা।
দেবীমুক্ত যপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পনং।।
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিবৈস্তথা।।
সূরা মাংসাদ্যুপহারৈ যপযজ্ঞে বিনাতু যা।।
বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাংকিরাতা নাস্তুসম্মতা।
ব্রাহ্মনৈঃ ক্ষত্রিয়ৈ বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।।

যপ, যজ্ঞ, মাহাত্ম্যাদি পাঠ ও নিরামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পুজোর নাম সাত্ত্বিক পূজা।

আর যপ, যজ্ঞ ব্যতীত কেবল বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য ও মদ্যাদি দ্বারা এবং দেবীর মাহাত্ম্যাদি পাঠ দ্বারা পূজার নাম রাজসী। তামসিক পূজা বিনামন্ত্রে হয়ে থাকে।

শিব-শক্তি অর্থাৎ কালী তারা প্রভৃতি দশম মহাবিদ্যার উপাসনাই শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। শক্তি পুজোর বিধি ব্যবস্থাদি। তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণনা করা আছে। তন্দ্রোক্ত উপাসনা বৈদিক উপাসনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তান্ত্রিক উপাসকেরা দেবীর প্রতিমা তৈরি করে মন্ত্রের দ্বারা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধিকারী বিশেষে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বিধানে তার পুজো করে থাকেন। তান্ত্রিক উপাসনায় গুরু শিষ্যকরণ একটি প্রধান নিয়ম, তান্ত্রিক গুরুরা-শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার সময় ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র দেন। প্রত্যেকের দেবতা ও বীজমন্ত্র আলাদা আলাদা। বীজ মন্ত্রগুলি অতীব গুহ্য। তা গোপন রাখবার জন্য তন্ত্রে অনেক নতুন নতুন সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই শব্দের অর্থ তন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

মনুর সময়ে প্রয়াগ পর্যন্ত আর্য্য। ধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। মনুসংহিতায় পৌণ্ডদেশকে পতিত ক্ষত্রিয়ের বাসস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌণ্ড্র উত্তর বাংলার অতি প্রাচীন নাম, রামায়ণে গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রমের কথা বলা আছে। মহাভারতে দক্ষিণ বাংলার অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি জায়গার কথা জানা যায়। কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের কোথাও কালীঘাটের নাম পাওয়া যায় না। কালীঘাটের কিছু দূরে তাম্রলিপ্ত বা কপিলাশ্রমের কথা জানা গেলেও কালীঘাটের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই সময় অসংখ্য নারী-পুরুষ পূণ্য লাভের আশায় কালীক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানের জন্য আসতেন। গৌড়ের সেন বংশীয় রাজাদের যে কয়েকটি অনুশাসন পত্রে জানা গেছে, তাঁরা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। সেসময় রাজকাজের সুবিধার জন্য বল্লাল সেন বাংলাকে পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন।

১। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ।

২। বাগড়ি— পদ্মার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্ব।

৩। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তর এবং করতোয়ার পশ্চিম ও মহানন্দার পূর্ব।

৪। বঙ্গ—করতোয়া ও পদ্মার পূর্বদিকের প্রদেশ।

৫। মিথিলা—মহানন্দার পশ্চিম।

তথ্য অনুসন্ধানের মারফৎ জানা যায়, বাগড়ি বিভাগ যা বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বিভাগের অন্তর্গত ছিল কালীঘাট।

পীঠস্থান হিসেবে প্রকাশিত হবার অনেকদিন পরেও কালীঘাট গহন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেই সময়ে ভৈরবী, কাপালিকেরা এই গহীন অরণ্যের মধ্যে নরবলি দিয়ে মা কালীর পুজো করত। আদিসুর কর্তৃক এদেশে ব্রাহ্মণদের আনার পর থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টের একাদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

লঘু ভারতের তৃতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে,

'বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ। ঘটকদিগের কুলপঞ্জিকা। ৯৫৪ শক, ১০৩২ খ্রিস্টাব্দ

আদিসূর স্তদাতস্য সভাসন্মত্রীনাম্বরঃ।
সহায় শ্বশুর স্যৈব বীরসিংহ নিরস্তবান্।।
গৌড়ে পাল মহীপাল বংশানুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশাসনে গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাংগতঃ।।

উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রগুলিতে কালীক্ষেত্র বা কালীপীঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের বৌদ্ধ প্রাধান্যের সময় সব ধর্মানুরাগী ব্রাহ্মণেরা পৌরাণিক ধর্মের প্রচার শুরু করেন। সেই সূত্র অনুযায়ী বলা যায়, দু'হাজার বছর আগে কালীঘাটের প্রকাশ হয়েছিল। কিন্তু এই সময় এই জায়গার নাম কালীঘাট হয়নি তবে বিভিন্ন সূত্রের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পাল বংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বের সময়ে অর্থাৎ কমপক্ষে এক হাজার বছর আগে এই জায়গাটি কালীঘাট নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

দিল্লির মুসলমান সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে অর্থাৎ খ্রিস্টের যোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে আবুল ফাজল "আইনি আকবরি" গ্রন্থ রচনা করেন। আইনি আকবরি গ্রন্থে সাতগাঁর মধ্যে কালীকোটা নামক জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ বাংলায় সুতানটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি ভাগীরথীর তীরে কয়েকটি গ্রাম বাণিজ্য প্রধান স্থান হয়ে ওঠে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষ জবচার্ণক হুগলী থেকে ইংরেজদের ১৮৮৬ খিস্টাব্দে সুতানটীতে নিয়ে আসেন। পরে ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা কালীকোটা নামক জায়গায় বাণিজ্যের জন্য নিজেদের কুঠি তৈরি করেন। সেই সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, কালীকোটার অবস্থান সুতানটীর দক্ষিণ ও গোবিন্দপুরের উত্তরে। সুতানটী বর্তমানে কলকাতার উত্তরাংশে। এর দক্ষিণ সীমা এখনকার ট্যাঁকশাল। গোবিন্দপুরের (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম ও তৎসংলগ্ন জায়গায়) উত্তর সীমা কলকাতার লালদীঘি ও হেয়ারস্ট্রিট। অর্থাৎ বর্তমান কলকাতার অন্তর্গত হেয়ারস্ট্রিট ও ট্যাঁকশালের জায়গাটি হল কালীকোটা। আইনি আকবরি প্রণেতা আবুল ফজল সুতানটীর দক্ষিণে বর্তমান কলকাতা, কালীঘাট-ভবানীপুর প্রভৃতি জায়গাকে কালীকোটাই আখ্যা দিয়েছিলেন। আকবরের সময় ওই জায়গাটি জঙ্গলাবৃত ছিল। তা সত্ত্বেও জায়গাটিকে কালীঘাট নামে অভিহিত করা হত। বঙ্গভাষাবিদ আবুল ফজল কালীঘাট শব্দকে পার্সী অক্ষরে লিখতে গিয়ে 'ঘ' এর স্থলে পার্সীর 'গায়েন' না লিখে 'ক্বাফ্' লিখে 'কালীকোটা' এই ধরনের অপভ্রংশ পদ সৃষ্টি করেছেন। হয়ত সেই জন্যই রাঢ় অঞ্চলের মানুষ এখনও কালীঘাটকে কালীঘাটা বলে থাকে। ইউরোপীয়দের মুখে আবুল ফজলের 'কালীকোটা' শব্দের ঈকার লোপ পেয়ে 'কালকোটা' ও ক্রমে কালকোট্টা হয়েছে। এই ভাবেই এদেশীয় ব্যবসায়ী ও ইংরেজরা কালীকোটার নামের বদলে কালীকাতা বা কলিকাতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মা কালীর নাম

থেকেই কালীঘাট, কলিকাতা ও ভবানীপুর নামকরণ হয়েছে (ভবানীদেবীর নাম থেকে ভবানীপুর হয়েছে)।

অনেকদিন আগের কথা। তখন কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটি গ্রাম-কোনও কিছুরই জন্ম হয়নি। সারা জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ভরা। পশ্চিম বাংলার এই জায়গাটিকে তখন বলা হত সমতট। সুন্দরবনের বিস্মৃতি ছিল কালীঘাটের এই অঞ্চল পর্যন্ত। তাই এখানে আসতে ভয় পেতেন দর্শনার্থীরা। মায়ের নাম জপ করতে তাঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে প্রবেশ করতেন এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে শোনা যেত জন্তু জানোয়ার ও কাপালিক সন্ন্যাসীদের চিৎকার। এদের মাঝে বাসা বেঁধে বসবাস করতেন ধীবর, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতি সম্প্রদায়। বলাবাহুল্য, দর্শনার্থীরা আসতেন দল বেঁধে। দলে ভারী হলে কেউ কেউ এখানে এক রাত থেকেও যেতেন। কাপালিকেরা ছাড়াও তখন ঠ্যাঙ্গাড়েদের প্রবল উৎপাত ছিল। যাত্রীদের মেরে আধমরা করে টাকা পয়সা, খাবার যা পেত সবকিছু কেড়ে নিয়ে আধমরা দেহটাকে ফেলে দিত জঙ্গলের মধ্যে। অথচ এত ভয় থাকা সত্ত্বেও এখানে যাত্রীদের আসার ক্ষেত্রে কোনদিন ছেদ পড়েনি। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আদি গঙ্গা দিয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন শ্রীমন্ত সওদাগর। মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছালেই মাঝি থামিয়ে দিত নৌকা। দক্ষিণাকালির পুজো দিয়ে আবার শুরু হত যাত্রা।

বর্তমানের বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই কালীক্ষেত্র। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন বল্লাল সেন। বলা হয়, এই বাংলায় তিনিই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। সতী বেহুলা কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিলেন এই আদিগঙ্গার ওপর দিয়ে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে। শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদি গঙ্গার তীর দিয়ে পদব্রজে গিয়েছেন ছত্রভোগে অম্বলিম্ব শিব দর্শন করতে।

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা ছুটে এসেছিলেন কালীঘাটে। তাদের বিশ্বাস ছিল, কলকাতার অধিশ্বরী মা কালির দয়াতেই তারা জয়ী হয়েছে পলাশীর যুদ্ধে। এছাড়া অনেক ইংরেজ সৈন্য ও উচ্চ পদাধিকারী এসেছেন কালীঘাটে একবার একটি কঠিন মামলায় জড়িয়ে পড়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ইংরেজ কর্মচারী বারবার এসে লুটিয়ে পড়েছেন মায়ের দরবারে। একসময় রায় বেরোল সেই মামলার। মা কালীর দয়ায় জয়ী হলেন সেই ইংরেজ কর্মচারী। জয়ের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ছুটে এসেছিলেন কালী ক্ষেত্রে— তিন হাজার টাকা খরচ করে পুজোও দিয়েছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফার্সী পড়াতেন নবকৃষ্ণ মুনসী। তখন হেস্টিংস ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বেতনভুক কর্মচারী। এই নবকৃষ্ণ মুনসী বারবার এসেছেন কালীঘাটে। অন্তরের প্রার্থনা জানিয়েছেন মায়ের কাছে। এক সময় মায়ের কৃপায় রাজা হন নবকৃষ্ণ মুনসী। তখন গভর্ণরের তখতে বসেছেন তাঁরই ছাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস। রাজা হওয়ার পরে নবকৃষ্ণ তিন লক্ষ টাকা খরচ করে পুজো দিয়েছিলেন কালীঘাটে।

কৃষ্ণনগর থেকে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র কালীঘাটে এসেছেন গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে। আঠারো শ' বাইশ সালে কালীঘাটে পুজো দিতে এসেছিলেন রাজা গোপীমোহন। তাঁর আসার কয়েকঘণ্টা আগে থেকে মন্দিরের আশেপাশে লোক জমতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, রাজা গোপীমোহন কিভাবে পুজো করবেন, তা দেখা। ভীড় সামলাতে একসময় হিমসিম খেতে হয়েছিল স্থানীয় পুলিশকে। একজন অতিথি হয়ে এলেন সপ্তগ্রামের শ্রীকান্ত ঘোষের বাড়িতে। রূপ-গুণ-কুলশীল দেখে নিজের মেয়েকে তার হাতে সম্প্রদান করলেন শ্রীকান্ত। সরকারী দপ্তরে রক্ষকের চাকরিও করে দিলেন তাকে। এই অতিথি হলেন প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ। একসময় রাজা হলেন প্রতাপ। যশোহরের সিংহাসনে বসলেন তিনি। ভুঁইয়া থেকে রাজা হলেন তিনি। পিতা বিক্রমাদিত্য আর খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের মাঝে রইলেন প্রতাপাদিত্য। প্রতাপের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের রাজ্যের সীমানার মধ্যে রয়েছে কালীঘাট।

আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা। শহর কলকাতার তখনও পত্তন হয়নি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে খড় মাটি দিয়ে ছিল মায়ের ছোট কাঁচামাটির মন্দির। আশেপাশে তথাকথিত কয়েকঘর নিম্নবর্ণের মানুষ। মাঝে মাঝে কয়েকজন দর্শনার্থী আসেন মায়ের মন্দির দর্শন করতে। একদিন অনেক দূর থেকে সেখানে এলেন পথশ্রান্ত জনৈক পথিক। তিনি সেখানে এসেছিলেন তাঁর বাবার খোঁজ করতে। নাম ভবানীদাস চক্রবর্তী। পিতামহ চণ্ডীবর চক্রবর্তী, ওঁর বাবার নাম পৃথ্বীধর চক্রবর্তী ওরফে শ্রীনাথ চক্রবর্তী। নিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত খতিয়ান গ্রাম।

পৃথ্বীধর নিরুদ্দেশ হয়েছেন অনেকদিন। খুঁজে চলেছেন অনেকদিন। কিন্তু পথ চলার জন্য তো খরচ আছে। তাই ভবানী দাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন কিছু শাঁখা। অর্থের প্রয়োজন হলেই গ্রামে ঢুকে শাঁখা বিক্রি করেন এয়ো স্ত্রীদের কাছে। পথ চলতে চলতে একদিন তিনি এসে পৌঁছালেন খাসপুর গ্রামে। কালীঘাটের পাশ দিয়ে এসে পৌঁছালেন কালীকুণ্ডের পাড়ে। পথশ্রমে ক্লান্ত ভবানী দাস বিশ্রাম নেবার জন্য দিনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক ভবানীদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ও পুটুলীতে কি আছে বাবা? জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, ওতে শাঁখা আছে মা।

মিষ্টি সুরে স্ত্রী লোকটি বললেন, আমার হাতে শাঁখা পরিয়ে দেবে। তখনও ভবানীদাস রয়েছেন অভুক্ত। তা সত্ত্বেও যত্ন করে সেই স্ত্রীলোকের দু'হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন তিনি। গায়ের রঙ কালো পরিপাটি তাঁর সাজ। পরনে লালপাড় শাড়ী। কপালে তেল সিঁদুর। মাথায় সুগন্ধী তেল মেখেছেন। শুধু বাকী ছিল শাঁখা পরা। সূর্য তখন ক্রমশ পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে। ভবানীদাস ভাবতেন, হয়ত কোনও বাগদী বাড়ির মেয়ে হবে। শাঁখা তো পরিয়ে দিলেন, কিন্তু দাম দেবে কে?

এদিকে ওই স্ত্রীলোক আসতে আসতে নামছেন কালীকুণ্ডের পুকুরে। বললেন, দামের

কথা ভাবছ বাবা। চিন্তা করো না। আমি স্নান সেরে বাড়ি থেকে তোমার শাঁখার দাম এনে দেব। তারপর বললেন, এক কাজ করো বাপু। ওইখানে আমার ছেলেরা আছে। তাদের কাছ থেকে দাম নিয়ে এসো। আরও দু'গাছা শাঁখা দিয়ে এসো আমার নাম করে।

কোন দিকে যাব জানতে চাইলেন ভবানীদাস। ওই যে গো বাপু—ওই যে পাতার ঘর দেখছ ওইখানে বলেই পুকুরে নেমে গেলেন ওই স্ত্রীলোক।

ভবানীদাস এগিয়ে গেলেন গোল পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরের দিকে। কাঁচামাটির কুঁড়েঘর। পাশাপাশি দু'টো ঘর। একটা ঘরে থাকেন সন্ন্যাসীরা আর অন্য ঘরে মা কালীর মন্দির। খড়মাটি দিয়ে গড়া মায়ের মূর্তি সেখানে বিরাজমান।

ভবানীদাস সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে স্ত্রীলোকের কথাগুলি নিবেদন করলেন। তাঁরা তো তার কথা শুনে অবাক। বললেন, কি বলছ তুমি। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ-সারাদিন ব্যস্ত থাকি মা কালীর পূজার্চনা নিয়ে। এখানে কি করে কোনও স্ত্রীলোক বসবাস করতে পারে। ভবানী দাস তো তাদের কথা শুনে হতবাক। মুখ থেকে কোনও কথাই সরছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন কে এই স্ত্রীলোক এই অজগর জীবনে আমার সঙ্গে ছলনা করে পয়সা না দিয়ে শাঁখা পরে গেল। এও ভাবলেন, কোনও দর্শনার্থী তাকে প্রতারণা করে ঠকিয়ে শাখা পরে গেছে। ব্রহ্মানন্দ, আত্মারামের শিষ্য ভুবনেশ্বর গিরি তখন মন্দিরের মোহন্তের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না ভবানীদাসের কথা।

প্রত্যুত্তরে ভবানীদাস বললেন, আমি ব্রাহ্মণ সারাদিন উপবাসী রয়েছি। আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলিনি। আমি এই মায়ের আদেশে এখানে এসেছি। কথা শেষ করে ভুবনেশ্বর গিরির সামনে আরও দু'গাছা শাঁখা তুলে ধরলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল। সন্ধ্যা আরতির যোগান করার জন্য তৎপর হলেন ভুবনেশ্বর গিরি। হঠাৎ চোখ চলে গেল মা কালীর মূর্তির দিকে। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে তিনি তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত। চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার অপরাধ নিও না মা। তারপর মায়ের সামনে থেকে সরে এসে ভবানীদাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার অপরাধ নিও না মা। ভবানীদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্মজন্মান্তরের সাধনা আজ সার্থক হয়েছে। মা কালী স্বয়ং তোমার কাছ থেকে তাঁর দু'হাতে শাঁখা পরেছেন। এখনও তাঁর দুহাত খালি রয়েছে। শীগগির চলো সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করবে। সত্যি কথাই তো। ওই শাঁখাদুটিই তো তিনি পরিয়েছিলেন তার কাছে আসা স্ত্রীলোকের হাতে। ভবানীদাসের চোখ দিয়ে তখন বয়ে চলেছে শ্রাবণের ধারা। তাকে জড়িয়ে ধরে তখন একইভাবে কেঁদে চলেছেন ভুবনেশ্বর গিরি। তারপর ভবানীদাসের হাত থেকে আরও শাঁখা দুটি নিয়ে পরিয়ে দিলেন মায়ের বাকী দুটি হাতে।

প্রাণতোষ ঘটকের 'কলকাতার পথ-ঘাট' বইয়ে উল্লেখ আছে, আদপে নাকি চৌরঙ্গী নামই ছিল না। লোকমুখে ভবিষ্যতে এই নাম প্রচলিত হয়েছে। সত্যিকার নাম 'চিরাঙ্গী'

বা 'চেরাঙ্গী'। সতীর অঙ্গ চক্র সাহায্যে চিরে চিরে খন্ড-বিখন্ড করেছিলেন নারায়ণ, সেই ছিন্ন অঙ্গের মাত্র এক অঙ্গুলি (পদাঙ্গুলি) পড়েছিল ভাগীরথীর তীরে কোথায়, কিংবা আদি গঙ্গার কাছে, যে জন্য কালীঘাটে তীর্থক্ষেত্রের অবস্থান মা কালী আর ভৈরব আছেন সেখানে। কালীক্ষেত্র আছে 'চিরাঙ্গী' সতীর নামে। এই নাম হওয়ার প্রথম পোষকতা করেছেন সুপণ্ডিত সি.আর.উইলসন। তিনি জোরের সঙ্গে তাঁর Early Annals (Vol.2). P.173 etc তে উল্লেখ করেছেন, 'The original name of 'Chowringhee' is 'Cherangi in all records.' সতীর অঙ্গছেদের জন্য 'চিরাঙ্গী' নাম হওয়ার সত্যতা ঐতিহাসিক এ. কে. রায় 'Cenus of Calcutta'-এ লিখেছেন, 'And finally it is to the Goddess Kali herself, called 'Cherangi from the legend of her origin by being cut up with Vishnu's disc, that they hace the name of chowringhee.'

ঐতিহাসিক অতুলকৃষ্ণ রায়ের মতে, সতী অঙ্গ বর্তমানে চৌরঙ্গী অঞ্চলে পড়েছিল। তাই এই জায়গার নাম হয়েছে চৌরঙ্গী। সুরেশ চন্দ্র নাথ মজুমদার বহির্ভারতে নাথ যোগী প্রবন্ধে লিখেছেন, গোরক্ষ বিজয় হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, গোরক্ষনাথ কলিকাতার কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে যে, লৌকিক প্রবাদ এই গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। যখন এই কথা লেখা হয়েছিল তখন গোরক্ষবিজয়ের অস্তিত্ব 'কেহ জানিত' না। ঐ উক্তি প্রাচীন প্রবাদকে দৃঢ়ীভূত করছে।

কিংবদন্তী আছে তখনকার দিনের চৌরঙ্গির বিশাল জঙ্গলের মধ্যে চৌরঙ্গীনাথ নামে নাথ সম্প্রদায়ের একবাতে পঙ্গু প্রতিবন্ধী সাধু বাস করতেন। তিনি নাকি মাটির নিচে থেকে এই দেবী মূর্তির আবিষ্কার করেন।

'চৌরঙ্গী' নিয়ে আর একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। একদিন সাধু চৌরঙ্গী দেখিলেন, বনমধ্যে একটি গাভী একস্থানে দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার উপর, অজস্র দুগ্ধধারা বিসর্জন করিতেছে। সন্ন্যাসী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং খনিত স্থান মধ্য হইতে কালীর প্রস্তরময় মুখমন্ডল প্রাপ্ত হন। সেই মুখই এখন কালীমূর্তি রূপে মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। (দ্রষ্টব্য কলিকাতা সেকালের ও একালের পৃ: ১১১-১১২)। নগেন্দ্রনাথ বসু 'বিশ্বকোষে' (৩য় খন্ড, পৃঃ ২৯) লিখেছেনঃ প্রাচীন গোবিন্দপুরের পূর্বাংশ (এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল) জঙ্গল গিরি নামক একজন চৌরঙ্গী যোগী কালীদেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। ঐ চিহ্নই দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি হিসাবে গোবিন্দপুরে বর্তমান কেল্লা নির্মাণ করিবার সময়ে বর্তমান কালীঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপূজক চৌরাঙ্গী হইতে বর্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

কিন্তু অন্য তথ্য প্রমাণ অনুসন্ধান করে দেখা যায়, গোবিন্দপুরে কেল্লা তৈরির সময় প্রাচীন গোবিন্দপুর থেকে দেবীমূর্তি কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এর অনেক আগে থেকেই দেবীমূর্তি যে কালীঘাটে ছিল তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেই

লিখেছেন, 'চৌরঙ্গী যোগীগণ এই অঞ্চলে কোন সময় বসবাস করিয়াছেন কিনা তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে'।

কালীমন্দিরের চারপাশে ৫৯৫।৪।১০ বিঘা জমি মা কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি নামে প্রচলিত। পঞ্চান্ন গ্রামের খাসপুর পরগণার অন্তর্গত ছ' সংখ্যক গ্র্যান্ড ডিবিজনের ই. এফ. এম. পি কিউ চিহ্নিত সাবডিবিজনে এইসব দেবোত্তর ভূমি রয়েছে। অনেকের মতে, ওই দেবোত্তর জমি বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী কেশব রায় বা তাঁর ছেলে সন্তোষ রায় মা কালীর সেবার জন্য দান করেন। অন্য একটি মতে, প্রাচীন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজারা অনেকদিন আগেই এই জমি দান করেছেন। তবে এই দুটি মতের কোনটির স্বপক্ষেই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাবর্ণ চৌধুরীদের দত্তভূমির তায়দাদে কালীঘাট গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই তায়দাদের লেখা সম্পত্তি কালীঘাটের বাইরে অন্যান্য গ্রামের ও ভিন্ন পরগণার অন্তর্গত। সেখানে দেখা যায়, মা কালীর সেবাইত ছাড়াও অন্যান্য অনেককে দেবোত্তর ব্রহ্মোতর লাখে রাজ দান করা হয়েছে। সেগুলির একটিও মা কালীর গ্রামের মধ্যে নেই। তবে কালীঘাট গ্রামের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি, যা সাবর্ণ চৌধুরীরা দিয়েছিলেন, তা কোনও না কোন তায়দাদে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায় নিজের জমিদারীর অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামের জমি মা কালীর সেবার জন্য দান করেছেন।

জমিদার কেশবচন্দ্র চৌধুরী ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের নিমতা বিরাটী থেকে বড়িষায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ওই সময় কলকাতার আশেপাশের জায়গাগুলি পুরোপুরি জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ বসবাস করতেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরেজরা গোবিন্দপুর থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বাস উঠিয়ে দিলে তারা ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। শোনা যায়, তখনও এসব অঞ্চলে যথেচ্ছভাবে বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র বন্যপ্রাণীরা বিচরণ করত। এও শোনা যায়, আরও পঞ্চাশ বছর পরে ওয়ারেন হেস্টিংস আলিপুরের হেস্টিংস হাউসের কাছে বাঘ শিকার করেছিলেন।

গোবিন্দপুর থেকে উঠে এসে কালীঘাটে ও তার উত্তরদিকে চড়কডাঙ্গায় বাড়ি তৈরি করে মা কালীর সেবাইত ভবানীদাসের পৌত্রেরা বল্লালীমতে কুলক্রিয়া শুরু করেন। ওই সময়কে কালীঘাট ও ভবানীপুরে গ্রাম স্থাপনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

মা কালীর মূর্তি প্রকাশের পরে প্রথম কার দ্বারা বা কোন সময় মন্দির তৈরি হয়েছিল তার সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায়, ভুবনেশ্বর গিরির সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মা কালীর একটি ছোট মন্দির ছিল। অনেকে মনে করেন, যশোহরের রাজা বসন্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে ওই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। তার আগে সামান্য এক পর্ণকুটিরে মায়ের মূর্তি থাকত।

কালীমূর্তি প্রকাশের বিষয়ে একটি উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, কেশব

রায় কালীর ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং তাঁহার পুত্র সন্তোষ রায় ঐ ইমারতের স্থানে ছোট মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। পরে উহা ভগ্ন হওয়ায় রাজীব লোচন রায় (সন্তোষ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র) আলিপুরের তদানীন্তন কালেক্টর মাঃ ইলিয়াট সাহেবের অনুমতিক্রমে বড় মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।'

কালীঘাট মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে কালীকুণ্ড হ্রদ। এখন তা ছোট একটি পুকুরের মতো দেখায়। বর্তমান আয়তন প্রায় দশ কাঠা। কথিত আছে, এই কুণ্ডের তীরে মা কালীর চরণাঙ্গুলি পাওয়া যায়। একসময় এই জায়গার সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গঙ্গার স্রোত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হতে থাকায় এই জায়গাটি একটি ছোট্ট জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। এই জায়গার আশেপাশে কূপ খনন করার সময়ে সমুদ্রতটে যে ধরনের মাটির স্তর থাকে এখানে তার হদিস পাওয়া যায়। এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সুদূর অতীতে কালীঘাট গঙ্গার গর্ভে ছিল। কালের স্রোতে চর পড়ে এটি মানুষের বাসযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাটের সেবাইতেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কুণ্ডের কিছুটা সংস্কার করেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৮৭ সালে আলিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কুণ্ডের পাঁক পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কুণ্ডের সব জল তোলা সম্ভব হয়নি।

কালীঘাট গ্রামে ক্ষত্রিয় রাজকর্তৃক মা কালীর দেবোত্তর জমির দান সম্বন্ধে কোনও অনুশাসন পত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যমতে, ক্ষত্রিয় রাজার দান স্বীকার করা হলেও ভূমি গ্রহীতার কোনও নামও পাওয়া যায়নি। একসময় সূরবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজার। বাংলার রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁরাই যে কালীঘাটের জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছেন তার স্বপক্ষেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সুবর্ণ গ্রামে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন (Statistical Accounts of Bengal by Dr. W. W. Hunter Vol. V. P. 119)। লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও কালীঘাটের মা কালীর সেবার জন্য জমি দান করেছেন, এর স্বপক্ষে কোনও জোরালো তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের শাসনকালে 'ওয়াশিল তুমার জমা' নামে বাংলার রাজস্বের যে হিসাব করা হয় সেখানে প্রজাদের কাছে থেকে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এসময় কালীঘাট গ্রামের জন্য কাউকে রাজস্ব আদায় করতে দেখা যায়নি। মুরশিদকুলির শাসনকালে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। উল্লেখ্য, তখন কেশব রায় এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। এই সময়েও.কাউকে কালীঘাট অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করতে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির পর কালীঘাট, ইংরেজদের ৫৫গ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশব রায়ের ছ'য় ছেলের মধ্যে চতুর্থ শিবদেব অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং সাধ্যমত দান ধ্যান করতেন। যে

কোন প্রার্থী শিবদেবের কাছে দান প্রার্থনা কবলেই তিনি তা পূরণ করতেন বলে সকলে তাকে 'সন্তোষ' বলে ডাকতেন। জমিদারির কাগজপত্রেও 'সন্তোষ রায়' নামটি দেখতে পাওয়া যায়।

বর্গী হামলার সময় আলিবর্দি, সন্তোষ রায়ের ওপর অত্যধিক রাজস্ব দাবী করেন। সন্তোষ রায় টাকা দিতে না চাওয়ায় আলিবর্দি তাঁকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করে রাখেন। সন্তোষ রায় যেমন শক্তিশালী ছিলেন তেমনই বেশী খাবার খেতে পারতেন। কয়েকমাস কারারুদ্ধ থাকার সময় তাঁর যথাযথ খাবার না পাওয়ার জন্য সন্তোষ রায়ের খুব কষ্ট হয়েছিল। একদিন তিনি নবাবের ছাগরক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে একটি ছাগল কেড়ে নিয়ে পুরোটাই খেয়ে ফেলেন। একথা শুনে নবাব তাঁকে ডেকে আনেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে নবাব তাঁকে কারাবাস থেকে মুক্তি দেন এবং ডায়মণ্ডহারবারের কাছে 'আবজাখালী' গ্রামটি সন্তোষ রায়ের খোরাকির গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে ব্রহ্মোত্তর করে দেন। আজ অবধি এই আবজাখালী গ্রাম সন্তোষ রায়ের উত্তরাধিকারিদের দখলে আছে।

সন্তোষ রায় মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে ধুমধাম করে পুজো দেন ও সেইসময় কালীঘাটের সেবাইত ও ব্রাহ্মণদের অনেক জমি ও টাকা দান করেন। ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দের দখিনী ভূমির তায়দাদে দেখা যায়, ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মনোহর ঘোষাল ও কালীঘাটের জনৈক সেবাইত গোকুলচন্দ্র হালদার ও আরও কয়েকজনকে, সন্তোষ রায় জমিদারীর নানান জায়গায় অনেক জমি দান করেছিলেন। শাক্ত ছিলেন সন্তোষ রায়। তিনি বড়িশার কাছে ও নিজের জমিদারীর মধ্যে অনেক জায়গায় শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে সন্তোষ রায় নাকি লক্ষ বিঘা জমি ব্রাহ্মণদের দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দান করেন।

হুজুরিমল্ল নামে একজন পাঞ্জাবী সেনা ১৭৬৪ অব্দে বক্সারের যুদ্ধের সময় ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ ১৭৬৯ অব্দে সেইসময়কার ইংরেজ গভর্নর বেরেল্স্ট সাহেব হুজুরিমল্লের মনোনীত কালীঘাটের মা কালীর দেবোত্তর জমির মধ্যে ১২ বিঘা জমি তাঁকে দেন এবং সেই জমির পরিবর্তে মায়ের মন্দিরের কাছে মুসিসাহানগড়ে ১২ বিঘা জমি হালদারদের নিষ্কর করে দেন। যেখানে এখন কালীঘাটের বাজার ও থানা আছে ওই জায়গাগুলি হুজুরিমল্ল পেয়েছিলেন। ওই জমি বর্তমানে আলিপুরের কালেক্টরের অধীন। প্রসঙ্গত বলা যায়, দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইংরেজ কোম্পানী তাদের হিন্দু সৈনিকদের মা কালীর পুজো দেবার জন্য ১০৮ টাকা দিয়েছিলেন।

মা কালীর মুখমণ্ডল কালীকুণ্ড হ্রদের তীরে পাওয়া যায় বলে শোনা যায়। সেই মুখমণ্ডল জনমানসে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ অবধি একইভাবে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হাজার হাজার মানুষ মা কালীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে অনেক মূল্যবান রত্নসামগ্রী দিয়েছেন, যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। প্রথমে খিদিরপুরবাসী দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল

মায়ের চারটি রূপোর হাত তৈরি করিয়ে দেন। পরে কলকাতার খ্যাতনামা বাবু কালীচরণ মল্লিক চারটি সোনার হাত তৈরি করিয়ে দেন চড়কডাঙ্গাবাসী কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার বেলেঘাটার ধনী চাল ব্যবসায়ী রামনারায়ণ সরকার মা কালীর সোনার মুকুটটি তৈরি করান। আর একজন ধনী ব্যক্তি মায়ের হাতের অসুরের মুণ্ডু তৈরি করিয়ে দেন। উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ মায়ের সোনার জিভ তৈরির উদ্যোগ নেন। মায়ের মাথার ওপর যে রূপোর ছত্রটি দেখা যায়, তা প্রদান করেন নেপালের প্রাক্তন প্রধান সেনাধ্যক্ষ স্বর্গীয় যড়ঙ্গ বাহাদুর। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের গায়ের সব গয়না চুরি হয়ে যায়। পরে ধনী হিন্দুরা উদ্যোগী হয়ে আবার তা তৈরি করিয়ে দেন।

মা কালীর মন্দিরের মধ্যে পরপর পাথর দিয়ে সাজিয়ে ব্রহ্মার তৈরি দেবীর মুখ স্থাপন করা আছে। শোনা যায়, ওই পাথরগুলির মধ্যে কালীঘাটে পড়া সতীর অঙ্গ অতি যত্ন সহকারে রাখা আছে। যে জায়গায় মায়ের মূর্তি রাখা আছে তার নীচে দিয়ে মন্দির থেকে কালীকুণ্ডর তলা পর্যন্ত একটি কূপ আছে। মায়ের চরণামৃত ভূমধ্য দিয়ে ওই কুণ্ডে এসে পড়ে।

মায়ের মন্দির উত্তর দক্ষিণে লম্বমান সমান্তরাল ক্ষেত্রের মত। তোরণদ্বার পশ্চিমে গঙ্গার দিকে। সবমিলিয়ে ১।। ১৯ বিঘা, এর মধ্যে আট কাঠা জমির ওপর বর্তমান মন্দিরটি অবস্থিত। এর মধ্যে পরিসর প্রায় ৫০ হাত। এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ৭-৮ বছর। এর জন্য খরচ তিরিশ হাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়, তা আজকের টাকার অঙ্কের সঙ্গে মেলালে অনেকগুণ ছাড়িয়ে যাবে। এই নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮০৯ সালে এবং সেই সুবাদে পুরনো মন্দিরের জায়গায় তৈরি হয় বর্তমান কালীমন্দির।

অতীতে মা কালীর প্রাত্যাহিক পুজো কিভাবে হত তা আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। তবে অনেকে মনে করেন, কালীঘাটের পুজো পদ্ধতি কাপালিকসহ তান্ত্রিকদের হাতে ছিল এবং তারা রাজসিক বা তামসিক নিয়মে মা কালীর পুজো করতেন। ওই সময় কালীঘাটে নাকি পশু এবং নরবলিও দেওয়া হত। বর্তমান সেবাইত হালদারদের পূর্বপুরুষ ভবানী দাসের সময় পর্যন্ত মা কালীর পুজো করতেন। ভবানীদাস বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি নিরামিষ নৈবেদ্য নিবেদন করে, জপ হোম করে মা কালীর পূজার্চনায় মেতে থাকতেন। প্রতিদিনের ভোগের জন্য তিনি পশু বলি দিতেন না। তাঁর আমলে শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর নবমীর দিন একটি মাত্র পশুবলি দেওয়া হত। বর্তমান অধিকারীদের মধ্যেও এই নিয়ম চালু আছে। এখন যাত্রীরা যে সব পশু বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তা দিয়েই মায়ের নিত্য আমিষ ভোগের আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন যে ছাগলটিকে প্রথম বলি দেওয়া হয় তাই মায়ের ভোগের জন্য গৃহীত হয়ে থাকে। হালদারেরা পশুবলি দেন না। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পৈতৃক প্রথানুসরণ করে থাকেন।

ভবানী দাসের পর তাঁর পৌত্রদের সময় থেকে আলাদা পুরোহিতকে দিয়ে মা কালী

নিত্য পুজো করানো হয়ে থাকে। যে দিন যাঁর সেবার ভার পড়ে তিনি সেইদিনের পুজোর ব্যয় বহন করে থাকেন। মা কালীর নিত্য পুজোর জন্য যেমন পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়, তেমনই মূর্তির বেশভূষার জন্য স্বতন্ত্র বেশকারদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এদের মিশ্র (মিশির) বলা হয়। কবে থেকে এই বেশকারদের নিযুক্ত করা হচ্ছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। পুরোহিত ও বেশকার মিশ্ররা পুরুষ পরম্পরায় ওই পদে অভিষিক্ত হন।

সন্ধ্যা আরতির পর মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা ও পরের দিন সকালে মন্দির খোলার ভার থাকে মিশ্রদের ওপর। তবে অধিকারীরা এই কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

যে যে বিষয়ে মা কালীর মন্দিরে (নকুলেশ্বর, শ্যামরায় ও মনসার প্রণামী) আয় ও ব্যয় সঙ্কুলান হয় তার বিবরণ দেওয়া হল ঃ

আয়

১। দর্শনার্থী যাত্রীদের দেওয়া প্রদত্ত অর্থ (মা কালী, নকুলেশ্বর, শ্যামরায় ও মনসার প্রণামী)।

২। যাত্রীদের দেওয়া পুজোর জিনিস।

৩। পশুবলির দক্ষিণা (পশুবলির দক্ষিণা সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। অতীতে সাধারণত প্রতিটি ছাগ বলির জন্য চার আনা নেওয়া হত। কিন্তু পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর হিন্দু সিপাহীদের কাছে থেকে যথাক্রমে দু'আনা ও এক আনা নেওয়া হত। এছাড়া মহিষ বলির জন্য নেওয়া হত এক টাকা)।

৪। উৎসর্গীকৃত ছাগমুণ্ড।

৫। অতিরিক্ত পুজো, প্রণামী, উপহার ইত্যাদি

৬। দেওঘর জমির উপস্বত্ব।

ব্যয়

১। নিত্যপূজোর নৈবেদ্যাদি।

২। পুরোহিতের দক্ষিণা।

৩। বেশকার, মিশ্রদের দৈনিক বেতন।

৪। বাদ্যকর, ঘোড়েল (যিনি ঘন্টা বাজান), কর্মকারদের দৈনিক বেতন।

৫। মন্দিররক্ষক প্রহরীদের বেতন।

৬। পাষক ও সর্ম্মাজ্জকের দৈনিক বেতন।

৭। মা কালীর ও শ্যামরায়ের ভোগের জিনিসপত্র ও বৈকালী।

রাজা মানসিংহ একসময় কামদেব গাঙ্গুলীকে গুরুপদে বরণ করেন। সেই ঘটনার কথাই এখন জানাব। কাশীতে গঙ্গার তীরে বসে বারো বছর যাবৎ সাধনা করছেন কামদেব। যোগাসনে কুম্ভক অবস্থায় মাটি ছেড়ে শূন্যমার্গে সাধন অবস্থায় রয়েছেন সাধক। তিনি মাতৃকৃপা পান বারো বছর পরে। রাজা মানসিংহ এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তো হতবাক।

তিনি উপস্থিত হলেন সন্ন্যাসীর কাছে। পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি রাজা মানসিংহ আপনার কৃপা প্রার্থী। সন্ন্যাসীর এই অলৌকিক সাধনা দেখে তাঁকে গুরুর পদে বরণ করতে চান। রাজা মানসিংহের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে একসময় তাঁকে দীক্ষা দিলেন কামদেব গাঙ্গুলী। দীক্ষা দানের পর গুরুকে সাদরে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসেন রাজা মানসিংহ। বারো বছর পরে পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে কামদেবের। মনে পড়ে তাঁর সন্তানের কথা।

অন্য দিকে মাতৃহারা লক্ষ্মীকান্তকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েন আত্মারাম ব্রহ্মচারী। অনুগত ভৃত্য জগদানন্দ সর্দার—ঘরের সবদিকে তাঁর সমান লক্ষ্য। বৃদ্ধ, উদ্বিগ্ন আত্মারাম তাঁর হাতেই তুলে দেন শিশু সন্তানের ভার। জগদানন্দ-পত্নী শিশু সন্তানের মুখে তুলে দেন স্তনের ধারা। মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে শিশু লক্ষ্মীকান্ত।

আত্মারাম ব্রহ্মচারীর প্রধান শিষ্য আনন্দগিরির সমবয়সী ভুবনেশ্বর সেইসময় ওই আশ্রমে ছিল। একসময় উপনয়নের সময় উপস্থিত হয় তার। অথচ বাবার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ আত্মারাম লক্ষ্মীকান্তের পৈতে দেন মায়ের মন্দিরেই।

একসময় আত্মারামের বাঁচার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। শরীর ছেড়ে যাওয়ার সময় আসন্ন। মোহান্তের দায়িত্ব দিয়েছেন আনন্দগিরির হাতে। একসময় ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ঠিক সেইসময় রাজা মানসিংহের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁর গুরুর জন্য।

বাংলাদেশে এলেন রাজা মানসিংহ। বোঝাপড়া করতে হবে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে গুরুপুত্রের খোঁজ করতে হবে। অনেক জায়গায় লোক পাঠালেন ওই শিশুটির জন্য। একদিন পাটুলি অর্থাৎ আজকের পাটনার জনৈক জমিদার শূদ্রমণি রাজা মানসিংহকে বললেন, আমি তোমার গুরুপুত্রের সন্ধান দিতে পারি। তিনি একবার সাগর যাত্রার পথে নেমেছিলেন কালীঘাটে। সেখানে গিয়ে তিনি পুজো দিয়েছিলেন মায়ের মন্দিরে। সম্প্রতি সম্ভবত তারই উপনয়ন হয়ে গিয়েছে।

শিশুটির নাম কি?

লক্ষ্মীকান্ত।

শূদ্রমণির কথাগুলি মিলিয়ে নিলেন রাজা মানসিংহ। তারপর এলেন কালীক্ষেত্রে। দেখা হল, আনন্দগিরি আর ভুবেনেশ্বরগিরির সঙ্গে। একসময় রাজা মানসিংহের সঙ্গে দেখা হল লক্ষ্মীকান্তের। রাজগুরু হওয়ার পর কোন দক্ষিণা নেননি কামদেব গাঙ্গুলি। মাত্র পাঁচটি ফল দক্ষিণা হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন। তারই সন্তান লক্ষ্মীকান্ত। তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজা মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান আর আনোয়াপুর—এই পাঁচটি পরগণা দান করলেন। এছাড়া মায়ের সেবা আর কালীঘাট গ্রামের চৌহদ্দি নির্ধারণ করলেন সাতশ বিঘা জমি। লিখে দিলেন সনদ। মায়ের মন্দির তৈরির জন্য দিলেন পনেরোশ স্বর্ণমুদ্রা। সবকিছু দিল্লির বাদশাহের মোহর লাগিয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে, সনদের একপ্রস্থ তুলে দেন মোহন্ত আনন্দগিরির হাতে।

সেই থেকে শুরু হল, কালীঘাট মন্দির তৈরির প্রস্তুতি। ঝোপজঙ্গল কেটে, খানাখন্দ বুজিয়ে কালীঘাট মন্দির তৈরির পাশাপাশি আশ্রমবাসীরা চাষবাসও শুরু করেন। মন্দিরের আশেপাশে বসবাস করতে শুরু করলেন হাড়ি, বাগদী, কামার, কুমোর শ্রেণীর মানুষেরা।

সর্বেশ্বর হালদার। মায়ের সেবক। সবসময় বিভোর হয়ে থাকেন মায়ের চিন্তায়। কিন্তু মনের মধ্যে একটা দুঃখ সবসময়ে থেকেই যায়, তাই মনে মনে মাকে বলেন, আমার বংশ রক্ষা হবে না? সন্তান তো হয়ই নি, উপরন্তু তার সারা শরীর জর্জরিত হয় অজীর্ণতায়। একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েছিলেন নিজের ঘরে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক নারী এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

'চিনতে পারছ না আমায়, তোমার বাপের বাড়ির দেশের লোক—রমণীর মা আমি'—বললেন সেই নারী। সাধারণ চেহারা কোঁকড়ানো চুলে মাথা ভর্তি। হাতে দু'গাছা সোনার বালা। পরনে লালপাড় তসরের শাড়ি।

মৃদু হেসে তাকে আসন এগিয়ে দিয়ে মা বললেন, বসুন।

আসন গ্রহণ করে তিনি বললেন, সেবা হয়ে গেছে?

উত্তর দিলেন মা, না মা, এখনও হয়নি। ব্রহ্মময়ীর সেবা না হলে আমার সেবা কি করে।

তখন রমণীর মা বললেন, যাও, কুণ্ডের জলে ডুব দিয়ে এসো, তারপর এই ফুলটা ধারণ করে মনে মনে সন্তানের কামনা করো। তোমার শরীরের অজীর্ণতা সব দূর হয়ে যাবে।

মা, মনে মনে ভাবেন, তুমি কি করে বুঝলে আমার মনের কথা?

রমণীর মাও প্রত্যুত্তরে মনে মনে বললেন, আমাকে না জানালে, আমি আর কী করে জানব বলো? হালদারমশাই সব কথাই বলেছেন আমাকে।

পরম শ্রদ্ধায় হাত বাড়িয়ে তাঁর দেওয়া ফুল গ্রহণ করলেন সন্তানকামনায় কাতর আমার মা। যত্ন করে সেই ফুল কুলুঙ্গিতে রেখে কুণ্ডের জলে স্নান করতে গেলেন। বাড়ি ফিরে দেখলেন রমনীর মা কোথাও চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে আচম্বিতে একজন মহিলা মন্দিরে এসে হালদারমশাইকে বললেন, হালদারমশাই, মায়ের ভোগ হয়ে যাবার পর তাঁর পায়ের ফুল কিছুটা নিয়ে যাবেন বাড়িতে—গিন্নিমা খবর পাঠিয়ে দিলেন।

একসময় হালদারমশাই বাড়ি ফিরে সব কথা শুনে তো হতবাক। চেহারার বর্ণনা অনুযায়ী সেই একই মহিলা। মায়ের চরণের ফুল তিনি ধারণ করেছিলেন ভাদ্র মাসে কবচের মধ্যে ধারণ করে। আষাঢ় মাসে আমার বড় ভাইয়ের জন্ম হয়। আমার জন্ম তার দু'বছর পরে।

সতেরশ বিয়াল্লিশ সালে বাংলায় শুরু হয় মারাঠা তাণ্ডব। ভাস্কর পণ্ডিত আর তেইশ

জন মারাঠা সর্দার কুড়ি হাজার বর্গি সেনা সঙ্গে করে এদেশে আসেন। তাদের বাসনা ছিল, বাংলাকে নাগপুরের সঙ্গে জুড়ে দেবার। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুতে তাদের সব কাজে বাধা পড়ে। শিবাজীর জীবিতকালে দিল্লির বাদশা, রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চৌথ মারাঠাদের দেওয়া হবে বলে স্বীকার করেছিলেন। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার নবাব আলিবর্দির কাছে প্রাপ্য পাওনা চেয়ে পাঠান। কিন্তু আলিবর্দি তা দিতে অস্বীকার করেন। সেই রাগে বিশ হাজার বর্গি সেনা বাংলার সর্বত্র ব্যাপক তাণ্ডব চালান। কিন্তু কালীঘাটে এসে মারাঠা সর্দার বলেন, এসব লুঠের সম্পত্তি এই দেবস্থানে ছেড়ে দিয়ে গেলাম, কে পাণ্ডা এখানকার? কাঁপতে কাঁপতে রামকৃষ্ণ বললেন, আমিই এখানকার পাণ্ডা। তাঁকে মারাঠা সর্দার এক পাঞ্জা লিখে হাওলা করে দিলেন, কালীঘাট আর কালী মন্দির। সেই হাওলার সুবাদে রামকৃষ্ণ পাণ্ডা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ হালদার।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পাঞ্জার জোরে রামকৃষ্ণ অপর পক্ষের চারভাইকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন। সেই সুবাদে একদিন রাতে চার ভাই একসঙ্গে মা কালীর পাষাণময় পদাঙ্গুলি জোর করে আনতে গিয়ে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন। হাতাহাতি হাতে হাতে মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। একটুকরো নিয়ে পালালেন রামগোপাল ও তার ভাইয়েরা। বাকী টুকরো রামকৃষ্ণ তুলে রাখলেন মন্দিরে লোহার পেটিকাতে চাবি দিয়ে।

কিছুদিন পরে রামগোপালের দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন।

রামগোপালের জামাই হরচন্দ্র ওরফে হরো বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন খুড়শ্বশুর রামকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। একদিন পাঞ্জার শর্ত নিয়ে আলোচনার সময় মারাঠা সর্দারের পাঞ্জা দেখালেন হরো বাড়ুয্যেকে। হঠাৎ হরচন্দ্র মারাঠা সর্দারের দেওয়া 'হাওলা'-টা মুখে পুরে চিবিয়ে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এই মহাসংকটের দিনে এক যোগী গুরুর সন্ধান পান রামকৃষ্ণ। তার নির্দেশে তিনি সংকট মুক্ত হন। বিবাদ মিটিয়ে নেন জ্ঞাতিদের সঙ্গে। আবার একত্রিত হয় মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলি। মন্দিরে মন্দিরে মূর্তির বায়ুকোণে লোহার বাক্সে রাখা হয় দু'খণ্ডে বিভক্ত পাষাণময় পদাঙ্গুলি। একাজের জন্য হরো বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে পাঁচ বিঘা জমি উপহার পান। এছাড়া ঠিক হয়, নিত্য পুজোর জন্য তাদের কোনও পক্ষই নিভৃতে গোপনে মায়ের কোনও কিছু স্পর্শ করতে পারবেন না। এজন্য দু'জন সৎ ব্রাহ্মণ সন্তান মায়ের মূর্তি রক্ষা করা, তাঁর অঙ্গবাস ঠিক করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হবেন।

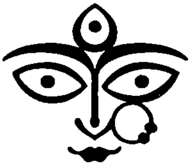
কালীপুজোর দিন মা কালী পূজিতা হন মা লক্ষ্মী রূপে। যেহেতু কালীঘাটে মায়ের নিত্য পুজো হয় তাই কালীপুজোর দিন আলাদা করে কালীপুজো হয় না। সেবাইতরা মনে করেন মা কালী তাদের গৃহদেবী। তবে এই লক্ষ্মীপুজোর বিশেষ সময় আছে। অমাবস্যা

পড়ার পর যখন সন্ধ্যার সময় আসে তখন হয় লক্ষ্মীপূজা। যেমন কোনও বছর যদি অমাবস্যা পড়ে রাত ন'টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটের পর, তাহলে তার পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা যতক্ষণ অমাবস্যা থাকবে, সেইসময় কালীঘাটের মন্দিরে মহালক্ষ্মী পুজো হবে।

কালীঘাটের সেবাইতেরা মা লক্ষ্মীকে শ্যামালক্ষ্মী নামে সম্বোধন করে থাকেন। পুজো শুরুর আগে অলক্ষ্মী বিদায়ের পালা চলে মন্দিরের বাইরে মনসাতলা তথা ষষ্ঠীতলায়। তারপর গর্ভগৃহে মালক্ষ্মীর ধ্যানে মা কালীর পুজো করা হয়। লক্ষ্মীর ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ খাবার। যেমন, পোলাও, সাদা ভাত, ডাল, চাটনি প্রভৃতি। তবে মা কালী যেহেতু আমিষ ভোগ গ্রহণ করেন তাই মা লক্ষ্মীর ভোগের থেকে একটু দূরে দেওয়া হয় আমিষ ভোগ। পুজোর পরে আরতি করে শেষ হয় সেদিনের আরাধনা। একই সঙ্গে আরতি করা হয় মা লক্ষ্মী ও মাকালীর উদ্দেশ্যে।

আলাদা করে কালীপুজো করা হয় বছরের একটি বিশেষ দিনে। ওই দিনটি হল, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের কোনও শনি বা মঙ্গলবার যেদিন অষ্টমী, নবমী বা চতুর্দ্দশী থাকবে। সেদিন কালীঘাট মন্দিরে রক্ষাকালীর পুজো করা হয়ে থাকে। পুজো চলে রাত ন'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত।

দুর্গাপূজার চারদিন কালীঘাটে মা কালী পূজিতা হন মা দুর্গা রূপে। পুরোহিতের কণ্ঠে ভেসে আসে, 'দুর্গা কালিকা ঐ নমঃ'। শাস্ত্র তৈরি করেছেন শাস্ত্রকার অর্থাৎ এই ধরিত্রীর মানুষজন। আসলে মন যদি বলে তুমি অন্ধকারে, অদৃশ্যলোকেও তুমি। আর মন যদি বলে তুমি নও, শত স্পর্শ-ঘ্রাণ-স্বাদ-গন্ধ সত্ত্বেও তুমি নিঃসাড়, তুমি নির্জীব তাহলে তাই। 'মা' এই একাক্ষরী মন্ত্রের কত জোর। তাকে ডাকলেই হয়ে যায় মন্ত্রোচ্চারণ। ন্যাস—প্রাণায়াম, ব্রত-তীর্থ কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। সুখেও তিনি মা, দুঃখেও তিনি, আবার ভয়ের সময়েও তাঁর নামে ধ্বনি দিয়ে ওঠে। কারণ তিনি সর্বভাবিনী, সর্বব্যাপিনী মা।



ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরী

পীঠমালা তন্ত্রে শিব-পার্ব্বতী সংবাদের এক-পঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে বলা হয়েছে,

ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ঠ ফলপ্রদঃ।

বাংলায় এই শ্লোকের মর্মার্থ হল, ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় সেখানে পীঠদেবী ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হয়েছেন। এই পীঠদেবী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠাতা আছেন। সেখানকার বিভাগীয় অফিস থেকে পূর্বদক্ষিণ কোণে একক্রোশ দূরে একটি সামান্য উঁচু পাহাড়ের ওপরে মন্দিরটি অবস্থিত আছে। দেবীর মন্দির কতকটা কালীঘাটের মায়ের মন্দিরের আদলে তৈরি। মূল দরজা পশ্চিম দিকে। উত্তর দিকে ছোট একটি দরজা আছে তা পরবর্তী সময়ে খোলা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। মন্দিরের বাইরের পরিমাপ হল, ২৪× ২৪ ফুট এবং ভেতরের পরিসর ১৬×১৬ ফুট। চারদিকে দেওয়াল ৮ ফুট চওড়া, উচ্চতা ৭৫ ফুট।

পুরনো দিনের প্রণালী অনুসারে নাতিস্থূল ইষ্টক ও উৎকৃষ্ট মসলা দিয়ে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালগুলি এত মজবুত যে, দূর থেকে আসা কামানের গোলাও সহজে এই মন্দিরের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকাল ১৪২৩ শকাব্দ। রাজমালায় পাওয়া যায়, এই মন্দির তৈরির সময় মহারাজ ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে মায়ের বর্তমান মূর্তি আনিয়েছিলেন। এ বিষয়ে রাজমালায় আছে :

আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল
বাস্তুপুজো সঙ্কল্প বিষ্ণু প্রীতে কৈল।।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমাস্থাপ রাজা মহাসত্বে।।
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।
তথা হতে আনি আমা এই মঠে পুজ।
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ।।
....
রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে।
স্বপ্নে সেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে।।
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যেতে আনিল।

সত্ত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল।।
কতদিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল।
পুণ্যহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল।।— ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

রাজমালায় আরও উল্লেখ আছে, এই মূর্তি চট্টগ্রাম থেকে আনা হয়েছিল। 'ত্রিপুর বংশাবলী' বইতে এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে ঃ—

রাধাকৃষ্ণ স্থাপিবারে মঠ আরম্ভিল।
চট্টেশ্বরী দেবী আসি স্বপ্ন দেখাইল।।
এমঠে আমাকে রাজা করহ স্থাপন।
নতুবা অব্যাহতি তোমার নাহি কদাচন।।
এই মঠে যদি আমা স্থাপন না কর।
তবে জান রাজা তোমার নাহিক নিস্তার।।
চট্টগ্রামে সদরঘাটে এক বৃক্ষ মূলে।
পুজয় আমাকে সদা মগধ সকলে।।
সেই স্থান হৈতে শীঘ্র আনহ আমায়।——ত্রিপুর বংশাবলী।

দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরেশ্বরী। ভৈরব ত্রিপুরেশ বা মতান্তরে 'নল'। ভারত চন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে লিখেছেন,

দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নলনামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়।।

তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, দেবী হলেন 'ত্রিপুরাসুন্দরী' এবং ভৈরব 'ত্রিপুরেশ'। শিবচরিত আছে দেবী 'ত্রিপুরা' এবং ভৈরব 'নল'।

ত্রিপুরায় আনার কতদিন আগে এই বিগ্রহ তৈরি করা হয়, মঘেদের দ্বারা পুজিত হওয়ার আগে কোন বংশে কতদিন তাঁর পুজো করা হয়েছে, চট্টগ্রামে তিনি কতদিন ছিলেন, সেসব বিষয় জানা যায় না। এজন্য বর্তমানে মন্দিরে দেবীর যে মুর্তি আছে তা কতদিনের পুরনো তা জানা সম্ভব নয়। এছাড়া বর্তমান মূর্তি স্থাপনের আগে মন্দিরে অন্য কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বা সেখানে দেবতার পূজার্চনা হত কিনা, তাও কোনও ভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

দেবালয়ের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়বে এক সুবিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরকে বলা হয়, সুখসাগর। অনেকদিন আগে এখানে একটি বিশাল হ্রদ ছিল, যা ক্রমেই চারদিকের ছোট ছোট পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া মাটি পড়ে এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি দীঘি আছে যা পুরনো হলেও এর জল খুব পরিষ্কার। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের আমলে এই দীঘি খনন করা হয় বলে এর নাম রাখা হয় 'কল্যাণ সাগর'।

এই সরোবরের দৈর্ঘ্য ২২৪ গজ, প্রস্থে ১৬০ গজ। এ সম্বন্ধে রাজমালায় লেখা আছে ঃ—

সেইকালে মহারাজার, স্বপনে আদেশ।
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ।
আমা সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে।
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্নিধানে।।
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন।
প্রভাতে কহিছে রাজা স্বপ্নের কথন।।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল।
সিদ্ধান্ত বাগীশ আদি যত দ্বিজ ছিল।।
হরিষ হইয়া নৃপ কহে সেইক্ষণ।
পুষ্কর্ণী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন।।
বাস্তুপুজা পরে পুষ্কর্ণীর আরম্ভন।
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন।।
জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর
পুষ্কর্ণীর নাম রাখে 'কল্যাণ সাগর'।। —কল্যাণমাণিক্য খণ্ড।

রাজমালায় প্রস্তাবনায় লেখা আছে—
দুর্ল্লভেন্দ্র নাম ছিল চন্তাই প্রধান।
চতুর্দ্দশ দেবতা-পুজাতে দিব্যজ্ঞান।—রাজমালা—৩ পৃষ্ঠা

এই চতুর্দশ দেবতাই ত্রিপুর রাজবংশের কুল দেবতা।

মহারাজ দৈত্যের ছেলে ত্রিপুর, অত্যন্ত ক্রুর প্রকৃতির, অত্যাচারী এবং উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন। দৈত্য শত চেষ্টা করেও তাঁর দুশ্চরিত্রতা কোনওভাবে নিবৃত্ত করতে পারেননি। কালক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর ছেলের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি বাণপ্রস্থে চলে যান।

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পরেও ত্রিপুরের চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি। দুর্দমনীয় রণস্পৃহা, প্রজাপীড়ন, লঘুদোষে প্রাণদণ্ড, অবিচার, পররাজ্য ও পরস্ত্রীহরণ ইত্যাদি অনাচারে আশেপাশের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এক সময় স্বয়ং মহেশ্বর, প্রজাদের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে, দ্বাপরের শেষভাগে সংহার মূর্তি ধারণ করে নিজের হাতে ত্রিপুরকে সংহার করেন।

রাজমালার ১১ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে লেখা আছে—

মারিলেক শূল অস্ত্র হৃদয় উপর।
শিব মুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর।

রাজরত্নাকর গ্রন্থে মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরের নিহত হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায়

তা থেকে আভাস পাওয়া যায়, শিবদ্বেষী ও অত্যাচারী ত্রিপুরের প্রতি রাজমন্ত্রীসহ সকলের মনেই বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমনকি এমন তথ্যও পাওয়া যায়, রাজাকে সংহার করার জন্য তারা সম্রাটের চিরশত্রু হেড়ম্বপতির শরণাপন্ন হন। তখন হেড়ম্বেশ্বর মনে করলেন, 'ইহারা মহারাজ ত্রিপুরের বিরুদ্ধবাদীর ভাগ করিয়া আমার মনোগত ভাব জানিতে আসিয়াছে। আমি যদি ইহাদের নিকট মনের কথা প্রকাশ করি, তবে বিপদের আশঙ্কা আছে।' একথা ভেবে হেড়ম্বেশ্বর রেগে গিয়ে তাদের আপন রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন।

প্রজারা ত্রিপুর-রাজমন্ত্রী নরসিংহের কাছে গেলে তিনি বললেন, 'মহাদেবের কৃপালাভ ব্যতীত এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নেই। রাজা রাজধানীতে অবস্থানকালে আমরা এই কার্য্যে লিপ্ত হইব না। কারণ, আমরা তাঁহার অকল্যাণ কামনা করিতেছি, ইহা যদি কর্ণগোচর হয়, তবে আমাদের বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। রাজা মৃগয়া প্রিয়, তিনি যখন মৃগয়া ব্যাপদেশে বনে গমন করিবেন, তখন আমরা মহাদেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইব।' এরপর এই পরিকল্পনামত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। মহাদেবের কাছে আকুল প্রার্থনা করার পর তিনি অত্যাচারী ত্রিপুরকে দমন করার ব্যবস্থা করলেন। এ বিষয়ে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে,

শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পরে জিজ্ঞাসিল।
ক্ষত্রিয়বংশেতে কেন ত্রিপুর নাম হৈল।।
চণ্ডাই কহে মহারাজা তাহা বলি আমি।
যেই মতে ক্ষত্রিয় বংশে ত্রিপুর হৈলা তুমি।।
দক্ষকন্যা সতী অঙ্গ পতন যে স্থানে।
মহাপীঠ নির্ণয় মুনি বলিছে পুরাণে।।
শিববাক্য পীঠমালা তন্ত্রের প্রমাণ।
সেই রাজ্যে যেই অঙ্গ সেই পীঠস্থান।।
সেইরাজ্যে একদেবী ভৈরব আর জন।
দুই নামে পীঠস্থান করে নিরূপণ।।

অথ পীঠমালা তত্ত্ব ঃ
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রি পুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ঠ প্রদায়কঃ।

পদবন্ধে আছে,
সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে।।
ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।
তান বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে।।
সেই সে কারণে ক্ষত্রী ত্রিপুর জাতি বলে।

অবধান কর রাজা মন কুতু হলে।।
ত্রিপুর বংশের প্রমাণ আর যযোচিত।
পঞ্চবেদ মহাভারত প্রমাণ লিখিত।।
মহাভারতের সভাপর্বতে লিখিছে।
সহদেব দিগ্বিজয় দক্ষিণে গিয়াছে।

তন্ত্রচূড়ামণিতে উল্লেখ আছে ঃ
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্ঠ ফলপ্রদঃ।।

এর দ্বারা বোঝা যায়, এই ত্রিপুরাই বর্তমানের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী। জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্মচক্র, চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও ক্ষিতীশাবংশাবলী প্রভৃতি বইতে বর্তমানে ত্রিপুরার নাম উল্লেখ আছে।

মহারাজ ত্রিলোচন, চতুর্দ্দশ দেবতার পুজার্চনার জন্য দণ্ডীদের সাগরদ্বীপ থেকে আনবার জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন। রাজমালার ত্রিলোচন খণ্ডে এর উল্লেখ রয়েছে। উদ্ধত এবং অধার্মিক ত্রিপুর তখনও জীবিত আছেন মনে করে দণ্ডীরা ত্রিপুরায় আসতে সাহস করেননি। এই সূত্রেই সাগর দ্বীপের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কথিত আছে, মহারাজ ত্রিলোচনের সঙ্গে দণ্ডীদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল এবং রাজার অত্যাচারের বিষয়ে দণ্ডীরা জানতেন। রাজরত্নাকারের মতে, এই দণ্ডীদের আগে দ্রুহ্য সন্তানেরা দেবতার সেবাইত ছিলেন। মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচারে তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইসব ঘটনার দ্বারা জানা যায়, সুন্দরবনে রাজধানী থাকার সময়ে সন্তদের সঙ্গে রাজবংশের ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সেইসূত্রেই কিরাত দেশে রাজ্য স্থাপনের জন্য তাদের আনা হয়।

চন্তাই নামে জনৈক দণ্ডী ত্রিপুর রাজবংশের বিবরণ প্রাচীনকাল থেকে সংগ্রহ করেছেন। রাজমালা, রাজরত্নাকর প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিহাস তাঁর মুখ থেকে শুনেই রচিত হয়েছে। এইভাবেও ত্রিপুর রাজবংশের সঙ্গে সাগরদ্বীপের ঘনিষ্ঠতা হয়। সম্ভবত সেই কারণেই সুন্দরবনে স্থাপিত ত্রিপুর সুন্দরী মূর্তি দ্বারা ত্রিপুরার সঙ্গে সাগরদ্বীপের সম্বন্ধ সূচিত হয়। কালিদাস দত্তের লেখা, 'সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস' বইতে ত্রিপুরাসুন্দরীর উল্লেখ রয়েছে। ওই বইতে অম্বুলিঙ্গের নামও পাওয়া যায়। সেখানে আছে, বর্তমান সময়ে উক্ত প্রদেশের প্রাচীরতত্ত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্যে ভাগিরথী নদীর পশ্চিমকূলে বড়াশীতে অম্বুলিঙ্গ, ছত্রভোগ ত্রিপুরাসুন্দরী ও অন্ধমুনি প্রভৃতি নামে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান আছে।'

ত্রিপুরাসুন্দরী শব্দের পাদটীকায় লেখা আছে, 'ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্রে এইক্ষণে ত্রিপুরা বালা ভৈরবী নাম্নী এক দারুময়ী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই দেবালয়ের পুরোহিতগণ বলেন যে উহা একটি পীঠস্থান এবং দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী শক্তি ও বড়াশিব অম্বুলিম্ব ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, তথায় দেবীর বক্ষস্থল (বুকের ছাতি) পড়িয়াছিল। কথিত আছে

যে, উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির বহু প্রাচীনকালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের নিকটবর্তী কাটান দীঘি নামক স্থান ছিল। পরে উহা তথা হইতে ছত্রভোগে স্থানান্তরিত হয়। এইক্ষণে যে দেবীগৃহ ছত্রভোগে বর্তমান আছে, উহাও তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। ১২৭১ সালে ঝড়ে উক্তপ্রাচীন মন্দির পড়িয়া যাইবার পরে ইদানীন্তন মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রীর পথপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহের বিবরণ দিয়ে বলেছেন,

‘এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে
আইলেন ছত্রভোগ মহাকৃত্ হলে।।
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী।।
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
‘অম্বুলিঙ্গঘাট’ করি বোলে সর্ব্বজনে।।

অন্যদিকে, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, ধনপতির সিংহল যাত্রা পথের যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন সেখানেও ত্রিপুরাসুন্দরী ও অম্বুলিঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে কবিকঙ্কন লিখেছেন,

‘নাচনগাথা বৈষবঘাটা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া।।
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা।।
ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিলা সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিলা সদাগর।।

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর রচিত ‘যশোহর খুলনার ইতিহাস’—এ ত্রিপুরাসুন্দরীর কোনও বিবরণ দেন নি। কিন্তু সেখানে অম্বুলিঙ্গের উল্লেখ আছে, শশাঙ্কের রাজত্বকালে সমতটের নানাস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাতিয়াগড়ে সুপ্রসিদ্ধ অম্বুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর শিব, কুশদহে যমুনাতটে, লাউপালা নামকস্থানে জলেশ্বর শিব এইসময় বা তাহার অব্যবহিত পরবর্তীযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।’

ত্রিপুরাসুন্দরী পীঠদেবী এবং সতীর বক্ষঃস্থল পড়ায় এই পীঠের উদ্ভব হয়েছে, এটাই একাংশের বিশ্বাস ছিল। তন্ত্রচুড়ামণি, পীঠমালাতন্ত্র, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও শিবচরিত প্রভৃতি বইতে কোথাও সুন্দরবনে পীঠ প্রতিষ্ঠার কোনও উল্লেখ নেই। একমাত্র কুব্জিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু দেবীর কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ার সূত্রে পীঠসৃষ্টির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধপীঠ দেবীর অঙ্গ ব্যতীতও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তন্ত্রের বিধানে যে জায়গায় কোটি হোম বা কোটি মহাবিদ্যামন্ত্র জপ করা হয়েছে, সেই জায়গাকে সিদ্ধপীঠ বলা হয়।

এই ধরনের কোনও কারণে সাগর কিনারে 'সিদ্ধপীঠ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কুব্জিকাতন্ত্রের মতে 'জ্যোতির্ম্ময়ী'। প্রাচীনকালে এই জায়গায় কোনও মূর্তি থাকবার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী একমাত্র ত্রিপুরাতেই রয়েছেন। এ বিষয়ে সব শাস্ত্রের বইতে একই তথ্যের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে, 'ত্রিপুরায়াং দক্ষপদে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।' এই দেবী মূর্তি দারুময়ী। 'রাজরত্নাকর' বইতে মহারাজ প্রতর্দ্দনের নাতি কলিঙ্গ নামা ভূপতি বর্ণনা দিয়েছেন,

'ত্রিবেগাৎ পূর্ব্বদেশে মন্দিরম্ সুমনোহরং
নির্ম্মায় সহাপয়ামাস ত্রিপুরাসুন্দরী পরাং।।
চতুর্ভূজাং দারুময়ীং যথোক্ত বিধিপূর্ব্বকং।
অদ্যাপি বর্ত্ততে রাজন্ সা মুর্ত্তিঃ সুপ্রতিষ্ঠিত।।'

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, ত্রিপুরেশ্বরীর দেবীমূর্তি চার হাজার বছরের পুরনো। ত্রিপুরায় আনার কতদিন আগে এই বিগ্রহ তৈরি করা হয়, মঘেরা এই মূর্তি পুজো করার আগে , কোথায় কোন বংশ, কতদিন অর্চিত হয়েছেন, এই মূর্তি চট্টগ্রামে কতদিন রাখা হয়েছিল, তা জানার কোনও উপায় নেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে তাকালে এক বিশাল প্রান্তর চোখে পড়ে। এই প্রান্তরের নাম 'সুখ সাগর'। এক সময় এটি একটি বড় হ্রদ ছিল। মন্দিরের পূর্ব দিকে একটা দীঘি আছে। এটি খুবই প্রাচীন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে এই দীঘির খোঁড়ার কাজ শুরু হয় বলে এর নাম হয়েছে 'কল্যাণ সাগর'।

প্রতিদিন অন্নব্যঞ্জন, লুচি, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে দেবীর ভোগ হয়। একটি করে পাঁঠা প্রতিদিন বলি হয়ে থাকে। অতীতে এখানে নরবলি হত বলে শোনা যায়। নগরের উপকণ্ঠে ভৈরব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ভৈরবের নাম কোনও তন্ত্রে 'ত্রিপুরেশ', কোনও কোনও তন্ত্রে 'নল' বা 'অনল' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভৈরবের বাড়িকে 'মহাদেব বাড়ি' বলা হয়ে থাকে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই মন্দির তৈরি ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়ে ত্রিপুর বংশাবলীতে উল্লেখ আছে।

'আর এক মঠ তবে অপূর্ব গঠিত। সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল।'

মন্দিরে ত্রিপুরেশ্বরীর সামনে পিতলের সিংহাসনে যে শালগ্রাম শিলা দেখা যায়, তাকে বলা হয় রাজ রাজেশ্বর চক্র।

মণিকর্ণিকার তীরে পিতৃবৎ অবস্থানরত ধন্যকে রাম নামে জনৈক যোগী মহারাজ দেখতে পান। যোগীপুরুষ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁকে আরও অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করান। এ বিষয়ে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'নানা স্থানে ঘুরে এই যোগীবর নগরের উপকণ্ঠে আসে রাজ্যশ্বর'। অনেক জায়গা ঘুরে যোগী বর্তমানে ত্রিপুরার উদয়পুরে কচ্ছপের পিঠের মত একটা উঁচু টিলা ভূমিতে জীর্ণ মন্দিরে ধন্যকে জপের জন্য বসার আদেশ দেন। বললেন, এই কুর্ম্মপৃষ্ঠকার স্থানে সরোবর তীরে নানা জাতি ফুলে প্রশান্ত নিবিড়ে

প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরে জপের জন্য কর পঞ্চমূর্তির আসন। যেদিন হবে অষ্টসিদ্ধি সাধন তারপর হবে জপ সমাপন। সেই শুভক্ষণে আমি পুনঃ আগমন করব।'

গুরুদেবের কৃপায় শ্রীধন্য কিছুদিনের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। যোগীবর তখন আবার সেই জায়গায় দেখা দিয়ে বললেন, 'এক দম্ব বন সিদ্ধালয়।' ১৪২৩ শকাব্দে প্রতাপমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজা হন শ্রীধন্য। রাজত্বের দায়িত্ব নেবার পরেই তিনি জীর্ণ মন্দিরটি সংস্কার করার পর রাজেশ্বর শালগ্রাম শিলাস্থাপন করেন। একদিন রাতে ত্রিপুরেশ্বরী মা রাজা শ্রীধন্যকে স্বপ্নে দেখা দেন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় বলা আছে,

'স্বপ্নযোগ কহে চণ্ডী শুন ধন্য রায়।
চট্টল হাতে ফিরে আন আমায়।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন 'মগ' জাতির মানুষ পূজো করতেন ত্রিপুরেশ্বরীকে। যখন মহারাজ শ্রীধন্যের সেনারা চট্টলে গিয়ে পৌঁছাল, তখন মগেদের সঙ্গে তাদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাঁধে। ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপায় অবশেষে মহারাজের সৈন্যরা প্রস্তরময় মূর্তি উদ্ধার করে ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করে। এইসময় দৈববাণী হল, 'মহারাজ না,' ভয় করিও না, পীঠস্থান যথায় তথা রাত্রি ভোর হবে নিশ্চয়'।

নগরের উপকণ্ঠে কূর্মপৃষ্ঠ স্থানে বর্তমানে মন্দিরের কাছে আসতেই সূর্যদেব উঠিল গগনে। দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, এখানে আমার মন্দির স্থাপন কর। মহারাজ বললেন, মা, মন্দিরে আমি বিষ্ণুকে স্থাপন করেছি, তোমায় অন্য স্থানে আর একটি মন্দিরে রেখে পুজিব। কারণ, তুমি মহাশক্তি, তান্ত্রিক পদ্ধতিতে তোমায় পুজো করতে হলে বলি দিতে হবে। কিন্তু এখানে বিষ্ণুর সামনে কিভাবে বলি দেওয়া সম্ভব? আমি তোমায় অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করব। কিন্তু মা ত্রিপুরেশ্বরীর অকাট্য যুক্তিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মহারাজ ধন্যমাণিক্য। একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল, বিষ্ণু এবং শক্তির। সেই থেকে অর্থাৎ ১৪২৩ শকাব্দ থেকে আজ অবধি সেখানেই মা ত্রিপুরেশ্বরীর পুজো হয়ে আসছে। সেই সময় ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় মহারাজ উত্তর প্রদেশের কান্বকুব্জ তথা কনৌজ নগর থেকে দুই ব্রাহ্মণ পাণ্ডাকে সেখানে এনে মায়ের সেবায় কাজে লাগানো হয়। সেইকাজের জন্য রাজা ব্রাহ্মণদের কিছু জমিও দান করেন। আজও সেই বংশের উত্তর পুরুষেরাই মায়ের পুজো করছেন। পুজোর কাজের জন্য মহারাজ টলুয়া বা মাণ্ডবী, বাজনাদার, মশালধারীদের কিছু কিছু জমি দান করেন। মশালধারী পাহাড়ীয়া শ্রেণীর মানুষরা আজও প্রতিটি অমাবস্যার দিনে মন্দির চত্বরে উপস্থিত হয়ে তাদের পূর্বসুরীদের মতো মশাল ধরে আলো দেখায়।

মূর্তির লাল জিভ না থাকায় তিনি কালী নন। তন্ত্রের ষোড়শীরূপে তিনি পুজিতা হয়ে থাকেন। জানা গেছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে এখানে বেদীপীঠ ছিল। সেখানে কালীযন্ত্র দেখা যায়। যন্ত্রটি করবী ফুলের মতো। বেদীর চারপাশে অনেক দেবতার মূর্তি ও অস্পষ্টভাবে আরও কিছু দেখা যায়। মূর্তির আসনে যার মাথা থাকার কথা সেই মুণ্ডের মাপ অনুযায়ী চিহ্ন আজও দেখা যায়। মায়ের মূর্তির দক্ষিণদিকে একটি ছোট মূর্তি দেখা যায়। তাঁকে ছোট মা নামে পুজো করা হয়। কথিত আছে, ওই ছোট মূর্তিটি মা ত্রিপুরেশ্বরীর

মন্দিরের কাছে কোনও এক জলাশয়ের মধ্যে ছিল। অতীতে রাজারা যুদ্ধে যাবার আগে এই ছোট মূর্তিটিকে পুজো করতেন।

জানা যায়, ত্রিপুরার রাজা বংশানুক্রমে নিত্যদিন মন্দিরে এসে ত্রিপুরেশ্বরী মা'কে দর্শন করতেন ও সকল কুলাচার মেনে চলতেন এবং তা যাতে বজায় থাকে তার জন্য নির্দেশ দিতেন। কিন্তু মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের ছেলে গোবিন্দমাণিক্য কুলাচার ভেঙে নরবলি বন্ধ করে দেন। দেবী তখন স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, কুলাচার মতে যদি না পুজ আমায়, গ্রাম ছাড়া হবে তুমি জানিও নিশ্চয়। একদিন সত্যি সত্যিই রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন।

মা ত্রিপুরেশ্বরীর পুজোয় আজও কোনও ছেদ পড়েনি। জনৈক সত্যসাধনের বন্দনায় উল্লিখিত আছে,

শুনহে মায়ের অপূর্ব প্রতিভা, নানা দেশ হতে আসে ভক্ত অগনন মায়ের সেই দক্ষিণ চরণ পুজিতে নিত্য চলে ভোগবাদ্য আরতি উৎসব, দেবতা গন্ধর্বগণ করে মায়ের স্তব।

মৎস্য কুর্ম্ম নির্ভয়ে জলেতে খেলা করে।
পীর আওলিয়া আসে নানা স্থান হতে।।
নানা দেবতা, মুনি ঋষি আসেন হেথা শূন্য হতে।
কেহ ব্যাঘ্র, কেহ গজে, কেহ বা পথে ভগবান জন দেখা পায় আচম্বিতে।।
হেথা বসে ত্রিপুরেশ শিব ভোলানাথ।
অন্যত্র শুভ্রদা, বলরাম, জগন্নাথ,
মায়ের পূজার সনে এই সমদয়।
দেখলে পুজিলে হয় মহা পুণ্যদয়।।
বছর মোকাম আছে মায়ের বাড়ীর পথে।
হিন্দু মুসলমান যায় তথা সিন্নি দিতে।।
বিপদে পড়লে নাবিক সকলে বছর বছর
বলে কাটে অমঙ্গল।।
ত্রিপুরপীঠের কথা বড় পুণ্যময়,
যেই পড়ে সেই রাখে গ্রহদোষ ক্ষয়।
দেবীর মাহাত্ম্য কথা যে করে শ্রবণ,
সর্বপাপে মুক্তি আগে স্বর্গে গমন।।
বুধ গ্রহের শুরু এই ত্রিপুরা সুন্দরী।
এত দূর দেবী মাহাত্ম্য রচিল অধম সত্য সাধন।।

না, একান্ন পীঠগুলির নামের মধ্যে তারাপীঠের উল্লেখ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশের মতে, তারাপীঠও মহাপীঠগুলির অন্যতম। এনিয়ে একদিকে যেমন অনেক সংশয় আছে, ঠিক তেমনি আছে বেশ কিছু অকাট্য যুক্তি। অগণিত সাধারণ মানুষ মনে করেন, তারাপীঠ হল প্রাণের পীঠ, আনন্দের পীঠ। মোক্ষলাভের আদর্শ জায়গা। সত্যের তথা জীবনের সন্ধানে তাই অগণিত মানুষ বারবার ছুটে যান বীরভূমের তারাপীঠে।

মহাঋষি বশিষ্ঠদেব ছোটবেলায় সব বিষয়ে সব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এক সময় মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি তপস্যা শুরু করেন। প্রথম প্রথম তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নানান ধরনের বিভীষিকা। কিন্তু তাদের ভয়ে ভীত হননি তিনি। একসময় দৈববাণী শুনলেন বশিষ্ঠদেব, 'তুমি চীন দেশে যাও'। কিন্তু চীন দেশের আচার আচরণ দেখে মনে যথেষ্ট ঘৃণা আসে তাঁর মনে। কিন্তু আবার দৈববাণী শুনে অবাক হয়ে গেলেন, 'এভাবেই তোমাকে সাধনা করতে হবে। হঠাৎ-ই আগের জীবনের কথা মনে পড়ে গেল বশিষ্ঠদেবের। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে চীনদেশেই সাধনার জন্য তিনি যাবতীয় শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেন। শিক্ষার শেষে বশিষ্ঠদেব ফিরে আসেন বীরভূমে। প্রথমে তিনি কবিনন্দপুরে মূর্তি স্থাপন করার কথা ভেবেছিলেন। পরে নদীর ওপারে চন্দ্রচুড়ের পাশে শিমুলতলায় তারামূর্তি স্থাপন করেন ও সেখানেই সিদ্ধিলাভ করেন।

কথিত আছে, ব্রহ্মার ছেলে বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার দর্শন লাভের আশায় বাবার কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে হাজার হাজার বছর কঠোর তপস্যা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবীর দেখা পান নি। তখন বশিষ্ঠদেব ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাবা ব্রহ্মাকে বলেন, আপনি আমায় যে মন্ত্র দিয়েছেন তা সিদ্ধিলাভের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই আমায় অন্য মন্ত্র দিন। ব্রহ্মা তাঁকে বোঝান, তুমি মনপ্রাণ দিয়ে যোগের সাহায্যে আবার দেবীর দর্শন প্রার্থনা করো। তিনি নিশ্চয়ই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। বাবার আদেশে বশিষ্ঠদেব আবার এক হাজার বছর মন্ত্র জপ করলেন। তা সত্ত্বেও দেবীর দর্শন পেলেন না তিনি। নিজের ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে একসময় তিনি মহাবিদ্যাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি না জেনে আমাকে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছে। যে আমার সেবা করার পদ্ধতি জানে না, আমার ভাবনার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে কি করে যোগের মাধ্যমে আমার পাদপদ্মের দর্শন পাবে? বেদেও আমার সাধনা সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। মহাচীনে যাও। সেখানে গেলে আমার মহাভাব প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। তারপর তুমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবে।

দেবীর অন্তর্ধানের পর চীনদেশে গেলেন বশিষ্ঠ। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন বহুরূপী মহাদেবের সাধনার উপাচার। ভয় পেয়ে গেলেন পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনার রূপ

দেখে বৈদিকাচারনিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব। কিন্তু দেবীর আদেশের কথা মাথায় রেখে তিনি মহাদেবকে বললেন, আপনার আচারের বিষয়ে জানতে চাই। জানতে চাই, কিভাবে আমি সিদ্ধিলাভ করব। তখন বশিষ্ঠদেব শিক্ষা পেলেন কৌলাচারের। সেই বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে তিনি ফিরে এলেন দ্বারকা নদীর তীরে।

কালিকাপুরাণে আছে, ব্রহ্মার মানসকন্যা চন্দ্রভাগ পাহাড়ে তপস্যার জন্য গিয়েছিলেন। পাহাড়ে যাওয়ার সময় বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে তিনি তারা-উপাসনা পদ্ধতির সন্ধান পান। তপস্যায় নারায়ণের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মেধাতিথির যজ্ঞকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন। মেধাতিথি, যজ্ঞকুণ্ড থেকে কামরূপে তাকে লাভ করেন। তাই তার নাম রাখেন অরুন্ধতী। কিশোরী অবস্থায় তিনি সাবিত্রী বেহুলা, সরস্বতী, চারুপদা ও গায়ত্রীদের কাছে শিক্ষা নেন। একসময় বশিষ্ঠদেব ও তিনি, পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। অরুন্ধতী মনে মনে বশিষ্ঠদেবকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাদের এই পারস্পরিক ভালবাসার কথা সাবর্ণি, ব্রহ্মাকে জানান। তারপর ব্রহ্মাসহ সব দেবতারা মানস পাহাড়ে এসে বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে অরুন্ধতীর বিয়ে দেন। কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন মেধাতিথি।

পুরাণে আছে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের বিবাদের সুবাদে রাক্ষস সৌদাস বশিষ্ঠদেবের একশ ছেলেকে হত্যা করে। এই বিবাদের কারণ উল্লেখ আছে মৎস্যপুরাণে। সেখানে উল্লেখ আছে, ক্লান্ত বশিষ্ঠদেব নিমিরাজের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য আপত্তি করায়, রাজা অন্য পুরোহিতকে পৌরোহিত্য করার জন্য উদ্যোগ নিলে বশিষ্ঠদেব প্রচন্ড রেগে গিয়ে তাকে শাপ দিয়ে বলেন, তুমি বিদেহ হও। নিমিরাজও বশিষ্ঠদেবকে একই অভিশাপ ফিরিয়ে দেন। ফলে দু'জনের হাল হয় একই রকম। ব্রহ্মার বরে নিমিরাজ প্রতিটি জীবের চোখের পাতায় আশ্রয় পান। বশিষ্ঠদেব জন্মগ্রহণ করেন মিত্রাবরুণের ছেলে হিসাবে। অন্য আর একটি মতে, বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মার নির্দেশে দেহহীন অবস্থায় কামরূপের পীঠে তপস্যায় রত হন।

এক সময় বিষ্ণু তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন। সেই বরপ্রাপ্তির সময় সন্ধ্যাগিরিতে অমৃত নিয়ে এসে কুণ্ড তৈরির পর স্নান করে ও তার জল খেয়ে আগের শরীর ফিরে পান। একসময় উগ্রতারা তাঁকেও তাড়াবার চেষ্টা করেন। সেই প্রচেষ্টা দেখে তিনি অভিসম্পাত দিয়ে বলেন, তুমি যেহেতু আমায় তাড়াবার জন্য ধরেছ, এজন্য মায়েদের ও অন্যজনের কাছে বামভাবে পুজো পাবে। তোমার প্রমথরা ম্লেচ্ছে'র মতো ঘোরাফেরা করছে বলে এই তীর্থে ম্লেচ্ছ হয়ে থাকবে। এমনকি স্বয়ং মহাদেবও এখানে ম্লেচ্ছের মতো থাকবেন। যতদিন না বিষ্ণু এখানে আসবেন ততদিন এই জায়গা এইভাবেই থাকবে। একসময় কামরূপের মাহাত্ম্য খুবই কম প্রচার পাবে। তবে যিনি এই মাহাত্ম্য জানতে পারবেন তিনি সম্পূর্ণ ফললাভ করবেন।

তন্ত্রসারের তারার্ণব তন্ত্রে বলা হয়েছে,

'বশিষ্ঠারাধিত্য বিদ্যা ন তু শীঘ্র কলা যতঃ।
অগাস্তেনাপি মুনি না শাপো দত্তঃ সুদারুণাঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়াং ফলদ্রাত্রী ন কস্যাচিৎ।
শাপোদ্বারমাহ চন্দ্রবীজং এ পান্তস্থ বীজোপরি নিয়োজিতং।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধুরিব যশস্বিনী।
ফলিনী সর্ববিদ্যানাং জয়িনী জয়কাঙ্খিণাং।
বিবক্ষায়কারী বিদ্যা অমৃতত্ত্ব প্রদায়িনী।।
মন্ত্রস্য জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভূমি জায়তে।

(তারাপ্রকরণম্)

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে, অনন্তর যোগী রূপধারী বেতাল ভৈরব যে দিকে সন্ধ্যাচল আছে সেই দক্ষিণ দিকে গেলেন। সেখানে বশিষ্ঠ আনীতা কান্তানদী আছে। সেই নদীর তীরে ছায়া-ঘেরা গাছ তলায় ঢাকা এক বিরাট পর্বত। ব্রহ্মার মানসপুত্র এখানে বসে তপস্যা করেছিলেন বলে দেবতারা এর নাম সন্ধ্যাচল রেখেছেন; এখানে গিয়ে তাঁরা তপঃপ্রভা সম্পন্ন দ্বিতীয় সূর্য সদৃশ শিব-পূজা পরায়ণ ধ্যানাসক্ত চিত্ত মূর্তিমান অগ্নিরূপ বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করে তাঁর সামনে অবনত মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি দিয়ে স্তুতিবার করতে লাগলেন।

কোনও কোনও তন্ত্রে বশিষ্ঠদেবের চীনে যাবার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে চীনাচারসার তন্ত্রের কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল ঃ-

ততঃ প্রণম্য তাং দেবীং বশিষ্ঠো সঃ মহামুনিঃ।
জগামাচার বিজ্ঞান বাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণং।
ততো গত্বা মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ো মুনেঃ।
দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বর সুসেবিতং।
কামিনীনাং সহস্রেন পরিবারিতমীশ্বরং।
মদিরাপান সজ্জাত মদ মন্থর লোচনং।
দুরাদেব বিলাক্যৈনং বশিষ্ঠো বুদ্ধরূপিনং
বিস্ময়েন সদাবিষ্ট স্মরম্ সংসার তারিণীং।।
কিমিদং ক্রীয়তে কর্ম্মং বিষ্ণুণা বুদ্ধিপণা।
দেবদেব বিরুদ্ধোহয়ং আচারসম্মতো ময়া।
ইতি চিন্ময়তন্তস্য বশিষ্টস্য মহামুনেঃ।
আকাশবাণী প্রাহাসু এবং চিন্তায় সুব্রত।
আচার পরামার্থোহং তারিণী সাধনে মুনেঃ।
এতদ্ বিরুদ্ধাচারস্য মতে না সৌ প্রসীদতি।

যদি তস্যা প্রসাদন্তং অচিরে নাভি বাঞ্ছসি।
এতেন চীনাচারেণ তদত্ত্বং ভজ সুব্রত।
অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিনম্র মহামুনিঃ।
প্রযুক্তং তারিণীদেব্যা নিজারাধন হেতবে।
তচ্ছত্বা ভগবান্ বুদ্ধস্তত্ত্ব জ্ঞানময়ো হরিঃ
বশিষ্ঠং প্রাহ সুজ্ঞানচীনাচারধি কারবান্।
অপ্রকাশ্যোহয়মচোর স্তারিণ্যা সর্বদা মুনেঃ।
তব ভক্তি বশাদস্মিন্ প্রকাশ্যামিহ তৎপরঃ।

'গুপ্ত চীনা চারক্রমে' বুদ্ধরূপী মহাদেব বশিষ্ঠ দেবকে বলেছেন, দক্ষের মেয়ে সতী মায়াপুরে (এখনকার হরিদ্বার বা কনখলে) শরীর ত্যাগ করার পর তাঁর দেহের নানা অংশ বিভিন্ন জায়গায় পড়েছিল। তাঁর ত্রিনেত্রের তিনটি মণি তিন জায়গায় পড়ে তিনটি তারাপীঠ তৈরী হয়েছে। এই তিনটি পীঠ বত্রিশ দেবযোজনব্যাপী ত্রিকোণের আকারে বিরাজ করছে। এখানে ত্রিপাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ত্রিতারায় সাধনা করতে হয়।

গুপ্তচীনা চারক্রমে ঃ দেবীর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

করতোয়া পশ্চিমে তু দক্ষনেত্র প্রপাতনম্।
ভবানী সা মহাদেবী একজটা সুরেশ্বরী।।
রুদ্ধশ্চ ভৈরবো যত্র চণ্ডবাপি প্রচণ্ডকঃ।
আগমোক্ত বিধানেন পূজাজপাদিকং ততঃ।
ত্রিলক্ষজপমাত্রেতু তত্র সিদ্ধির্ণ সংশয়।।

বুদ্ধদেব, বশিষ্ঠমুনিকে বল্লেন, মিথিলার অগ্নিকোণে ভাগিরথীর উত্তরে তিনটি তারাপীঠের মধ্যে বাঁদিকের চোখের মণি পড়েছে। তারামায়ের দক্ষিণ চোখের মণি পড়েছে করতোয়া নদীর পশ্চিম দিকে। সেখানে দেবী 'ভবানী' নামে খ্যাত। পাশেই আছেন রুদ্রদেব চণ্ডভৈরব। দেবীর উর্ধনয়ন কোথায় পড়েছে সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন :

বক্রেশ্বরস্য ঐশ্বান্যাং বৈদ্যনাথস্তু পূর্বতঃ।
দ্বারকায়াং পূর্বভাগে তত্র তারা অধিষ্ঠাতা।।
শিলাময়ীতি তদ্দেবী নিবসন্ শাম্মলীমূলে।
প্রত্যক্ষং সর্বযুগেহস্মিন্ চণ্ডিকাস্থিতিঃ সর্বদা।।
তত্র সিদ্ধির্ণ সন্দেহো দিবারাত্রে মুহূর্তকৈঃ।
অকস্মাৎ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদুগ্রভীরা প্রসাদতঃ।।

অর্থাৎ বক্রেশ্বরের ঈশান কোণে দ্বারকানদীর পূর্বদিকে শিমুল গাছের মূলে দেবীর শিলামূর্তি আছে। তিনি যুগে যুগে পূজিতা মা তারা রূপে। কথিত আছে, এখানে যার শরীর চলে যায় তার আর জন্ম হয় না। আর এখানে সাধনা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। আরও শোনা যায়, তারাপীঠে পুজো দিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। সাধকদের মতে, তিনলক্ষ জপ করলেই এখানে সিদ্ধিলাভ করা যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন তারাপীঠের

শিমূলতলায় একাদশ সহস্র সাধক সিদ্ধিলাভ করবেন। তারপর যিনি সাধকশ্রেণী তিনিই ধ্বংস করবেন শিমূলতলা।

বুদ্ধদেবের নির্দেশে তিব্বত থেকে পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বশিষ্ঠদেব তারাপীঠে এসে তারামায়ের দর্শন পান। তারার্ণবতন্ত্রে বলা আছে বশিষ্ঠমুনির সাধনায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহাদেব শাপদমন্ত্রে তাঁকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সেখানে বলা আছে, ব্রহ্মানন্দ গিরি তাঁর 'তারারহস্যময়' বইতে লিখেছেন, প্রথম নিগমকল্পে রত্নদীপসহ দেবালয়ে উপবিষ্ট সদাশিব কালিকামুখনির্গ বাক্যাবলী শ্রবণপূর্বক পরিতোষ লাভ করিতে পারিলেন না, এহেতু পূর্বপৃষ্ঠ প্রশ্নগুলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে মূর্তিতে বিকট বদন দশাননকে বিনাশ করিয়াছিলেন, বরাভয় করা, খড়গ ও মুণ্ডধারিণী, লোলজিহ্বা, ভীষণমূর্তি সেই কালিকাদেবী সকলেরই বিশেষ অর্চিতা। হে প্রিয়ে! তৎকালে রুদ্রের জন্য সুরবৃন্দ চিন্তাকুল হইলে, ব্রহ্মা দেবগণের সহিত একত্র হইয়া স্তব্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বাকপটুতা, ধন ও মোক্ষদাত্রী কালিকাদেবী তাহাদিগকে দর্শনপূর্বক লজ্জিত হইলেন ও অবনতমস্তকে বাম করে ধৃত খড়গ দক্ষিণ করে আনয়ন করিলেন। তখন রুদ্রের পরিধেয় চর্মাম্বর স্খলিত হইলে ব্রহ্মা তাহা ধারণ করিলেন। পরে কাঞ্চীমুদ্রা গ্রহণ, দক্ষিণে খড়গধারণ ও শিরস্থ মুকুট ভূতলে নিক্ষেপপূর্বক তথায় রুদ্রকে আনয়ন করিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ভূতলে পদ সমীপে পতিত হইয়া বলিলেন, হে সুরেশ্বরি! আমি দ্বাদশ অযুতশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াও তোমার কলা কাহাকে বলে, বলিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব হে ভক্তবৎসলে। মাতঃ কালিকে। মৎপতি প্রসন্না হইয়া যোগ উপদেশ কর।

'প্রাণতোষিণী' তন্ত্রে উল্লেখ আছে, তারাপুর অর্থাৎ বর্তমান তারাপীঠ, একান্নপীঠের অন্যতম বলে উল্লেখ না থাকলেও 'পীঠনির্ণয়'এ অন্যতম পীঠ হিসাবে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে,

তারাদায়াং বামনেত্রং তারাখ্যাতারিণী পরা
উন্মত্তো ভৈরব স্তত্র সর্বলক্ষণ সংযুতঃ।

নীলতন্ত্র বইতে উল্লেখ করা হয়েছে একটু অন্যভাবে। রাঢ় অঞ্চলে দ্বারকা নদীর পূর্বদিকে যে শ্বেত শিমূলগাছ আছে তার তলায় রয়েছে তারামায়ের শিলামূর্তি। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে যে উগ্রতারা তার অংশবিশেষ সতীর তৃতীয় নয়ন পড়েছিল, সেই তথ্য সবসময় গোপন করা হয়। বলা বাহুল্য, বশিষ্ঠদেব এখানে দেবীর আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। এক সময় দ্বারকানদী দিয়ে বাণিজ্যযাত্রায় যেত বড় বড় নৌকা। একবার রত্নগড়ের বণিক জয়দত্ত দ্বারকা নদী দিয়ে নৌকা করে যাচ্ছিলেন। একসময় নেমে এল সন্ধ্যা। মাঝি মাল্লারা যেখানে নৌকা ভেড়ালেন সেটিই ছিল তারাপীঠের শ্মশান সংলগ্ন ঘাট। তখন অনেক রাত। থুরথুরে বৃদ্ধার বেশে স্বয়ং মা তারা নৌকায় এসে জয়দত্ত'র কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন জয় দত্ত। ঘটনাচক্রে ওই রাতেই জয়দত্ত'র একমাত্র ছেলেকে বিষধর সাপ দংশন করে। তখনকারদিনে সাপে কাটা মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত কলার ভেলায়। জয়দত্ত ঠিক করলেন ছেলের ক্ষেত্রেও

একই পথ অবলম্বন করে নিজে আত্মহনন করে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাবেন।

পরের দিন গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে অমৃতকুণ্ডের ধারে বসে মাঝি মাল্লারা রান্নার আয়োজন করছিল। এমন সময় জনৈকা জেলেনী একটি বড় শোলমাছ বিক্রি করার জন্য নিয়ে এল। মাঝিরা মাছটা কুটে ধোওয়ার জন্য নিয়ে গেল অমৃতকুণ্ডে। কুণ্ডের জলের স্পর্শ পেতেই টুকরো টুকরো করে কাটা মাছ জ্যান্ত হয়ে জলের মধ্যে চলে গেল। এই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে মাঝিরা তো হতবাক। তারা ছুটে গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা জানাল তাদের প্রভু জয় দত্তকে। জয়দত্ত হতবাক হলেন তাদের কথা শুনে। তিনি ভাবলেন, টুকরো টুকরো করে কাটা মাছ যদি কুণ্ডের জলের স্পর্শে জ্যান্ত হয়ে ওঠে তাহলে তার মরা ছেলেও বেঁচে উঠতে পারেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জয়দত্তের নির্দেশে মৃত ছেলেকে ভাসিয়ে দেওয়া হল অমৃতকুণ্ডের জলে। মুহূর্তের মধ্যে সে 'জয় তারা' বলতে বলতে উঠে এল জল থেকে। ঘটনার প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় জয়দত্ত যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই রাতেই তারা মা জয়দত্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি যেখানে এখন রয়েছ সেটিই হচ্ছে মোক্ষতীর্থ তারাপীঠ। এখানেই শাম্মলী মূলের কাছে আমি শিলামূর্তি আকারে রয়েছি। তুমি তা প্রতিষ্ঠা কর। শুধু আমার নয়, চন্দ্রচূড় মহাদেবের পুজোর ব্যবস্থাও তুমি করবে।

মায়ের নির্দেশমত জায়গায় জয়দত্ত খুঁজে পেলেন ব্রহ্মশিলা। সেখানেই শিমূলগাছের পাশে শ্মশানের মধ্যে একটি ছোট মন্দির তৈরি করিয়ে তারা মা ও মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করলেন। খবর নিয়ে জানালেন, কাছেই রয়েছে মহুলা গ্রাম। দেবীপুজোর জন্য সেখান থেকে আনা হল ভৈরব ঠাকুরকে। পুজোর জন্য কেনা হল বেশ কিছু সম্পত্তি। অমৃতকুণ্ডের নাম হয়ে গেল 'জীবিত কুণ্ড'। অনেকে একে বলেন, জীয়ন পুকুর। তারাপীঠে তারা মায়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের। সীতাকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে পুজো করে জাগিয়েছিলেন মা দুর্গাকে আর এই শরৎকালেই, আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে জয়দত্ত তারাপীঠে তারামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর ঢাকার রাজা রামজীবন নতুন করে মন্দির তৈরি করান। কিন্তু সেই মন্দিরও একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয় ১২২৫ বঙ্গাব্দে। শোনা যায়, মল্লারপুরের ব্যবসায়ী জগন্নাথ রায় এই মন্দির তৈরির কাজে প্রভুত অর্থ ব্যয় করেন।

রাজা রামজীবন রায়ের দত্তক পুত্র রামকান্ত রায়ের স্ত্রী রাণী ভবানী। তিনি তারামায়ের নিত্য পুজোর জন্য বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করেন। তৎকালীন চণ্ডীপুর মৌজার মালিক আসাদুল্লা খাঁ-র কাছে প্রস্তাব করেন, রাণীমার এলাকার বনহাটে আয় বেশি হয়। তাই আসাদুল্লা খাঁ যদি মৌজা চণ্ডীপুরের পরিবর্তে মৌজা বনহাট নিতে চান, তাহলে তিনি তা এখনই দিয়ে দিতে রাজী। তারা মায়ের ইচ্ছায় রাজী হলেন আসাদুল্লা। নাটোরের রাণীমার নিয়ন্ত্রণে আসে তারাপীঠ।

রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের আমলে তারাপীঠে আনন্দনাথ নামে জনৈক কৌল সাধক আসেন তারাপীঠে। রাজা তাঁকে তারাপীঠের প্রধান সেবাইত হিসাবে স্বীকৃতি দেন। আনন্দনাথের পরে তাঁর শিষ্যও আনন্দনাথ নাম গ্রহণ করে প্রধান হিসাবে অভিষিক্ত হন। তিনি এখানে কৃষ্ণ এবং কালীর একত্রে পুজোর ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময় থেকেই তারাপীঠে জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দোলযাত্রার প্রবর্তন হয়।

তারামায়ের পুজো কোন সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে এ সম্পর্কে নানান মতভেদ আছে। তবে জানা গেছে, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সময় তারা মায়ের পূজোর ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। বৌদ্ধতন্ত্র মতে, তারা মা হলেন লোকেশ্বর বুদ্ধের সূতা। তাঁর আর এক নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। মৎস্যসূক্ত তন্ত্রের সপ্তম পটলে আছে, 'লোকেশ্বরস্য সূতাপা নমতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া'। সেখানে আরও উল্লেখ আছে,

জয় জয় তারে দেবি নমস্তে,
প্রভবতি ভবতি যদিই সমস্তে।
প্রজ্ঞাপারমিতা মিতচরিতে,
প্রণতজনানাং দুরিত ক্ষয়িতে।।

তারাপীঠকে কেন্দ্র করে রয়েছে হাজারো কাহিনী, অসংখ্য গাঁথা। কালিকাপুরাণের সাতচল্লিশ থেকে একান্ন অধ্যায়ে এরকম একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আছে। অবশ্য অন্যত্রও এ ধরনের কল্পকথার সন্ধান পাওয়া যায়। কথিত আছে,

মহাদেব এবং সতী একসময় নিভৃত বিশ্রাম করেছিলেন। তখন দ্বার রক্ষা করেছিলেন ভৃঙ্গী এবং মহাকাল। হঠাৎ-ই সতী কিছুটা অবিনস্ত বেশে বাইরে বেরিয়ে আসেন। দেবীকে ওই অবস্থায় দেখে লজ্জায় মাথা নীচু করেন দুই দ্বাররক্ষী। তাদের দেখে ক্ষুব্ধ সতী অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমরা মর্তে গিয়ে জন্মগ্রহণ করো। যেহেতু তোমরা আমায় এই অবস্থায় দেখেছ তাই তোমাদের মুখ হবে বানরের মতো। অভিশাপ শুনে মহাকাল ও ভৃঙ্গী বললেন, আমরা আপনার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করতে চাই। সেজন্য আপনাকেও মর্তে আসতে হবে। আপনি অসংযত অবস্থায় আসলেও আমরা কিন্তু সংযতই ছিলাম। কিছুদিন পরে মহাদেব মর্তে এসে, দক্ষের পৌত্র তথা পৌষ্যরাজার ছেলে হয়ে জন্মান। একসময় তাঁর বাবা-মা বাণপ্রস্থে চলে যাওয়ার পর তিনি, দৃশদ্বতী ধারে করবীরপুরের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। কপালে চন্দ্রলেখা থাকায় তাঁর নাম রাখা হয় চন্দ্রশেখর। অন্যদিকে আর্যাবর্তের ভোগবতী নগরে রাজা কুকুৎস্থ ও রাণী মনোন্মাথিনীর কন্যা হিসেবে সতী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বুকে জন্ম থেকেই ছিল নক্ষত্রমালার মতো হার চিহ্ন। তাই তাঁর নাম রাখা হল তারাবতী। একসময় বিবাহ যোগ্যা তারাবতীর জন্য আয়োজন করা হয় স্বয়ম্বর সভার। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য রাজার দিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি চন্দ্রশেখরকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেন। রাজা কুকুৎস্থ বিয়ের যৌতুক হিসাবে আটাশ হাজার দাসী ও দু'হাজার গাভী উপহার দেন। তারাবতীর মতো তাঁর বোন চিত্রাঙ্গদাও খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন।

তিনি দিদির সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যান। চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয়েছিল উর্বশীর গর্ভে। শোনা যায়, অষ্টাবক্র মুনির শাপে চিত্রাঙ্গদাকে উর্বশীর গর্ভে জন্ম নিতে হয়।

আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল ওদের দিনগুলি। কাছেই নদীতীরে বাস করতেন কপোত ঋষি। তিনি স্নানরত অবস্থায় তারাবতীকে দেখে মোহিত হয়ে যান। মুনিবর তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কায় কপোত হিসাবে থাকতেন বলে সকলে তাকে কপোত নামে অভিহিত করত। একদিন কপোত ঋষি সরাসরি তারাবতীর কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। মুনির কথা শুনে তারাবতী তাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে আসেন। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল, কোনও সুন্দরী দাসীকে যথাযথভাবে সাজিয়ে ঋষি কপোতের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তারাবতী চিত্রাঙ্গদাকে মুনির কাছে যেতে বললেন।

কালে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে দুটি ছেলে হয়। একদিন তারাবতী নদীতে যখন স্নান করতে যান তখন তিনি ঋষি কপোতের চোখ এড়াতে পারলেন না। চিত্রাঙ্গদাকে তার পরিচয় জানতে চাওয়ায় চিত্রাঙ্গদা শাপের ভয়ে সত্যি কথা বলে দিলেন। তখন কপোত মুনি তাঁকে শাপ দিয়ে বলেন, তুমি আমায় ছলনা করার জন্য খুব কুৎসিৎ দেখতে কপর্দকহীন কোনও ব্যক্তি তোমায় গ্রহণ করবেন। এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান আসবে এবং তাদের মুখ দেখতে হবে বানরের মতো।

এদিকে চন্দ্রশেখর রাণীকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পারেন না। আবার রাণী, স্বামী ও মহাদেবের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। একদিন মহাদেব ও দুর্গা তারাদেবীকে দেখতে পাওয়ার পর তাদের মনে পড়ে গেল ভৃঙ্গি ও মহাকালের কথা। তখন দুর্গা আশ্রয় নিলেন তারাদেবীর শরীরে এবং মহাদেব কপোত ঋষির অভিশাপ স্মরণ করে বীভৎস রূপ ধারণ করে তারাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলেন। কিছুদিনের মধ্যে জন্ম নিল এক কুৎসিত বানরের মুখের মতো পুত্র সন্তান। এরাই ভৃঙ্গি ও মহাকাল। রাণী ও সদ্যোজাত দুই ছেলেকে দেখে রাজা চন্দ্রশেখরের মনে নানান সংশয় জন্মাল। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন দেবর্ষি নারদ। তাঁর নির্দেশে তাদের নাম রাখা হল ভৈরব ও বেতাল।

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে, রাজার আরও তিনটি ছেলে ছিল। তাদের নাম উপরিচর, অলর্ক ও দমন। তাই ভৈরব ও বেতাল রাজার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হত। একদিন তাদের সঙ্গে কপোত ঋষির দেখা হল। তিনি তাদের জন্ম রহস্য বর্ণনা করলেন এবং কামরূপের সন্ধ্যাচলে গিয়ে ব্রহ্মার ছেলে বশিষ্ঠদেবের পরামর্শ নেওয়ার উপদেশ দিলেন। তখন কপোত বশিষ্ঠদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাধনার জন্য বশিষ্ঠদেব চীনদেশে গিয়েছিলেন। পরে তিনি তারাপীঠে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এই কাহিনীর সঙ্গে তারাপীঠের যথেষ্ট সংযোগ আছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

তন্ত্রসারে, পীঠের চারকোণে যে গুরুপংক্তি আছে সেখানে কেশানন্দনাথ নামে চারজন গুরুর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পাঁচজন সিদ্ধগুরুর নাম। এরা হলেন,

বশিষ্ঠানন্দনাথ, কুর্মনানন্দনাথ, মীননাথানন্দ, মহেশ্বরানন্দনাথ ও হরিনাথানন্দনাথ। তারামনেনেন্দ্র বলা হয়, আনন্দনাথ শব্দান্তো গুরুবঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ। অন্যদিকে বারে বারে প্রশ্ন উঠেছে, কে এই বশিষ্ঠদেব, তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন? কারও মতে, তিনি বুদ্ধদেবের সময়ের লোক। আবার কারও মতে, তিনি বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের মতে, তিনি ইষ্টকে নিজের বশে আনতে পেরেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বশিষ্ঠ। আর এক মতে, তাঁর অন্য কোনও নাম ছিল। বশিষ্ঠ তিনি উপাধি হিসাবে পেয়েছিলেন। তারাতন্ত্রে বলা হয়েছে,

অথ তারাগুরুণ্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদষ্টফলপ্রদান্।
ঊর্ধ্বকেশো ব্যোমকেশো নীলকণ্ঠ বৃষধ্বচঃ।।
দিব্যোখাঃ সিদ্ধিদা বৎস সিদ্ধৌখান্ শৃণু তত্ত্বতঃ।।
বশিষ্ঠঃ কুর্মনাথশ্চ মীননানো মহেশ্বরঃ ।।
হরিনাথঃ মানবৌখান্ শৃণু বক্ষ্যামি তদ্গুরুণ্।
তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরণ।।
সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।
বিরুপাক্ষ ফেরবী চ কথিতং তারিণী কুলং।।

অর্থাৎ চারজন দিব্যৌখ গুরু মহাদেবেরই চার প্রতিমূর্তি তন্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধৌখরা হলেন, যোগী পুরুষ। বশিষ্ঠদেব, মীননাথ সেই যোগীদেরই অন্যতম। তান্ত্রিক যোগিনী হলেন তারাবতী ও ভানুমতী। সুখানন্দ যোগীপুরুষদের একজন। তবে তারা সিদ্ধগুরু হিসাবে চিহ্নিত নন।

তারাপীঠের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম। ওই গ্রামে সেই সময় অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। বামাক্ষ্যাপার বাবা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। বামাক্ষ্যাপা ছোটবেলা থেকেই এত সরল ছিলেন যে, পাড়ার লোকেরা তাঁকে 'হাউড়ে' বলেই ডাকতেন। সর্বানন্দ ছিলেন ধর্মভীরু এবং সরল, সাধাসিধে মানুষ। কম বয়সে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি মনপ্রাণ নিবেদন করেন তারা মায়ের সেবায়। মা রাজকুমারীর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন বামা।

১২৪৪ সনের ১২ ফাল্গুন তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ত। পড়শীদের বাড়ির ঠাকুর ঘরের সব বিগ্রহ চুপিসারে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে তিনি পুজোয় মেতে উঠতেন। এক সময় তাঁদের সংসারে প্রবল আর্থিক অনটন দেখা দেয়। কারণ হল, একদিকে যেমন সংসারে সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে খরচও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ব্যাপারে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন সর্বানন্দ। তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন, বেহালা বাজানোতেও তাঁর খ্যাতি ছিল চারপাশের মানুষজনের কাছে। এই দুটি পুঁজির ওপর নির্ভর করে তিনি একটি কৃষ্ণযাত্রার দল গঠন করেন। খুব একটা পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না বামাচরণ। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিক্রমী হিসাবে চিহ্নিত হত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের

ধর্মকাব্য যথা, কবিকঙ্কন, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদের গান সেই ছোট্ট মনে ঝড় তুলত। পরবর্তী সময়ে এইসব গান গেয়ে ভক্তদের মাতিয়ে দিতেন বামাচরণ।

শুধু বাবা-মাই নন, বামাচরণের বড় বোন জয়কালী দেবী ছিলেন তাঁর কাছে পথদর্শকের মতো। জয়কালী ছিলেন প্রকৃত সাধিকা। ছোটবেলায় বিধবা হওয়ার পর তিনি বাপের বাড়ীতে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এই মহীয়সী নারী একদিন নিজের শরীর ছাড়ার আভাস দেন। তারাপীঠে তারা মায়ের পায়ের তলায় তাঁকে আনা হলে 'তারা নাম' উচ্চারণ করতে করতে তিনি শরীর ত্যাগ করেন।

অনেকদিন আগের কথা। বিশেক্ষ্যাপা নামে এক মহাসাধকের আবির্ভাব হয় তারাপীঠে। এরপর আসেন কৌলাচার্য আনন্দনাথ। আনন্দনাথের শিষ্যের শিষ্য ছিলেন মোক্ষদানন্দ। এইসময় তারাপীঠে কৈলাসপতি বাবার আবির্ভাব হয়। তাঁর সান্নিধ্যে বামাচরণ হয়ে যান তারামায়ের কোলের ছেলে।

নাটোরের রাজরাণী একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে উঠলেন। মা-তারা তাঁকে স্বপ্নে জানিয়েছেন, চারদিন ধরে তিনি উপবাসী রয়েছেন। মা বলেছেন, যুগ যুগ ধরে আমি এখানে রয়েছি। কিন্তু আর আমার এখানে থাকার কোনও উপায় নেই। মন্দিরের পুরুত আর তোমার রক্ষী আমার ছেলে বামাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। এই দেখ, সেই দাগের ছাপ পড়েছে আমার পিঠে। কেন তাকে তোমার লোকেরা মেরেছে জান? মন্দিরে তখন আমায় ভোগ দেওয়া হয়েছে। আমি আমার ছেলেকে ডেকে বললাম, আয়, আমার সঙ্গে খাবি আয়। তাই তো ও মন্দিরে ঢুকে আমায় দেওয়া ভোগ থেকে খেতে এসেছিল। আজ চারদিন হল আমার ছেলে না খেয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আমিও উপবাসী রয়েছি।

কেঁদে উঠলেন রাণীমা। বললেন, মা তুমি যা চাইবে আমি তাই মেনে নেব। তখন মা-তারা বললেন, ঠিক আছে আমি তারাপীঠেই থাকব। তবে এখন থেকে এমন ব্যবস্থা করো যাতে আমায় ভোগ দেওয়ার আগে বামাচরণকে খেতে দেওয়া হয়।

সকালে উঠেই রাণীমা দেওয়ানকে আদেশ দিয়ে বললেন, এখন তারাপীঠে গিয়ে বামাচরণ আর মায়ের ভোগের ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন, চারদিন ধরে আমার মা উপবাসী রয়েছেন। দেওয়ান তারাপীঠে পৌঁছে বরখাস্ত করলেন পুরুতমশাই ও রক্ষীকে। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন তিনি কোথায়? তিনি তখন দেওয়ানজীকে দেখে ভয়ে লুকিয়ে পড়েছেন। অনেক খোঁজাখুজির পর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলা হল, মা-তারাকে ভোগ দেওয়ার আগে বামাচরণকে যেন খেতে দেওয়া হয়।

আর একবার বামাচরণকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল তারাপীঠে। তিনি তখন প্রায়শই তারামায়ের মন্দিরে অথবা শ্মশানে ধ্যানাবস্থায় ও সমাধিতে মগ্ন থাকতেন। এক এক সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। এরই মধ্যে একদিন তিনি তারামায়ের মূর্তিতে প্রস্রাব করে দিলেন। উপস্থিত সবাই ও পুরোহিতরা সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বামাচরণকে এ বিষয়ে বলা হলে তিনি বললেন, 'বেশ করেছি, আমার মায়ের গায়ে মুতেছি, তোদের

তাতে কিরে, শালারা।' সেদিনই সেই আশ্চর্যজনক খবর পাঠানো হল নাটোরের রাজদরবারে। এবারেও পাওয়া গেল মায়ের আদেশ। রাজদরবার থেকে আদেশ এল, মায়ের পুজো যেমন চলছে তেমনই চলবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপার কথায় পরে আসছি, তার মাঝে তন্ত্রসাধনা ও তিব্বত সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অনুভূতি আভাষ দিতে চান। উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে পরিক্রমার সময়ে ১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজকে (গঙ্গাধর মহারাজ) লেখা চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন,

....তিব্বত সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে-স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব, সংস্কৃতে তিব্বতকে 'উত্তরকুরুবর্ষ' কহে-উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চভূমি—এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে। ....তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর এবং ঐ প্রকার immorality দ্বারা যখন নিবীর্য হইল, তখনই কুমারিল ভট্ট দ্বারা দূরীভূত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাউলরা মহাপ্রভুকে secret স্ত্রীসম্ভোগী, সুরাপায়ী ও নানা প্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতোক্ত' তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিত ব্যাখ্যা করে; ফলে এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায়; বর্মা ও সিংহলের লোক প্রায় তন্ত্র মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে এবং উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে 'অমিতাভ বুদ্ধম্' মানে, তাঁহাকেও ঢাকীসুদ্ধ বিসর্জন দিয়াছে। মূল কথা এই, উত্তরের লোকেরা যে 'অমিতাভ বুদ্ধম' ইত্যাদি মানে, তাহা 'প্রজ্ঞাপারমিতা' দিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জন করিয়াছে। যে everything for other তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছ, ঐ phase of Buddhism আজকাল ইউরোপকে, বড় strike করিয়াছে।

....যে ধর্ম উপনিষদে জাতি বিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়া ছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy. তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে নাই তাঁহার intellect এবং heart যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্মবাদ, তাহা Jew প্রভৃতি সকল ধর্মের কর্মপাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢং সব পুরাতনের মতো রহিল, সেই তাহার অন্তঃকর্মবাদ—সেই তাঁহার বেদের পরিবর্তে সূত্রে বিশ্বাস করিতে হুকুম। সেই জাতিও

ছিল, তবে গুণগত হইল, সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম মানে না, তাহাদিগকে 'পাষণ্ড' বলা। 'পাষণ্ড'টা বৌদ্ধদের বড় পুরানো বোল, তবে কখনও বেচারীরা তলোয়ার চালায় নাই এবং বড় toleration ছিল। তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্মের প্রমাণ? বিশ্বাস কর। যেমন সকল ধর্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেইজন্যই তিনি অবতার হন। তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মতো। কিন্তু শঙ্করের how far more ground and national! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ, দুঃখ, পালাও পালাও। ....উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart অনুমাত্র পান নাই কেবল dry intellect—তবে তন্ত্রের mob-এর ভয়ে ফোড়া সাড়াতে গিয়ে হাতসুদ্ধ কেটে ফেললেন।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু 'ইতি' করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরের আপনাকে limited করিবার শক্তি নাই।

....আপন ইচ্ছায় ইতস্তত তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে, কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন; যেখানে বেদ শেষ হইয়াছে, সেই বেদান্তর পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর। বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত, তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তম-বস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্তবৎ, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ ভ্রমণ কর।
ইতি—

বিবেকানন্দ

আবার ফিরে আসি তারাপীঠ ও সাধক বামাক্ষ্যাপার নানান প্রসঙ্গে। মন্দির চত্বরের ধারে খরস্রোতা দ্বারকা নদীর পাড়ে তারাপীঠের মহাশ্মশান। অনেকের বিশ্বাস, এই শ্মশানে কারও দেহ চিতার আগুনে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে তার নির্বাণ লাভ হয়। শ্মশানের মধ্যে একধারে রয়েছে বশিষ্ঠ মুনির পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তার পাশেই মাটিতে শোয়ানো আছে মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার পুণ্য দেহ।

বেশ কয়েকটি কুকুরের সঙ্গে বামাক্ষ্যাপার সখ্যতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বাবার সঙ্গলাভ থেকে তারা বঞ্চিত হত না কখনও। একপাতে তাদের সঙ্গে দুপুরের আহার করতেন মহাতাপস। তবে দিনের বিভিন্ন সময় তাঁর আচরণে নানান পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত। কখনও তিনি দিগম্বর অবস্থায় উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। আবার কখনও গাঁজা বা কারণ সেবন করে থাকতেন মহানন্দে। আবার কখনও বা আচরণ করতেন বালকের মতো। সেই তিনিও মাঝে মধ্যে হয়ে উঠতেন পিশাচবৎ।

শাস্ত্র অনুসারে জানা যায়, দত্তাত্রেয়, দুর্বাসা, বশিষ্ঠদেব, ভৃগু প্রভৃতি মুনিরা ছিলেন তারাসিদ্ধ। ইতিমধ্যেই এদেশের আটটি স্থান মা তারার সিদ্ধপীঠ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বামাক্ষ্যাপার বাবা যখন প্রয়াত হন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। অনন্যপায়

হয়ে মা রাজকুমারী দেবী বামাক্ষ্যাপাকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। মামা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চাষের কাজে বামাচরণকে মাঠে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মাঠে গিয়ে তিনি অন্য ভাবে বিভোর হয়ে যান। তাঁর সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে গরুগুলি অন্যের ফসলের ক্ষতি করে। দিনের পর দিন প্রতিবেশীদের অভিযোগ শুনে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়, আটলায়, নিজের বাড়ীতে।

বামাচরণকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় মা রাজকুমারীদেবী। কি করে সংসার চলবে? ভবিষ্যতে বামা কি করবেন—এইসব সাতপাঁচ ভেবে রাজকুমারী দেবীর দুশ্চিন্তা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারাপীঠের শ্মশানে তখন প্রায়শই আসতেন বিভিন্ন তন্ত্রসাধকেরা। মাঝে মাঝে বামাচরণও ছুটে যেতেন সেখানে। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটে থাকা ফুল তুলে ঢেলে দিতেন তারামায়ের পাদপদ্মে। তারাপীঠের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বে তখন ছিলেন মোক্ষদানন্দ। বাবা কৈলাসপতিও তখন সেখানে থাকতেন।

কৈলাসপতি বাবার সংসার জীবন সম্পর্কে তেমন কোনও পরিচয় জানা যায় না। অনেকে তাঁকে মণি গোঁসাই বলে ডাকতেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে ক্ষ্যাপা বলেও ডাকতেন। তিনি বশিষ্ঠাসনে বসার অধিকারী ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, তারাপীঠে আসার আগে তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। কৃষ্ণসাধনায় সফল হয়ে তিনি শ্যামা তথা তারা মায়ের সাধনায় ব্রতী হন তারাপীঠে এসে। তুলসীর মালা গলায় পরে, ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে সর্বদা মেতে থাকতেন তারানন্দে। কুলার্ণবের আনন্দ স্তোত্রে বর্ণনা করা হয়েছে —

বামে রামা রমনকুশলা দক্ষিণে পানপাত্র
মগ্রে ন্যস্তং মরিচ সহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসম্।
স্কন্ধে বীণা ললিত সুভগা সদ্‌গুরুণাং প্রপঞ্চঃ।
কৌলোধর্মঃ পরগগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ।।

অর্থাৎ কোলের বাম পাশে রমনকুশলা রামা, দক্ষিণে পানপাত্র, সম্মুখে মরিচের সঙ্গে উষ্ণ বরাহ মাংস, স্কন্ধে সুললিতা মোহিনী বীণা এবং সদ্‌গুরুদের সঙ্গ—এই ধরনের ভাবনা সাধারণ মানুষ তো বটেই মহাতাপসদেরও ধারণার বাইরে। বিজ্ঞজনের মতে, ক্ষ্যাপাবাবার মধ্যে এই ভাব দেখা যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনিই বামাচরণকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। তারাপীঠে আরও একজন কৈলাসপতি বাবা ছিলেন। তিনি মোক্ষদানন্দবাবার শ্বশুরকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। সাংসারিক জীবনে তাঁর নাম ছিল ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। নদীয়া জেলার অধিবাসী মোক্ষদানন্দ ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহিত জীবনের মোহত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কাশীতে চলে যান। সেখানে তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা দেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বীরভূমের শক্তিপীঠে সাধনা করতে বলেন। তারাপীঠেই তাঁর সাধন জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে। একসময় রামানন্দ মণ্ডলের মেয়ে শুভঙ্করীকে তিনি ভৈরবী হিসাবে গ্রহণ করেন। মোক্ষদানন্দবাবার সঙ্গে বামাচরণের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। তিনি ডাবুকে অনাদিলিঙ্গের মন্দির তৈরি করান। অনেকে তাঁকে ডাবুকের কৈলাসপতি বলেও সম্বোধন করতেন।

বহরমপুরের তারাক্ষ্যাপা, বামাক্ষ্যাপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিও একসময় তারাপীঠের মন্দিরের প্রধান হন। সেখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী বাবা, খাঁকি বাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, জটামা, নিগমানন্দ পরমহংস প্রমুখ।

দিন যত এগোয়, বামাচরণ ততই তারামায়ের টানে বিভোর হয়ে যান। আগে স্থানীয় মানুষেরা তাকে ডাকতেন 'হাউড়ে' বলে। কিছুদিন পর থেকে তাঁকে ডাকা হত 'ক্ষ্যাপা' নামে। পিতৃহারা হবার পর বামাচরণ বুঝতে পেরেছিলেন সংসারের আর্থিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। তাই কখনও কখনও অভাবে জর্জরিত নিজের মাকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন, বামুনের ছেলে আমি। তুমি দেখো, কোথাও না কোথাও অন্তত পুজো করার কাজ আমার জুটে যাবে। মা, তুমি চিন্তা করো না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাজের চেষ্টাও করেন বামাক্ষ্যাপা। দু'এক জায়গায় কাজও পান। কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার ফিরে আসেন নিজেদের বাড়িতে। খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন তিনি। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী তিনি বেশিদিন সেখানেও থাকতে পারেনি। স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য চলে এসেছিলেন তারাপীঠের মহাশ্মশানে।

এইভাবে চলতে চলতে একসময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, শরীরের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বেশির ভাগ সময়েই থাকতেন খোলা আকাশের নীচে। গরম-ঠাণ্ডা-বর্ষা সবেতেই তিনি একইভাবে বিচরণ করতেন।

এরই মধ্যে একদিন সকালে ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ঘটনা। বামাক্ষ্যাপা স্নান করতে গিয়েছিলেন শ্মশানসংলগ্ন নদীতে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল নদীর ওপারে ছোট ভাই রামচরণ মায়ের মৃতদেহ সৎকার করার জন্য নিয়ে এসেছে। তখন ভরা বর্ষা। তাই কিছুতেই নদী পেরিয়ে ওপারে তারাপীঠের শ্মশানে রাজকুমারী দেবীর দেহ নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু মহাসাধক মায়ের অন্তিম সময় কোনও বাধাই মানতে রাজী হননি। মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন মায়ের মৃতদেহের সৎকার হোক তারাপীঠের মহাশ্মশানে, যেখানে এই পৃথিবীর সঙ্গে চিরবন্ধন থেকে প্রত্যেককে মুক্ত করে দেন স্বয়ং মা তারা।

শবদেহ বাহকেরা তখন রাজকুমারী দেবীর সৎকার করার তোড়জোড় করছেন। এমন সময় দেখা গেল, বামাক্ষ্যাপা সাঁতারে এপারে চলে আসছেন ওপার থেকে। তারপর শবদেহ বাহকদের কাছে থেকে কেড়ে নিলেন মায়ের মৃতদেহ। একখণ্ড কাপড় দিয়ে মাকে পিঠে বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীর জলে। তারপর নদী পার হয়ে এসে লেলিহান আগুনের মাঝে চিরবিদায় দিলেন নিজের জন্মদাত্রীকে।

মায়ের শবদাহের পরে আবার সেই একই আচরণ। কোনও দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ আদ্যশ্রাদ্ধের দিন তিনেক আগে ছোটভাইকে আদেশের সুরে বললেন, দেখিস মায়ের শ্রাদ্ধের সময় আশেপাশের গ্রামের কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। রামচরণসহ উপস্থিত সবাই তো ক্ষ্যাপাবাবার সে কথায় হতবাক হয়ে গেলেন। কি যে বলছেন তিনি! নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো তাদের অবস্থা। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন দেখা গেল, জানা-অজানা অনেক মানুষ থরে থরে উপাচার ও খাবার নিয়ে আসছেন। চারিদিক ভরে গেছে অগণিত অতিথির

উপস্থিতিতে। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। শুরু হল মেঘের প্রবল গর্জন। সবাই প্রমাদ গুণছেন কি হবে, তারই আশঙ্কায়? বামাক্ষ্যাপা তখন বসে আছেন তারাপীঠের শ্মশানে আপন খেয়ালে। আকাশে মেঘ দেখে তিনি ছুটে এলেন নিজের বাড়িতে। ভাইকে সান্তনা দিয়ে বললেন, তোরা কোনও চিন্তা করিস না। তারামায়ের আশীর্বাদে সবকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সত্যিই তাই হল। তারামায়ের জয়ধবনির মাঝে সবাই দেখলেন, আটলা গ্রামের আশেপাশে উন্মত্ত হাতির মতো মেঘবৃষ্টির দাপাদাপি। অথচ শ্রাদ্ধের জায়গার আশেপাশে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ছে না। অনির্বচনীয় আনন্দের মাঝে কয়েক শ' মানুষ সেই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

তথাকথিত জাতপাত কিছুই মানতেন না বামাক্ষ্যাপা। তিনি সন্ধান করতেন প্রকৃত মানুষের। নন্দ হাড়ি একজন তথাকথিত পিছিয়ে পড়া মানুষ ছিল তাঁর অনুগত। একসময় নন্দ হাড়ির দুটি হাত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়। ওই অবস্থাতেই সে মহাতাপসের খাবার জল তুলে দিত। একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, বাবা, ও জাতে হাড়ি তায় আবার কুষ্ঠরোগ, ওর দু'টো হাতে ছেয়ে গেছে। আপনার মতো মানুষ কি করে ওর হাতে জলগ্রহণ করছেন?

কথাগুলি শুনে প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিলেন, আমার ইচ্ছে আমি ওর হাতে জল খাই। তাতে তোর কী? এমন আর কত অসুস্থ, পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে তিনি সুস্থতার সন্ধান দিয়েছিলেন অলৌকিকভাবে। এমনকি মৃত্যু পথযাত্রী মানুষকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রাণ। এমনও শোনা যায়, জনৈক তরুণী বিধবা অতি শুদ্ধ মনে তাঁর জন্য খাবার তৈরি করে আনেন। ক্ষ্যাপাবাবা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, মা তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। তাঁর সেই আশীর্বাদ পরবর্তী সময়ে সত্যে পরিণত হয়। এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সেই তরুণী বিধবার বিয়ে হয় এবং যথাসময়ে তিনি সন্তানের মা হন।

১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাস। বৃষ্টির প্রকোপে এক মিনিটও রেহাই মিলছে না। এমন সময় ক্ষ্যাপাবাবা ভক্তদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, মোক্ষদানন্দ বাবাকে যেখানে সমাধি দেওয়া হয়েছে সেখানেই যেন এ দেহকে সমাধিস্থ করা হয়। ২রা শ্রাবণ রাতে তিনি তারামায়ের নাম জপ করতে করতে তারাপীঠে মহাসমাধিতে লীন হয়ে যান।

তারাপীঠে ক্ষ্যাপাবাবার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন চটক বাবাজী ও হরে গোঁসাই। ক্ষ্যাপাবাবার শরীর চলে যাবার পর তাঁরা বাবাকে সূক্ষ্মভাবে দর্শন করেন। গোঁসাই খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। শোনা যায়, গোঁসাই একসময় মা তারার জ্যোতি দর্শন করেন।

বামাক্ষ্যাপা তখন স্বমহিমায় বিরাজ করছেন তারাপীঠে। সেসময় অনেক সাধকের আবির্ভাব হয় সেখানে। এদেরই একজন হলেন, পঞ্চানন মিশ্র। তিনি ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের বাসিন্দা। সব সময় মগ্ন থাকতেন তারামায়ের জপধ্যানে। অন্যদিকে তিনি ভজনা করতেন গোবিন্দেরও। পরবর্তীসময়ে তিনি ফিরে যান মিথিলাতে। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

বামাক্ষ্যাপার পরে তারাপীঠের উচ্চমানের সাধক হিসাবে প্রমথনাথ চক্রবর্তীর নাম শোনা গেছে। ১৩১৪ সালে তিনি তারাপীঠে আসেন। তাঁকে সবাই চক্রবর্তীবাবা বলে ডাকতেন। তারাপীঠের মহাশ্মশানে একটি উঁচু মাচানের ওপর তৈরি কুটীরে তিনি সাধনভজনে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। একসময় তিনি ক্ষ্যাপাবাবাকে পুরোপুরি ভুল বোঝেন। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভাঙে। কিন্তু কখনও বলতেন না, আমি ঈশ্বরের প্রতিভূ ইত্যাদি। সবসময় বলতেন, তারামাকে ডাকো, তিনিই তোমায় কৃপা করবেন। অথচ তাঁর আশীর্বাদে অনেকে কঠিন রোগের হাত থেকে রক্ষা পান। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, তিনি জনৈক ডেভিড আর্থার সাহেবের ছেলেকে মারণ ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত যক্ষ্মারোগ থেকে মুক্ত করেন।

চক্রবর্তীবাবা তারাপীঠে থাকার সময় সেখানে আসেন সাধক নাপিত গোঁসাই। তাঁর আদিবাড়ি ছিল সাঁইথিয়ার কাছে দেবপুর গ্রামে। তিনি বেশ কিছুদিন সংসারজীবনে আবদ্ধ ছিলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, কন্যা ছিল। তারাপীঠের লাগোয়া শ্মশান হল মুণ্ডমালিনীতলা। অনেকের মতে, দ্বিতীয় জায়গাটি হল তারাপীঠ মহাশ্মশানেরই অংশ। নাপিত গোঁসাই সেখানে সাধনভজনে মেতে থাকতেন।

মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মহাসাধিকা আনন্দময়ী মা তারাপীঠে আসেন। এক ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপটে তিনি সেখানে আসার প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর স্বামী রমণীমোহন চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তারাপীঠে থাকার সময় আনন্দময়ী মা নিজে রান্না করে স্থানীয় মহিলাদের রান্না করে খাওয়ান। আনন্দময়ী মা'র আশ্রম মারফৎ মায়ের সম্পর্কে কিছু বিচিত্র ঘটনার কথা জানা গেছে। সেখানে থাকার সময় মা আনন্দময়ী মেয়েদের উপবীত দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সেখানে আশ্রম ও বাণলিঙ্গ শিব স্থাপন করেন।

তারাপীঠে এসে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ অন্যান্য সাধক-সাধিকারা হলেন, ব্রহ্মাণী জটামা, পূর্ণানন্দ স্বামী, সারদাচরণ শাস্ত্রী, যতীমোহন পাণ্ডা, সারদাচরণ সাহা, শ্রীকৃষ্ণ সাধু, নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার বাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, যোগেশ পাণ্ডা, ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ, নগেন্দ্রনাথ বাগচী, যোগমায়া ভৈরবী, সত্যানন্দ গিরি, মিহির কিরণ ভট্টাচার্য, হরিহর বাবা, স্বামী হরানন্দ, ভোগলা বাবা, বশিষ্ঠানন্দ স্বামী, ব্রহ্মচরণ শুদ্ধানন্দ, ব্রহ্মচারণ সর্বানন্দ, হীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বিজয় অঘোরী, রামদাস মিশ্র, কুকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ল্যাংটা বাবা, শ্রীশ্রী রামঠাকুর, সত্যানন্দ মহারাজ, ভোলানন্দ গিরি প্রমুখ।

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলা হয়েছে,

'ব্রহ্ম রন্ধ্রং হিঙ্গুলায়ং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহাদেব ত্রিগুণা যা দিগম্বরী।।

অর্থাৎ প্রাচীন হিঙ্গুলায় পড়েছিল দেবীর ব্রহ্মরন্ধ্র। পাকিস্তানের মানুষ দেবীর স্থানকে বলেন, 'নানী কি হজ'। পাকিস্তানের করাচী থেকে ৯০ মাইল উত্তরে বালুচিস্তানে দেবী মার সেখানকার মুসলমান মানুষজন বলেন, 'নানী বিবি'। কাছেই রয়েছে অঘোর নদী। সমতল থেকে প্রায় চারহাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের গুহায় দেবী অংশের অবস্থান। পীঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম। পাহাড়ে দেবীর ব্রহ্ম রন্ধ্র পড়েছে বলে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে বলা আছে, তাকে দুটি ভাগে ভাগ করে তার বুক চিরে বয়ে গেছে হিঙ্গুলা নদী।

এক সময় হিংলাজ তীর্থে যাবার জন্য তীর্থযাত্রীদের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হত। ছড়িদারদের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুদিন মরুভূমির পথ পার হয়ে যাত্রীরা পৌঁছতেন চন্দ্রনাথে। সেখান থেকে দৈবাদেশ পেলে তারপর যাত্রা করতেন হিংলাজের উদ্দেশ্যে। অতীতে তীর্থযাত্রীরা হিংলাজের উদ্দেশ্যে রওনা না হবার আগে জমা হতেন নাগনাথের আখড়ায়। বহু প্রাচীন এই আখড়া থেকে মূলত যাত্রা শুরু করা হত পথের নদীর জল শুকনো থাকার সময়ে। তা না হলে কোনও কোনও সময় নদীর জল বেড়ে গিয়ে. না খেতে পেয়ে তীর্থযাত্রীদের মৃত্যু হয়েছে। তখন কেউ হিংলাজতীর্থের উদ্দেশ্যে রওনা না হলে ধরে নেওয়া হত তিনি আর ঘরে ফিরে আসবেন না। মরুভূমি দিয়ে চলার একমাত্র যান হল উট। তথ্যের মাধ্যমে জানা গেছে, ভাগ্য মোটামুটি সুপ্রসন্ন থাকলে যাত্রীরা ষোল থেকে বত্রিশ দিনের মধ্যে পৌঁছে যেতেন হিংলাজ মায়ের কাছে। খাবার হিসাবে সঙ্গে নেওয়া হত আটা, নুন, গুড় ও মরিচ।

পথে চলার সময় ছড়িদারদের হাতে থাকত অনেকটা ত্রিশূলের মত দেখতে গাছের ডাল। এর গায়ে লাগানো থাকত সিঁদুর ও জড়ানো থাকত বিচিত্র বর্ণের কাপড়। যেখানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করতেন সর্বপ্রথম সেটি বালির ওপর পুঁতে তার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হত। এক ছিলিম গাঁজা।

করাচী ছাড়ানোর পর পড়ে হাব নদী। সেখানে পৌঁছে প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে রুমালের মাপে একটি নতুন কাপড় গেরুয়া রঙে ছাপিয়ে হাতে দেওয়া হত। সেটি হাতে নিয়ে প্রত্যেককে সন্ন্যাসব্রত নেওয়া ও কাউকে হিংসা না করার শপথ নিতে হত। আরও শপথ নিতে হত, প্রত্যেকে প্রত্যেকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নিজের

কুঁজোর জল অপরকে দেবে না। এর কারণ হল, নিজের কুঁজোর জল অপরকে দিলে দুটো জীবনই নষ্ট হতে পারে। এমনকি স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, মা তার সন্তান বা সন্তান তার মাকেও জলের ভাগ দেবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই পীঠকে 'প্রথম পীঠ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? ব্রহ্ম রন্ধ্র হল দেহ তথা সৃষ্টির উৎস। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় শব্দ। বিজ্ঞজনের মতে, মানুষের ব্রহ্ম রন্ধ্রে যে শক্তির সৃষ্টি হয় হিংলাজ মা তারই প্রতীক।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদদের মতে, দেবী হিংলাজ আসলে কোনও হিন্দু দেবী নন। তিনি সুমেরীয় ইন্নিনী এবং প্যালেস্টাইনের দেবী 'নিনা'। বেদজ্ঞদের মতে, তিনি রণদেবী ইন্দ্রাণী। মধ্যপ্রাচ্যের দেবতা বাল্-এর প্রকৃতি হলেন বালিৎ বা শাইবোল। বিবর্তনের সুবাদে সেই নামের অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়ায় বালুচিতে। মনে করা হয়, এই থেকে ওই জায়গার নাম হয় বালুচিস্তান যা শচী বা বালুচির জায়গা। সেই জন্য অনেক ধর্মগবেষক মনে করেন, বালুচিস্তান তথা হিংলাজ মায়ের অবস্থান হাজার হাজার বছরের। কোনও কোনও মতে, হিংলাজ মাতাই শেষ সতীপীঠ। আর যে সব পীঠকে সতীপীঠ বলা হয় সবই পরবর্তীসময়ে মানুষ তৈরি করেছে অথবা বসতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পীঠাসন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

অতীতে হিংলাজের পথে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাবার সময় যাত্রী, ছড়িদার, উটওয়ালা, তথা জলবাহকেরা নিজেদের মধ্যে একটি নিয়ম তৈরি করত। সেই প্রথা হল, প্রত্যেকদিন প্রত্যেক যাত্রী একটি করে রুটি উটাওয়ালা এবং জলওয়ালাকে দেবে। পথ চলতে চলতে যেখানে পানীয় জলের কূপের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানে যে কূপওয়ালা সেটির পাহারায় থাকে সেও যাত্রীদের কাছে থেকে একটি করে রুটি পাবে। এ তথ্যের স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন কালিকানন্দ অবধূত তাঁর লেখা 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বইতে।

পথেই পড়বে শোনবেণী ও রিয়াসত। দূরদূরান্তের মরুভূমি থেকে অনেকেই এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এখানকার বাড়িগুলির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। সবগুলির মুখ পূবদিকে। আজও এই যাত্রাপথে কাউকে দেখলে পুণ্যার্থীরা একটি থালায় ছোবড়াসুদ্ধ নারকেল, হলুদে ছোপানো সুতোর গুচ্ছ, কিছু শুকনো মিছরি যাত্রীদের হাতে মায়ের পুজো দেবার জন্য তুলে দেন। আর একই সঙ্গে গাওয়া হয় হিংলাজ মায়ের গান। তবে যেহেতু এখন আর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয় না, তাই যাত্রার ধরনে ব্যপক পরিবর্তন আসায় যাত্রীদের ভাবনাতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

হিংলাজ মায়ের কাছে যাবার আগে চন্দ্রকূপ বাবার কাছে যেতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান থেকে আদেশ পেলে তবেই হিংলাজ মায়ের কাছে ,যাওয়া যায়। তারও আগে পৌঁছাতে হয় গুরুশিষ্য পাহাড়ে। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস জনৈক গুরু এবং তাঁর শিষ্য কালো পাথরে পরিণত হয়ে যুগ যুগ ধরে এখানে অবস্থান করছেন। লম্বায় প্রায় তিন হাত, চওড়ায় দেড় হাত, উচ্চতায় হাত দুয়েক। দু'টি মানুষের দেহ পাথরে

পরিণত হয়ে এখানে রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই দু'টি পাথরকে ঘিরে গল্পকথা প্রচলিত আছে ওই চত্বরে।

এক সময় জনৈক গুরু ও শিষ্য গিয়েছিলেন হিংলাজ মায়ের দর্শনে। জল ছিল দু'জনের কাছেই। গুরু কিন্তু বারবার শিষ্যের কাছে থেকে জল চেয়ে খাচ্ছিলেন। গুরুর আদেশ শিষ্য অমান্য করতে পারেননি। এক সময় শিষ্যের রাখা শেষ জলটুকুও গুরু খেয়ে নেন। এরপর জলের অভাবে শিষ্য বালির ওপর পড়ে গিয়ে মারা যান। শিষ্যের ওই পরিণতি দেখে গুরুদেব ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন, একসময় যখন তার জলও ফুরিয়ে যাবে তখন কি হবে? হঠাৎ ঘটে গেল এক অস্বাভাবিক কাণ্ড। তার জলের পাত্রটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল ও মুহূর্তের মধ্যে মরুভূমি সব জলটুকু শুষে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকেও চিরবিদায় নিতে হয় এই পৃথিবী থেকে।

আসলে এই ধরনের কাহিনীর প্রচলন করার অন্য উদ্দেশ্য আছে। তা হল, তীর্থযাত্রীদের সতর্ক করে দেওয়া। তবে এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সরাসরি গাড়ীতে করে চলে যাওয়া যায় মায়ের মন্দিরের কাছে।

যারা অতীতে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হিংলাজ তীর্থে যেতেন তাদের প্রত্যক্ষ করতে হত নানান ধরনের দৃশ্য। মাইলের পর মাইল ধূ ধূ করছে। তারই মাঝে এক একটা জলের কূপ পরিষ্কার রেখে কিছু পরিবার দিন গুজরান করে থাকে। অন্যান্য জায়গার মতো মরুভূমি অঞ্চলেও ভূতের কাহিনী শোনা যায়। উটকে কেন্দ্র করেই সাধারণত এই ধরনের গল্পকথা আবর্তিত হয়। অনেকের ধারণা, চলার পথে উটের পিঠের ওপর পাতা খাটিয়ায় যদি কোনও মানুষ বসে না থাকে তাহলে সেখানে ভূতেরা চেপে বসে। এই সব ভূতেরা নাকি খুবই নিষ্ঠুর হয়। সুযোগ পেলেই তারা উটকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়ে দিকভ্রান্ত করে দেয়।

চন্দ্রকূপের অবস্থান সমুদ্রের থেকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে। প্রচলিত বিশ্বাস, চন্দ্রকুপ সকলের সবধরনের পাপ হরণ করে নেন। সকলের পাপ তাঁর কূপে জমা হয়ে ধুনোর মাধ্যমে আকাশের দিকে উড়ে যায়। কতদিন ধরে এই ধুনি জ্বলছে তা কেউ জানে না। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের মধ্যে পাপ যতদিন থাকবে ততদিন এই কূপেরও অস্তিত্ব থাকবে। ধর্মভীরুদের বিশ্বাস, যেখান থেকে প্রথম চন্দ্রকূপ স্বামীর দর্শন পাওয়া যাবে, সেখান থেকে দণ্ডি খেটে কূপের কাছে পৌছাতে হবে।

পুরাণে চন্দ্রকূপ স্বামীর বিষয়ে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে, সেখানে পৌছানোর পর বাবা, মা, ঠাকুরদাদার নাম বলে হিংলাজ যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। একই সঙ্গে তিনি যদি তার পাপ স্বীকার না করেন তা হলে ছাড়পত্র পাওয়া সম্ভব নয়। মূলত যদি কেউ জীবনে নারীহত্যা বা ভ্রূণহত্যার মতো পাপ করে থাকেন তাহলে তা স্বীকার করতেই হবে কূপের সামনে। চন্দ্রকূপ স্বামীর,হিংলাজ দর্শনের অনুমতির প্রদানের পদ্ধতিও বড় বিচিত্র ধরনের।

যাত্রীদের পুজো দেবার জন্য নিয়ে যেতে হয় দুটি করে নারকেল, ছোট একটি গাঁজা ভরা কল্কে। অনুমতি না পাওয়া গেলে যদি কেউ নারকেল আর গাঁজা ভর্তি কল্কে কূপের মধ্যে ফেলেন তাহলে তা পড়ে থাকবে কাদার মধ্যে। অন্যথায় তলিয়ে যাবে কূপের কাদায়। অনেক যাত্রী নারকেল আর গাঁজাভর্তি কল্কে ছাড়াও কূপের ধারে রান্না করা ভোগ নিবেদন করেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। শাস্ত্রানুযায়ী, মাটিতে রেখে ভোগ মাখা যাবে না। মাটি স্পর্শ করলেই তা এঁটো হয়ে যায়।

চন্দ্রকুপ বাবার অনুমতি নিয়ে আবার পথচলার শুরু হয়। এক সময় পার হতে হয় অঘোর নদী। সেটি পার হয়ে সামনে যে পাহাড় পড়বে সেখানেই হিংলাজ মায়ের গুহা। কথিত আছে, রাবণের মতো ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা ব্রাহ্মণকে হত্যা করার জন্য ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছিল স্বয়ং রামচন্দ্রের। হিংলাজ মাকে দর্শন করার পর তিনি সেই পাপ থেকে মুক্ত হন।

বর্তমানে করাচী থেকে বাসে করে বেলুচিস্তানের শহর বিস্‌দরে যেতে হয়। একসময় যেখানে ছিল শুধুই মরুভূমি। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে দোকানপাট, ঘরবাড়ি। যে পাহাড়ে হিংলাজ মা অবস্থান করছেন সেখানকার অনেকটাই দুর্গের মতো। এখানে নদীর ধারে কয়েকটি ডাঁটাগাছ আছে। সকলে সেই ডাঁটা দুটি করে ভেঙে আনে। একটি দিয়ে দাঁতন করে অন্যটি পুঁতে দেয় সেখানেই। তীর্থযাত্রীদের এটি একটি অবশ্য পালনীয় কাজ।

বাস থেকে যেখানে নামতে হয় তার পাশেই এখন তৈরি হয়েছে সুন্দর লজ। তীর্থযাত্রীদের অন্যান্য কর্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে মন্ত্রপড়া, পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা ইত্যাদি। হিংলাজের মোহন্তদের ঘিরে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। মাত্র আটাশ বছর বয়সে নাথ সম্প্রদায়ের জনৈক সন্ন্যাসী হিংলাজ মাকে দর্শন করতে এসে সেখানেই থেকে যান। নদীর তীরেই তিনি বাস করতেন। প্রায় মাস ছয়েক পড়ে একদল তীর্থযাত্রী সেখানে এসে দেখতে পান এক কঙ্কালসার মানুষকে। তার সেই অবস্থানের বিষয়ে জানতে পেরে যাত্রীরা সবচেয়ে আগে পুজো করেন তাঁকে। সেই থেকে সব তীর্থযাত্রী মোহন্ত মহারাজকে সবচেয়ে আগে পুজো দেন। জীবনের নিয়মে এক মোহন্ত মহারাজের জায়গায় আর এক মোহন্ত আসেন। স্থানীয় মানুষ তাঁদের 'কোট্রী পীর' বলে ডাকেন আর ছড়িদারেরা বলেন, 'অঘোরী বাবা'। স্থানীয় মানুষ এবং তীর্থযাত্রীদের তাঁদের প্রতি থাকে অবিচল ভক্তি। দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর প্রতিটি কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন।

কিছুদিন আগে তৈরি গেস্টহাউস থেকে আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ দিয়ে গেলে দেখা যাবে মায়ের গুহার মধ্যে কালী মূর্তি আছে। কাউকে বলে দিতে হয় না কোনটি হিংলাজ মায়ের গুহা। তার সামনে রয়েছে একটি জলাধার। হাঁটুজলে স্নান করেন সবাই।

দশ বারোটি সিঁড়ি ভেঙে মায়ের বেদীর কাছে পৌঁছানো যায়। বৃত্তের মতো বেদী। অনেক উঁচুতে ছাদ।বেদীর উপর দু'টি গোলাকৃতি সিঁদুর মাখানো শিলা জরির কাপড় দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। পুরোহিতের মতে, সেগুলি হল, মা, বেটি অর্থাৎ হিংলাজ মা ও

তার মেয়ে। এই বৃত্তাকার বেদীর ভিতরে ঢোকা যায়। দুপাশে দু'টি দরজা আছে। ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। ভিতরে ঘন অন্ধকার। ওই গুহার মধ্যেই হিংলাজ দর্শন হয়।

অতীতে বেদীর ওপর কোনও মূর্তি ছিল না। একটি প্রদীপ জ্বলত সেখানে। লাল সালুতে বেদী মোড়া থাকত। পাকিস্তান হবার আগে পর্যন্ত মুসলমানেরা নদী পার হয়ে কোনও পীঠস্থানে যেতেন না। সূফী সাধকেরা হিন্দু যাত্রীদের মারফৎ নানীর উদ্দেশ্যে মেওয়া, মোমবাতি পাঠিয়ে দিতেন। সামনে ত্রিশূল পোঁতা আছে। তার পিছনেই রয়েছে বেদী। শোনা যায়, অনেক সাধক সেখানে মায়ের জ্যোতিরূপ দর্শন করেছেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবে যাঁরা ভাগ্যবান তাদের কথা আলাদা। বেদীর ওপর রাখা মালা যাত্রীদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস, যতদিন এই মালা গলায় থাকবে ততদিন তার কোনও ক্ষতি হবে না।

আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে। মা'কে দর্শন করার পরে পরনের কাপড় ছেড়ে আসতে হয় সেখানেই। নতুন কাপড় পরে যেতে হয় মাকে দর্শন করতে। এক বিচিত্র ঘটনা সেখানে চোখে পড়ে। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দেখা যায় একটি খুব বড়মাপের পাথর বেরিয়ে আছে পাথরের গা থেকে। সেই পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে সূর্য ও চন্দ্র। জনশ্রুতি হল, স্বয়ং রামচন্দ্র এখানে পুজো দিতে আসার সময় সূর্য-চন্দ্র এঁকে তাঁর আসার চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন।

হিংলাজ দর্শন হয়ে গেলে আকাশ গঙ্গা দর্শন করতে হয়। পাহাড়ের মাথায় তার অবস্থান। এও এক পূণ্যতীর্থ। এখানে একধরনের গাছ আছে যা চোখের অসুখের ক্ষেতের মহৌষধি হিসাবে পরিচিত। অন্য আর একটি মতে, আকাশ গঙ্গার জল দিয়ে ভালভাবে চোখ ধুলে অনেকে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। পৌঁছাতে সময় লাগে দু-আড়াই ঘন্টা।

এখন হিংলাজ মা'কে দর্শন করার জন হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। মুসলমানেরা হজের সময় এখানে আসেন হজ করতে। ধর্ম সমন্বয়ের মহাপীঠ হিসাবে হিংলাজ তাই সব ধর্মের মানুষজনের কাছে ক্রমশ দুর্নিবার আকর্ষণে পরিণত হচ্ছে।

করবীরপুরে দেবীর ত্রিনেত্র

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন,

শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণভৈরব (বৈভব)
মহিষ মর্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব।।

করবীরপুরকে বলা হয় দ্বিতীয় পীঠ। এ সম্পর্কে পীঠ নির্ণয়ে বলা হয়েছে,

করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দিনী।
ক্রোধী শে ভৈরব স্তত্র.............

এখানে দেবী মহিষমর্দিনী এবং ভৈরব হলেন ক্রোধীশ। বেলপাতার তিনটি সুন্দর পাত্রের মতো দেবীর তিনটি নেত্র। তন্ত্রচূড়ামণিতে করবীর পীঠের উল্লেখপর্বে যেভাবে বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী এই মহাপীঠ সিন্ধু প্রদেশের শর্করার, বর্তমানের সুক্কুচ্চরে অবস্থিত। তবে এর অবস্থান নিয়ে অনেক দ্বিমত আছে। কালিকাপুরাণ মতে, করবীর পুর ছিল প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত দেশের রাজধানী। দৃষদ্বতী নদীর তীরে। কোনও কোনও গবেষকের মতে, এই পীঠগুলির অবস্থান হল মুম্বাইয়ের কাছে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে। কাছেই রয়েছে পঞ্চনদীর সঙ্গম এবং এই মন্দিরটি পঞ্চসাগর মন্দির নামে পরিচিত। তবে এ সম্পর্কে আরও একটি মতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, এটি একটি পৃথক পীঠ, কোলহাপুরে দেবীর ত্রিনেত্র পড়ে নি। তাঁরা বলেছেন, বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুর বা শক্করই প্রাচীনকালের শর্করার বা করবীরপুর। এখানকার কাবেরী মৌজার করবীরে শক্তিপীঠ রয়েছে এবং সেখানে দশভূজা দুর্গার মূর্তি আছে। দুঃখের বিষয়, এখানকার ভৈরবের বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

পাকিস্তানের করাচী থেকে ট্রেনে সুক্কুরে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে রিক্সা, গাড়ি বা বাসে করেও মহাপীঠে যাওয়া যেতে পারে।



খুলনায় নারায়ণী

পীঠ নির্ণয়তন্ত্র অনুযায়ী শুচিদেশের স্থান হল এয়োত্রিংশৎ। তন্ত্রে বলা হয়েছে, সাহারাখ্যো উধর্বদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ। সেখানে দেবীর উপরের পাটির দাঁত পড়েছে। ভারতচন্দ্র বলেছেন,

উধর্ব দন্তগীতির অনলে হইল স্থান
সংক্রুর ভৈরব, দেবী নারায়নী নাম।।

এখানে দেবীকে সম্বোধন করা হয় নারায়ণী নামে। কবি ভারতচন্দ্রের মতে, ভৈরবের নাম সংক্রুর। তবে স্থানীয় অনেকে ভৈরবকে ডাকেন, সংহার নামে। পীঠস্থানের নাম অনল। কিন্তু এই নামের কোনও অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই জায়গাকে শুচিদেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সমস্যা হচ্ছে, ভাগবত বা কুব্জিকা তন্ত্রে শুচিদেশ বা অনলের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তন্ত্রচূড়ামণিতন্ত্রে শুচিপীঠকে তেত্রিশতম পীঠ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, আহমেদাতাদের নল হ্রদকে অনল নামে চিহ্নিত করেছেন। অমিয়কুমার মজুমদার তাঁর সতীপীঠ পরিক্রমা বইতে উল্লেখ করেছেন, পঞ্জিকাকারদের অনুসারে এই জায়গাটির অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশে। তাঁর মতে, শুচিদেশের বাঁ দিকে আছে যমুনা নদী, ডান দিকে মেঘনা। সেই সূত্র অনুসারে, শুচিদেশের অবস্থান হল, বাংলাদেশের খুলনা জেলার ঈশ্বরীপুরের কাছে। তবে এ নিয়ে দ্বিমতের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এর কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।

লাভপুরে ফুল্লরা তীর্থে

তন্দ্রচূড়ামণিতে একান্নটি পীঠের মধ্যে বীরভূমের লাভপুরকে উনপঞ্চাশতম উপপীঠ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শিবচরিতে অবশ্য ফুল্লরাকে উপপীঠ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু শিবসংহিতা অনুসারে লাভপুরের ফুল্লরাতীর্থে মহাপীঠের সব লক্ষণই বর্তমান।

বলা হয়েছে,

অট্টহাসে চোটপাতা দেবী মা ফুল্লরা স্মৃতা
বিশ্বেশো ভৈরবস্তত্রর সর্বাভিষ্ট প্রদায়ক।

দেবীর ওষ্ঠ বা ওষ্ঠাংশ পড়েছে এখানে। দেবীর নাম ফুল্লরা এবং ভৈরব হলেন বিশ্বেশ। পীঠস্থান হিসাবে অট্টহাসের উল্লেখ আছে। কারও কারও মতে, বর্ধমানের কাছে কেতুগ্রামে রয়েছে অট্টহাস। তবে যে সব লক্ষণ থাকলে কোনও জায়গাকে মহাপীঠ বলা হয়, সেই সবকিছুরই লক্ষণ রয়েছে বীরভূম জেলার লাভপুরে ফুল্লরা মায়ের থানে। মন্দিরের সামনে আছে একটি বড় জলাশয়। তাকে চিহ্নিত করা হয়, রামায়ণের দেবীদহের সঙ্গে, যেখান থেকে অকালবোধনের সময় নীলপদ্ম সংগ্রহ করা হয়েছিল। কাছেই রয়েছে মহাশ্মশান। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রয়েছেন বিশ্বেশ্বর ভৈরব।

কৃষ্ণানন্দ গিরি মতান্তরে কৃষ্ণ ও দয়াল গিরি একদা ঈশ্বরসাধনায় মগ্ন থাকতেন কাশীর মনিকর্ণিকা ঘাটে। সেখানে তিনি মাঘী পূর্ণিমার দিন স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন লাভপুরে গিয়ে ফুল্লরা মা'কে দুর্গা রূপে পুজো করার জন্য। তখন যাতায়াতের রাস্তা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি তাঁর অভীষ্ট জায়গায় এসে পৌছান এবং দুর্গাষ্টমীর দিন মায়ের দর্শন পান। আজও ফুল্লরা মায়ের মন্দিরে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে ছাগবলি হয়। স্থানীয় অধিবাসী ও পুরোহিতদের মাধ্যমে জানা গেছে, মায়ের মন্দিরের সামনের পুকুরে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে একটা আওয়াজের সূত্র ধরে ছাগবলি দেওয়া হতো। এখন আর সেই শব্দ শোনা যায় না। তবে কারও কারও বিশ্বাস, আজও দুর্গাপুজোর সন্ধিক্ষণে সেই আওয়াজ হয়।

ফুল্লরা মা'কে কেন্দ্র করে শোনা যায় অনেক অলৌকিক কাহিনী। যেদিন একলক্ষ ছাগ বলি সম্পন্ন হয় সেদিন কবন্ধকে যখন মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হচ্ছিল তখন সে 'মা' 'মা' বলে ডেকে ওঠে। ঘটনাটি ঘটে প্রায় চার পুরুষ আগে। সেই বলির খাঁড়া আজও সযত্নে রাখা আছে পুরোহিতদের বাড়িতে।

দেবী এখানে পূজিতা হন সাক্ষাৎ জয়দুর্গারূপে, চর্তুর্ভুজা সিংহবাহিনীর কল্পনায়। কথিত আছে, দেবীতো বটেই, যে কোনও মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন 'বিশ্বেশ' শিব। মাঘিপূর্ণিমার দিন এখানে কৃষ্ণানন্দ গিরি'র মায়ের দর্শনের স্মরণে বারোদিন ব্যাপী উৎসব হয়।

বেশ কিছুদিন আগেও এখানে শিবাভোগের ব্যবস্থা ছিল। তখন এখানকার জঙ্গলে

রূপী, সুপী নামে দুটি শিয়াল বাস করত। এছাড়াও থাকত অন্যান্য জীবজন্তু যাদের ভোগনিবেদনের পরে মাকে ভোগ দেওয়া হত।

মন্দির চত্বরের মধ্যেই রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এর প্রতিষ্ঠা করেন সাধক নারায়ণ গিরি। কেউ কেউ এখানে তন্ত্র-সাধনার প্রক্রিয়া না জেনে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়নি।

শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব - সব ভাবনা এখানে এক হয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব তন্ত্রের সাধক রঘুবর গোস্বামী এখানে দীর্ঘদিন মায়ের সাধনা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর মৃত্যুর দিন ও সময় ঘোষণা করেছিলেন। পূর্বনির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে মায়ের নাম জপ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মন্দির প্রাঙ্গণের এক কোণায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা রয়েছে মোহন্তদের অধিকারে। আজও তাদের দায়িত্বে রয়েছে দেবীর যাবতীয় পূজার্চনা। এখান যারা এই দায়িত্ব পালন করছেন প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী তারা উনত্রিশ পুরুষ। পথিকৃতের নাম কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী।

এই মোহন্তদের আনা হয়েছিল বিহারের দ্বারভাঙ্গা থেকে। জন্মসূত্রে তাঁরা মৈথিলি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। পদবী 'মিশ্র'। কিন্তু পরবর্তীসময়ে তাদের 'উকিল' পদবী দেওয়া হয়। নবাবের কাছে থেকে পাওয়া এই পদবীর গূঢ় অর্থ আছে। পুরোহিতদের কাজ হল, ভক্তদের প্রার্থনা মায়ের আদালতে যথাযথভাবে পৌঁছে দেবার জন্য ওকালতি করা। সেই সুবাদেই এই পদবীর সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যায়, স্থানীয় নবাব নিঃসন্তান ছিলেন। দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে মৈথিলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের এখানে নিয়ে এসে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। দেবীর ইচ্ছাপুরণ করার পর নবাব সন্তানলাভ করেন।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। শ্রীরামজী গোঁসাই নামে জনৈক মহাসাধক এখানে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। সন্তান হচ্ছে না দেখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা তাঁর শরণাপন্ন হন। ভক্তের আর্জি শুনে তিনি কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন। তারপর বলেন, দুর্গাপুজোর পরের চতুর্দশীর দিন তারামায়ের কাছে পুজো দিয়ে দেবী ফুল্লরার কাছে প্রার্থনা করলে সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে। তিনি সেই মহাসাধকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং সন্তানের নাম রাখেন তারাশঙ্কর।

মন্দিরের দায়িত্বে থাকা মোহন্তদের পূর্বপুরুষ জনৈক মহাপুরুষ দেবী ফুল্লরাকে মা কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরে স্থানীয় অঞ্চলে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা পাইফলা কালীমন্দির নামে সুপরিচিত। এখান থেকেই ওই মন্দিরে মা কালীর ভোগ যায়।

প্রতিদিন এখানে অন্নভোগ হয়। ভাত, ডাল, তরকারী, মাছের টক অবশ্যই থাকে সেই অন্নভোগে। একসময় মায়ের বিপুল দেবোত্তর সম্পত্তির মাধ্যমে বছরের বাহান্ন সপ্তাহে

বাহান্ন মন চাল আসত। কিন্তু কালের নিয়মে তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন সরকার থেকে মন্দিরের জন্য দেওয়া হয় মাত্র ৯৬০ টাকা।

দেবীমা'র মন্দিরের সামনে রাখা হাঁড়িকাঠের মাটি চর্মরোগের অব্যর্থ ওষুধ — এধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। পুরোহিত প্রণবকুমার উকিল জাগলেন, তাঁর হাতে একটি ছোট 'টিউমার' হয়েছিল। কয়েকদিন ভক্তিভরে ওই মাটি লাগানোর পরে আজ আর তার কোনও চিহ্ন নেই। অনেকের বিশ্বাস, শ্বেতীর উপসমে এই মাটি খুবই কার্যকরী। হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে সবধর্মের মানুষই ফুল্লরা মায়ের কাছে এসে তাদের আর্জি জানান এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দে স্থানীয় জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির প্রাঙ্গণের থাকার ঘর আছে। ভাড়া ২০ টাকা। তবে বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হয়।

বোলপুর ও সাঁইথিয়া রেল স্টেশন থেকে লাভপুরে যাওয়া যায়। এছাড়া আহমেদপুর স্টেশন থেকে ছোট লাইনে আহমেদপুর—কাটোয়া রেলপথেও লাভপুরে যাওয়া যায়।

চৈতন্যপীঠ কঙ্কালীতলা

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। কি জানি কেন বাড়ি থেকে কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিলাম বোলপুরে। তার কিছুদিন আগে কঙ্কালীতলার নাম শুনেছিলাম আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষকের কাছে। শান্তিনিকেতনের কয়েকটি বিশিষ্টজায়গা দেখে ঠিক করলাম, কঙ্কালীতলায় যাব। তখন আজকের মতো কঙ্কালীতলায় বাসের যাতায়াত ছিল না। সারাদিনে দুটি কি তিনটি। তাই ঠিক করলাম, সরাসরি রিক্সায় করে গ্রামের পথঘাট দেখতে দেখতে চলে যাব কঙ্কালীতলায়। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। দু-একটি ছোট ছোট চালাঘর। মন্দির চত্বরে রয়েছে রুদ্র ভৈরবের মন্দির। শুনলাম, সন্ধ্যার আগেই সবাই ফিরে যান যে যার বাড়িতে। এখানে রাত্রিবাস কেউ করেন না। পাশেই রয়েছে মহাশ্মশান। এখানে একইসঙ্গে শবদাহ ও সমাধি দেওয়া হয়। জনৈক স্থানীয় অধিবাসীর কাছে শুনেছিলাম, বৈষ্ণবেরা এখানে শবদেহ দাহ না করে সমাধি দিয়ে দেন। কেন জানি না, প্রথমবার সেখানে গিয়েই মনে হয়েছিল এটা আমার খুব চেনা জায়গা। এর আগে হয়ত কোনওদিন এখানে আমি এসেছি।

এর কিছুদিন পরে ভবঘুরে মনটা আবার নড়ে চড়ে বসল। বেরিয়ে পড়লাম আমার এক অগ্রজ সহকর্মীর সঙ্গে। কোথায় যাব কোনও ঠিক নেই। চলে গেলাম দুমকায়। হাতমুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি কোথায় যাওয়ার মতো কোনও জায়গা আছে কি না? শুনলাম, সেখান থেকে রিক্সায় করে বেশ কিছুটা দূরে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে এক আশ্রমের, যেখানে নাকি থাকেন জনৈকা গৃহী অথচ সন্ন্যাসিনী ও তাঁর দু'একজন অনুগামী। ম্যাসানজোড় পাহাড়ের কোলেই সেই আশ্রমে রিক্সা করে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল এক ঘণ্টা।

সেখানেই আমার দেখা ও পরিচয় হয় সতী মা'র সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী বললেও কম বলা হবে। সন্ন্যাসিনী অথচ টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছেন আর পাঁচজন বাঙালি মায়েদের মতো। তখনও তেমন কোনও ধারণা ছিল না কঙ্কালীতলার সম্বন্ধে। সেদিনটা রাত্রিবাস করার সুযোগ হয়েছিল মায়ের আশ্রমে। পরে জেনেছি, ব্যবহারিক জীবনে মায়ের নাম ছিল সতীদেবী। তাঁর স্বামী মহেশ্বর বর্মণ একসময় সিউড়ির সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। মহেশ্বরবাবু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলেও সতীমা জগদীশবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

রাতের খাবার গ্রহণ করার পর সতীমার কাছে শুনেছিলাম, কঙ্কালীতলা আশ্রমের এক বিস্ময়কর ঘটনা। কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলাম, ভূত শব্দটা বইতে লেখা থাকে। বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই।

আমার কথা শোনামাত্র পালটে গেল মায়ের মুখ। বললেন, না, ভূত আছে। কানে শোনা নয়, নিজের চোখে তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছি। তখন আমি কঙ্কালীতলায় জগদীশ বাবার আশ্রমে কঠোর সাধনায় মগ্ন। রাত কতো হবে জানি না। হয়ত বারোটা কি একটা। বাবা বললেন, যাও নদী (কোপাই নদী) থেকে জল নিয়ে এসো। যাঁরা কঙ্কালীতলা আশ্রমে গিয়েছেন, তাঁরা জানেন যেখানে বাবার আশ্রম সেখান থেকে কোপাই নদী কিছুটা দূরে। আর নদী থেকে জল আনতে হলে অনেকটা নিচে নামতে হয়। যাইহোক, বাবার আদেশ পাওয়ামাত্র কলসি নিয়ে যাত্রা করলাম নদীর দিকে। গুরুর আদেশ অতএব কোনওকিছু ভাবার প্রয়োজন নেই। অন্ধকার হলেও ওই পথ আমার চেনা। নদী থেকে জল তুলে নিয়ে আসছি আশ্রমের দিকে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার হাতের পাশে রোমশ দুটো মোটা হাত একই গতিতে চলেছে। ভাবলাম কোনও খারাপ লোক আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন বুঝতে পারলাম, কোনও অশরীরী আমার পিছু নিয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, যা হবার তাই হবে। জীবন যদি চলেও যায় তাতেও আমার কোনও আক্ষেপ থাকবে না। কারণ, গুরুর কাছে সাধনায় সিদ্ধ হবার জন্যই তো জীবনপণ করেছি। অতএব, যদি এই দেহ থেকে প্রাণ চলে যায়, যাক্। আশ্রমের প্রায় কাছে চলে এসেছি। দেখলাম, গুরুদেব তাঁর কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে কিছু বললেন। মুহূর্তের মধ্যে আমার হাতের পাশ থেকে সেই দু'টি রোমশ হাত উধাও হয়ে গেল। কঙ্কালীতলায় এধরনের অভিজ্ঞতা আমি ছাড়াও অন্য অনেকের হয়েছে বলেও পরবর্তী সময়ে শুনেছি।

তন্ত্র চূড়ামণিতে উল্লেখ আছে,

কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরব রুরু - নামকঃ।
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা।

এই তথ্যের সুবাদে জানা যায়, সতীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার কঙ্কাল পড়েছে কাঞ্চীদেশে। ভৈরবের নাম রুরু, দেবীর নাম রত্নাগর্ভী। শিবচরিত মতে এখানে দেবীর নাম দেবগর্ভা। দেবস্থানের পাশেই বয়ে চলেছে কোপাই নদী। মন্দিরের ডানপাশে রয়েছে কুণ্ড। সেই কুণ্ডের জলে নিমজ্জিত রয়েছে দেবীর কাঁকাল। শোনা যায়, রাজা রাজেন্দ্র চোল রণশূরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে কোপাই নদীর তীরে সাময়িকভাবে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। রাজা রাজেন্দ্র ছিলেন শিবভক্ত। তিনি সেখানে শিবস্থাপনা করেন। সেই থেকেই নাকি ওই মহাদেবকে 'কাঞ্চীশ্বর শিব' বলা হয়। কাছেই রয়েছে পঞ্চবটী, মহাশ্মশান। যে কুণ্ডে দেবী নিমজ্জিতা রয়েছেন, দু'টি উৎস বা প্রস্রবণ থেকে অবিরত জলস্রোত এসে সেখানে মিশছে। জলে কোনও দিন পোকা হয় না। এই জল খাবার পর শরীরের অনেক ব্যাধি সেরে যায়। এই জলপান করার পর অনেক মহিলা নাকি সন্তানসম্ভবা হয়েছেন বলে শোনা

গেছে।

কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকলি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম।।

একসময় কুণ্ডের চারদিকে খোলা বেদীতে দেবীর পুজো হত। অনেকে বলেন, ওই বেদীর তলায় ১০৮টি নরমুণ্ড পোঁতা আছে। সেখানে একটি মন্দির তৈরি করা হয় ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে মহা সাধক জগদীশবাবার নির্দেশে, তাঁর ভক্তশিষ্যদের দানে। ওই বছর ২৪ জ্যৈষ্ঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিন পৌরহিত্য করেন, আদিত্যপুর নিবাসী নলিনাক্ষ আচার্য।

এই মন্দির সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় গেজেটিয়ারে। সেখানে উল্লিখিত আছে,

Jaljol - A Village in Bolpur thana of the Suri subdivision containing the temple of Kankali. The latter is claimed as one of the 52 pithas of sacred places where a part of the dismembered body of Sati felt in this case, the waist (Kankal) hence the name.

বিজ্ঞজনের মতে, সতীর দেহের কঙ্কাল (কাঁকাল) যা কঙ্কালীতলায় কুণ্ডে নিমজ্জিত আছে বলে কথিত আছে, সেটি হল জীবের মূলাধার অর্থাৎ কূলকুণ্ডলিনী। একান্ন পীঠের শেষ পীঠ। বলা হয়, মহাদেব অচৈতন্য অবস্থায় সতীর দেহের অন্যান্য অংশ ও কাঁকাল বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেন। এরপর চৈতন্য হয় তাঁর। সেজন্য এই জায়গাকে বলা হয় চৈতন্যপীঠ। একসময় তিনি বুঝতে পারেন কী কাজ করেছেন!

বর্তমানে যাঁরা এই মন্দিরের পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের অনুমান প্রায় চারশ বছর ধরে বংশপরম্পরায় তাঁরাই এখানকার মন্দিরের পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন। যোগনাথ নামে জনৈক সাধুর নাম শোনা যায় যিনি অতীতে (গত চারশ বছর আগে) এই পীঠের অস্তিত্বের বিষয়ে উপলব্ধি করেন। তারপরে রামঠাকুর নামে আর এক সাধক বিষয়টি আরও ব্যাপক আকারে মানুষের সামনে নিয়ে আসেন। তার আগেও এখানে পুজো হয়েছে বলে শোনা যায়। রামঠাকুরকে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, আমি এখানে কাঁকালরূপে পড়ে আছি। তুমি পুজোর ব্যবস্থা করো। তিনি শুনতে পান একটি শব্দ 'কং'। 'কং' শব্দ হলো মহাকালীর বীজ মন্ত্র। সেই সূত্রেই তাঁর বংশের একজনের পরে আরেকজন এই পীঠে পুজো করে চলেছেন।

ডঃ হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন তাঁর 'বাঙ্গালীর কথা' বইতে উল্লেখ করেছেন, দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল রাজা মহীপালের রাঢ় বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং যেখানে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন সেখানেই শিবপূজা করেছিলেন। বীরভূমের

কঙ্কালীতলা কাঞ্চীপীঠ কঙ্কালীতে রাজেন্দ্র চোলের এরূপ একটি সেনা নিবাসভূমি (জয়স্কন্দাবার) ছিল। মনে হয়, তিরুমলয় লিপির প্রমাণ অনুসারে অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বঙ্গে বন্যার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় রাজেন্দ্রচোল নদীতীরের সেনানিবাস তুলে রাঢ় ত্যাগ করে ছিলেন; পিছনে রেখে গিয়েছিল স্বনামাঙ্কিত শিষ কাঞ্চীশ্বরকে।

১৯৬১ সালে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যান্ডবুক (বীরভূম) বইতে লেখা হয়েছে, বোলপুর থানার অন্তর্গত আম্রডহরা, জলজোল, ডানবারিপুর ও বেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি গ্রামে সতীত কঙ্কাল পতিত হইয়া পীঠস্থানে পরিণত হইবার কাহিনীর উল্লেখ আছে।

সমস্যা হচ্ছে, বীরভূম কোনদিনই 'কাঞ্চীদেশ' হিসাবে পরিচিত ছিল না। তামিলনাড়ু'র কাঞ্চীপুরম তথা কাঞ্চী ভরমাংকেই 'কাঞ্চী' নামে চিহ্নিত করা হয়। এটিও একান্নপীঠের অন্যতম প্রাচীন পীঠ বলে কথিত। এখানে দেবীর নাম কনককাঞ্চী।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে লেখা আছে, বঙ্গেশ্বর প্রথম মহীপালের রাজত্বের সময় রাজা ছিলেন রাজেন্দ্রচোল। সময়কাল ৯৮৮ থেকে ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গা থেকে জল এনে রাজধানী পবিত্র করার উদ্দেশ্যে উত্তরপূর্ব ভারতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এই ওড্ড বিষয় (ওড়িশা) ও কোম টলনাড়ু জয়ের পর তাঁর সেনাবাহিনী দণ্ডভুক্তিরাজ (দাঁতন) ধর্মপালকে পরাজিত করে। পরে রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বিতাড়িত করে বিরামহীন বৃষ্টিস্নাত বঙ্গালদেশে (পূর্ববঙ্গ) অধিকার করেন। অতঃপর কর্ণভূষণ, চর্ম পাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হতে বিতাড়িত হতে বাধ্য করেন ও তাঁর অদ্ভুত বলশালী কবিসমূহ এবং রত্নোপমা রাণীগণকে হস্তগত করেছিলেন।

জানা গেছে, দশম - একাদশ শতকে বীরভূমের এই জায়গাটি কাঞ্চিরাজ রাজেন্দ্র চোলের অধীনে ছিল এবং সেই সূত্রেই জায়গাটির নাম হয়েছে, কাঞ্চীদেশ।

বিস্ময়ের কথা গরমের সময় বীরভূমের সর্বত্র জলাশয় শুকিয়ে গেলেও কঙ্কালীতলায় কুণ্ডের জল কখনও শুকোয় না। কঙ্কালীতলায় যে কুণ্ডে মায়ের কঙ্কাল পড়েআছে সেখানে যদি কেউ নামেন তাহলে কোনও না কোনও ভাবে তার ক্ষতি হয়। বারবার এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কঙ্কালীতলার ভৈরবের নাম রুরু ভৈরব। 'রু' শব্দের অর্থ আলো। অর্থাৎ আলোয় আলোয় এই অঞ্চলটি আলোকিত হয়ে প্রতিনিয়ত সুন্দরের উপাসনা চলছে। এই আলো হল, চৈতন্য অনুভূতি এবং ভাবনার।

বুদ্ধদেব আচার্য্য তাঁর 'বেদগর্ভা কঙ্কালী' বই- তে লিখেছেন, বর্তমানে যাঁরা কঙ্কালীতলায় দেবীর পুজো করছেন তারা বেঙ্গুটিয়া গ্রামের রাঢ়ী কাশ্যাপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। পদবী চৌধুরী। এই বংশের যোগীন্দ্রলাল চৌধুরী ও তাঁর ছোটভাই রামদাস চৌধুরী একসময় মায়ের পুজো করতেন। তারপরে পুজোর দায়িত্বে ছিলেন নীরোদ গোপাল চৌধুরী ও নিত্যগোপাল চৌধুরী। তিনি আরও লিখেছেন, শোনা যায়, পাশের সর্বানন্দপুর গ্রামের হীরালাল

অধিকারীর বাবা একসময় এই পীঠস্থানের পূজারী ছিলেন।

বর্তমান পুরোহিত জানিয়েছেন, এখনও রাত্রিবেলা এখানে একা কেউ থাকতে পারেন না। নানান কারণ এই ঘটনা ঘটে থাকে।

তালজোরের জমিদারদের সম্পত্তির আয়ে দেবীর অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা আছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিশেষ পুজো হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংক্রান্তির দিন ভক্তেরা কুণ্ডের পাক পরিষ্কার করেন। কুণ্ডের জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন পঞ্চশিব। সেদিন জল থেকে তাদের তোলা হয়। তাঁদের এনে রাখা হয় কাঞ্চীশ্বর শিবের মন্দিরে। উৎসবের শেষে ১লা বৈশাখ তাদের আবার কুণ্ডের জলে রেখে দেওয়া হয়। তখন এখানে তিনদিন ধরে উৎসব চলে।

কারও কারও ধারণা, কুণ্ডের পশ্চিমদিকে যে দু'টি সুড়ঙ্গ আছে তার সঙ্গে যোগ রয়েছে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের। চৈত্র সংক্রান্তির দিন স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা কুণ্ডের চারপাশে বসে পুজো করেন। অতীতে চেকাবাড়ির জমিদারদের দেওয়া ছাগল প্রথম উৎসর্গ করা হতো। এখন আর তা হয় না। বর্তমানে পুরোহিতদের উৎসর্গ করা ছাগল প্রথম বলি দেওয়া হয়।

কঙ্কালীতলায় সিদ্ধ হয়েছেন এমন কয়েকজন মানুষের সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

এঁদের একজন সাধক জগদীশবাবা বীরভূমের তারাপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই সাধকের সব লক্ষণ তার মধ্যে পুরোপুরিভাবে লক্ষ্য করা যায়। এক একদিন তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে সাধক বামাক্ষ্যাপার কাছে চলে যেতেন। জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। শোনা যায়, যখন তাঁর দেড় বছর বয়স, বাড়ির পাশে 'তেঁতুল ডোবার' জলে ডুবে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন। পনেরো বছর বয়সে তঁর বিয়ে দেওয়া হয়-জামালপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে কালীদাসী দেবীর সঙ্গে। তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিল সাত বছর। জগদীশ বাবা ও তাঁর স্ত্রী দীক্ষা নেন রাঙামা'র কাছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে তিনি কঙ্কালীপীঠে আসেন। সেখানে একটি ছোট্ট পর্ণকুটীরে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর কলকাতার ভক্ত শিষ্যেরা তাঁকে যাদবপুরে নিয়ে আসেন ও দক্ষিণ শহরতলীর নরেন্দ্রপুরের কাছে 'কুমড়োখালি'-তে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় কুড়িবছর তিনি কঙ্কালীতলায় কাটিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১৭মাঘ তিনি শরীরের মায়া কাটিয়ে অনন্তলোকে যাত্রা করেন।

কঙ্কালীতলায় সিদ্ধপুরুষ ভৈরবগিরি ছিলেন বীরভূম জেলার কীর্ণাহার অন্তর্গত আঁকুপুরের বাগদী পরিবারের ছেলে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় কঙ্কালীতলার মহাশ্মশানে।

এখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন ভৈরবী মা, সাংসারিক জগতে যাঁর নাম ছিল নীলা। তাঁর পরিবারের সঞ্চিত সবকিছু দান করা হয়েছে কঙ্কালীতলায় সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মহাসাধনায় মগ্ন হন। জীবনধারণের জন্য তিনি মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করে দিনযাপন

করতেন। কঙ্কালীতলায় ভৈরবনাথ মন্দিরের উত্তর দিকে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

এছাড়াও সাতুক্ষেপা, সারদা গোস্বামী, ভূপেন্দ্রনাথ মিশ্র, বিবেক বাবা, গুরুরেবাবা, সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীমা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বোলপুর থেকে চার মাইল দূরে এই মহাপীঠ, বাস, প্রাইভেট কার বা সাইকেল রিক্সায় যাওয়া যায়। রাতে সেখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'বেদেনী', 'কবি' গল্পে কঙ্কালীতলায় মেলার উল্লেখ করেছেন। শিল্পী নন্দলাল বসু এই মেলার একটি ছবি এঁকেছিলেন। মেলার ছবি এঁকেছেন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজও।

কঙ্কালীতলা আদৌ সতীপীঠ কিনা এনিয়ে দ্বিমত থাকলেও কালিকাপুরাণ, মন্ত্রচূড়ামনিতন্ত্র, অন্নদামঙ্গল, প্রাণতোষনীতন্ত্র, পীঠ নির্ণয়, শিবচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এই তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। পীঠ নির্ণয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

যোজনভ্যন্তরে লিঙ্গম উত্তরবাহিনী নদী
সমীপস্থ শ্মশানাঞ্চ মহাবীঠং ব্রবীমি তে।।

যদিও অধ্যাপক উপেন্দ্র কুমার দাস বলেছেন, দেবীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে আস্ত কঙ্কাল থাকতে পারে না। যাঁরা কঙ্কালের কথা বলেছেন, মনে হয় এদিকে তাঁদের নজর পড়েনি। ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, পূর্বের কোন প্রাচীন গ্রন্থে এমনকি পীঠ নির্ণয়ের অন্যান্য পুঁথিতেও নলহাটী, কালীঘাট, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর, কঙ্কালীর নাম নেই। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, বীরভূমে একটিই মহাপীঠ আছে বক্রেশ্বর। বাকী সব উপপীঠ বা সিদ্ধপীঠ।

সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী

পূণ্যভূমি বীরভূম। সমন্বয়ের মহাক্ষেত্র। জেলায় রয়েছে পাঁচটি সতীপীঠ। তার অন্যতম হল সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সাঁইথিয়া দীর্ঘদিন ধরে সুপরিচিত। এখানকার আগেকার নাম ছিল নন্দিপুর। এখনও এই মহকুমা শহরের একাংশ নন্দিপুর হিসাবে পরিচিত।

একদা এই জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ভর্তি। পরিচিত ছিল 'নিশানদারীর বন' নামে। মহাশ্মশান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ময়ুরাক্ষী নদী। জনশ্রুতি, 'সাইত' শব্দ থেকে প্রথমে এখানকার নাম হয় 'সাইতা'। পরে তাই লোকমুখে সাঁইথিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, কোনও সাঁই-এর সুবাদে ওই জায়গার নাম সাঁইথিয়া হতে পারে। এই বিষয়ে আর একটি কাহিনীও শোনা যায়।

একদা নবাব ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন-বখতিয়ার খিলজির অধীনে বাংলায় শাসনভার থাকলেও রাজনগর তার সাম্রাজ্যের অধীন ছিল না। সেখানে তখন বীররাজা নামে জনৈক শক্তিমান রাজা রাজত্ব করতেন। ইখ্‌তিয়ারউদ্দীনের দুই অনুচর জোনেদ আলি ও আসাদ আলি - মল্লবীরের ছদ্মবেশে বীররাজার অধীনে চাকরী নেয়। তারা প্রায়শই মল্লযুদ্ধে মেতে থাকতেন রাজার সঙ্গে। বলাবাহুল্য, তারা সেই সময় রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করত।

হঠাৎ-ই একদিন তারা গুরুতরভাবে আক্রমণ করে বীররাজাকে। বেঁধে যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। একসময় বীররাজা কুয়োতে পড়ে মারা যান রাজা। একই সঙ্গে একই জায়গায় পড়ে গিয়ে মারা যায় আসাদ-ও। তারপর ওই জায়গাটি চলে যায় মুসলমান রাজার দখলে। ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন, বীরভূমের শাসনভার তুলে দেন জোনেদ আলি-র হাতে।

বর্তমানে মা নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইন্দুভুষণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এখন যেখানে মায়ের মন্দির সেখানে সুদূর অতীতে কোনও জনবসতি ছিল না। তখন এখানে মূলত বসবাস করত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজন।

মা নন্দিকেশ্বরী সম্পর্কে পীঠতন্ত্রে বলা হয়েছে,

হায় পাতো নন্দিপুরের ভৈরব নন্দিকেশরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধি ভবাপ্পূয়াত্।।

তন্ত্র অনুসারে জানা যায়, নন্দিপুরে সতীর গলার হাড় পড়েছিল। অপর এক মতে, নন্দিপুরে সতীর কণ্ঠহার পড়েছে। 'একান্ন পীঠের সন্ধানে' গ্রন্থে নিগূঢ়ানন্দ, মা নন্দিকেশ্বরীকে উনপঞ্চাশতম পীঠ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও এই পীঠকে পঞ্চাশতম

পীঠ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিশাল বটগাছের তলায় তাঁর অবস্থান। শোনা যায়, প্রতিদিন ময়ূরাক্ষী নদী পেরিয়ে 'উমা' নামে জনৈকা বাল্যবিধবা নন্দিকেশ্বরী মায়ের পুজো করতে আসতেন। সেই উমার নামানুসারেই নদীর অন্য পারের একটি গ্রাম 'ওমো' বা 'অমুয়া' নামে পরিচিতি পায়।

সাঁইথিয়ার জমিদার পঞ্চানন ঘোষের পূর্বপুরুষ দেওয়ান দাতারাম ঘোষ বসবাস করতেন দক্ষিণেশ্বরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি ঘটনাচক্রে বীরভূমে আসেন। তখন নীলকুঠি সাহেবের রমরমা ব্যবসা চলছে। এই সময় একদিন নীলকর সাহেবের জাহাজ দক্ষিণেশ্বরের চড়ায় আটকে যাওয়ায় তিনি বিপাকে পড়েন। সামনের মাঠে কয়েকটি ছোট ছেলে তখন খেলছিল। সাহেব তাদের ডেকে, জাহাজ ঠেলে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু লালমুখো সাহেবকে দেখে অন্যান্য ছেলেরা পালিয়ে যায়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিল কিশোর দাতারাম। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সে সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব তাকে বলেন, জাহাজ ঠেলে দিয়ে সাহায্য করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। দাতারাম পরিপূর্ণভাবে সেই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ওই নীলকর সাহেব গুনুটিয়া-রাজনগর কুটির কুঠিয়াল হিসাবে কাজ করতেন। তিনি চাকরির সুযোগ দিয়ে দাতারামকে নিয়ে আসেন বীরভূমে। তাঁকে নিয়োগ করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে। তাঁর দায়িত্ব ছিল এক কুঠি থেকে আরেক কুঠিবাড়িতে টাকা পৌঁছে দেওয়া। তাঁকে গুনুটিয়া থেকে রাজনগর, রাজনগর থেকে গুনুটিয়া যেতে হত। এই দীর্ঘপথ তাকে হেঁটে যাতায়াত করতে হত। একসময় ভাল কাজের জন্য তিনি সাহেবদের সুনজরে আসেন।

তাঁর যাতায়াতের পথে সাঁইথিয়া পড়ত। জনশ্রুতি আছে, মথুরাপুরে তখন শিবচন্দ্র বিশ্বাস নামে জনৈক প্রখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। যাতায়াত করার সময় শিবচন্দ্রের সঙ্গে দাতারামের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন শিবচন্দ্র, দাতারামের ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন, তুমি ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হবে। এহেন ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি দাতারাম অবশ্য তেমন কোনও ভরসা রাখতে পারেননি।

মথুরাপুরের মতো যাতায়াতের পথে দাতারাম মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন সাঁইথিয়াতেও। নন্দিকেশ্বরী মায়ের মন্দির তখনও পীঠস্থান হিসাবে পরিচিতি পায়নি। গভীর বনজঙ্গলে ভরা এক বটগাছের নিচে ছিল মায়ের অবস্থান। একদিন সেখানেই গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য কয়েক মুহূর্ত বসলেন দাতারাম। চোখ বুঝে আসে ক্লান্তিতে।

এমনসময় স্বপ্নে দেখলেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরী। পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি। কপালে ও সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। কিশোরী দাতারামকে বললেন, আমি মা নন্দিকেশ্বরী। তোর কাছে যে টাকা আছে তা নিয়ে এখনই কাটোয়ায় চলে যা, সেখানে সাঁইথিয়া (সাইতা), কাগাস বেলেসহ আর একটি মহাল নীলাম হবে। আমি আদেশ করছি, তুই ওই মহালভূমি নীলাম ডাকবি। ওই জায়গার ভূস্বামী তুই হবি। আমি অনেকদিন এই বনের মধ্যে রয়েছি। ভূস্বামী হয়ে আমার নিত্যসেবার ব্যবস্থা করবি। পুজো

ছাড়াও আমার প্রচারের দায়িত্বও তুই নিবি। আমি আশীর্বাদ করছি, তুই জয়যুক্ত হবি।

একসময় তন্দ্রা ভেঙে যায় দাতারামের। তখন চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চিত স্বয়ং মা তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। বারবার কানে ভেসে আসছিল মায়ের কথাগুলি।

বর্তমান প্রধান পুরোহিত শ্রীচক্রবর্তীকে দেখে মনে হল, দেবীমায়ের কথা বলতে বলতে অন্য কোনও জগতে চলে গেছেন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, টাকা নিয়ে সেখানে দাতারামের যাওয়ার কথা রাজনগরে। কুঠিবাড়ি থেকে পৌঁছে দিতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহেবদের টাকা। তা দিয়ে মহালনীলাম ডাকবেন কি করে? ওই টাকায় তো তার কোনও অধিকার নেই। সাতপাঁচ ভেবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না তিনি।

রাতের শেষে তিনি পৌঁছে যান কাটোয়ায়। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, সেখানে তখন মহাল নীলাম হচ্ছে। কি এক শক্তি ভর করেছিল দাতারামের ওপর। নীলাম ডাকলেন দাতারাম। তবে যেহেতু টাকাটা সাহেবদের তাই ডাক ছিলেন সাহেবদের নামে।

নীলামের শেষে ভয় পেয়ে যান তিনি। ভাবেন সাহেব যদি তার এই দুঃসাহসকে ক্ষমা না করেন। তাই আর দেরী না করে পালিয়ে আসেন কাটোয়া থেকে দক্ষিণেশ্বরে। এদিকে তার খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন নীলকুঠির সাহেব।

একসময় দক্ষিণেশ্বরে এসে সাহেব খোঁজ পেলেন দাতারামের। সমস্ত কথা তিনি দাতারামের কাছে শোনেন। আশ্চর্যের বিষয়, তিরস্কার না করে সাহেব দাতারামকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি দাতারামের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়ে জমিদারীর দেখাশোনার ভার।

বৃদ্ধ বয়সে দেশে ফিরে যাবার আগে সাহেব সব জমিদারী দান করেন দাতারামকে। ভক্তের মনে ছিল ভগবানের নির্দেশ। সেই থেকে শুরু হয় মা নন্দিকেশ্বরী মায়ের নিত্য পুজো।

একসময় এই মন্দির চত্বরে সাধনার জন্য এসেছিলেন হরানন্দ ভৈরবী। মা নন্দিকেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মন্দিরের হরিনাম সংকীর্তনের জন্য কালীয় দমনের মন্দির তৈরি করান।

প্রতি বছর পৌষ মাসের ২০ তারিখের পর সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বরী মন্দিরে পৌষাল্যা উৎসবের আয়োজন করা হয়। একসময় বামাক্ষ্যাপা এখানে এসেছিলেন মায়ের দরবারে। সেসময় ঘটে যায় এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

ক্ষ্যাপাবাবা সাঁইথিয়ায় এসে ভুলেই গেছেন যে, সন্ধ্যায় তারাপীঠে ফিরে গিয়ে মায়ের মন্দিরের আলো জ্বালাতে হবে। এদিকে নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের পাশে রেলওয়ে স্টেশনে তখন চলছে হুলুস্থূল কাণ্ড। শত চেষ্টা করেও তারাপীঠ যাওয়ার ট্রেন নড়ছে না। হঠাৎ ক্ষ্যাপাবাবার মনে পড়েছে সন্ধ্যা হওয়ার আগে তারাপীঠে ফিরে যেতে হবে। বামাচরণকে তখন দু'চারজন চিনতেন। ক্ষ্যাপাবাবাকে দেখে তারা বলে উঠলেন, বাবা এসে গেছে। এবার ট্রেন চলবে।

কি হয়েছে জানতে চাইলেন বামাচরণ। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? ট্রেন নড়ছে না শুনে বললেন, এই চলো। আশ্চর্যের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল তারাপীঠগামী ট্রেন।

সুখের কথা, বর্তমানে মন্দির চত্তরের মধ্যে মহাতাপস মোহনানন্দ ব্রম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে বালানন্দ যাত্রীনিবাস। যে কোনও মানুষের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা। মোহনানন্দ ব্রম্মচারী ছাড়াও এখানে এসেছেন ঠাকুর সত্যানন্দ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধু সন্ন্যাসীরা।

রথযাত্রার সময়, বিপদতারিণী পুজোয় এখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। শনি, মঙ্গলবারেও অনেকে মাকে পুজো দিতে আসেন। এখানে মায়ের পুজোর নৈবেদ্য হিসাবে কলাবাতাসা খুবই পরিচিত। অমরানন্দ স্বামী নামে জনৈক সাধু এই ধরনের প্রসাদের প্রচলন করেন। এছাড়াও খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি, পায়েস, চাটনি ভোগ হিসাবে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। মাছের ভোগও হয়। বলির ব্যবস্থা আছে। মন্দির খোলা থাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। মাঝে ভোগের জন্য আধঘণ্টা বিশ্রাম।

এখানে মাকে পুজো করা হয় চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী, চতুর্ভুজা ধ্যানে। দুর্গাপুজোর চারদিন মা'কে পুজো করা হয় দুর্গারূপে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে এখানে। বিশেষ বিশেষ দিনে মায়ের প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় স্থানীয় জমিদার বাড়ি থেকে। এছাড়া কালীপুজো, বাসন্তী, জগদ্ধাত্রী পুজো-সব উৎসবেই মা নন্দিকেশ্বরীকে নিয়ে মেতে ওঠেন সাঁইথিয়ার মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের সামনেই রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মন্দির।

অতীতে এখানে রথযাত্রার ব্যবস্থা ছিল। মাঝে তা বন্ধ বা সীমিত হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষেরা আবার এই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, যদিও মূল মন্দিরের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই।

নন্দিকেশ্বরী মায়ের মন্দিরের কাছেই ময়ুরাক্ষী নদী। কোনও কোনও বছর বর্ষার সময় সাঁইথিয়ার মতো মহকুমা শহরও বন্যায় ভেসে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, একবারের জন্যও বন্যার জল স্পর্শ করেনি মায়ের মন্দির চত্বর।

এখানে একটা প্রবাদ আছে যা বাস্তবেও বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তা হল, এখান থেকে অর্থ আয় করে বাইরে কোথাও বিনিয়োগ করলে তার ফল ভাল হয় না।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখানে পাণ্ডার কোনও উৎপাত নেই। কিন্তু আছে এক মনোরম পরিবেশ।

হাওড়া থেকে ট্রেনে সাঁইথিয়া স্টেশনে নেমে মায়ের মন্দিরে পৌঁছাতে পায়ে হেঁটে সময় লাগে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট।

নলহাটীর নলাটেশ্বরী

আনুমানিক পাঁচশ বছর আগে, ৯০০ সনের আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে পাইকপাড়া গ্রামে রামশরণ শর্মা নামে জনৈক ব্যবসায়ী তথা সাধককে স্বপ্ন দিয়ে মহামায়া অধিষ্ঠিতা হন নলহাটীতে। কলকাতা থেকে নলহাটীর দূরত্ব দু'শো আঠাশ কিলোমিটার। রেলস্টেশন থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে একটি টিলার ঢালে পার্বতী মায়ের মন্দির। একেই মানুষজন নলাটেশ্বরী মন্দির নামে চিহ্নিত করেন। এখানে দেবীর নলা পড়েছিল বলে নাম হয়েছে নলাটেশ্বরী। একাংশের মতে, মন্দিরটি গড়েছেন রাণী ভবানী। এ ব্যাপারে অবশ্য অন্য মতও আছে। তা হল, মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন রামশরণ শর্মা। বাণিজ্য করতে এসে তিনি মন্দির তৈরির জন্য স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন।

এই মন্দিরটিকে একান্ন পীঠের একটি পীঠ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

পীঠ নির্ণয়ের বর্ণনায় চতুশ্চত্বারিংশৎ শাক্তপীঠ হল নলহাটী। সেখানে আছে,

"নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িকা।"

অর্থাৎ নলহাটীতে পড়েছে সতীর নলা। দেবীর নাম 'কালী'।

ভৈরবের নাম যোগীশ'।

সংস্কৃত শব্দ 'নলক' যার অর্থ দীর্ঘ অস্থি, বাংলায় তারই ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণ হল নলা। অনেকের বিশ্বাস, এখানে পড়েছে দেবীর ললাট। কিন্তু শাস্ত্র, পুরাণে রয়েছে এই জায়গায় পড়েছিল দেবীর নলা। জনৈক 'সাহা' জমিদার মন্দিরটি তৈরি করিয়েছেন বলেও শোনা গেছে। বৈষ্ণব জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ মন্দিরের জন্য অনেক জমি দান করেছিলেন। পার্বতীর ভৈরব যোগীশের ভিত খোঁড়ার সময় একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আঁকা ছিল নারায়ণের পদচিহ্ন। ওই পাথরটিকে মন্দিরে গেঁথে রাখা হয়েছে। স্থানীয় প্রকাশক-পুস্তক ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অতীতে মন্দিরের পেছনে দুটি প্রস্রবণ ছিল। আমি তার জলও খেয়েছি। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মানুষ এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আসতেন। বেশিরভাগ মানুষ সেই প্রস্রবণের ঠাণ্ডা জল খেতেন। পরে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এখন সেখানে পুকুরের মতো হয়ে আছে। এখানে একটি গড় ছিল। মন্দিরের পিছনে টিলার মাথায় বর্গী যুদ্ধের পির কেবালা আশা শহিদের মাজার আছে। বাংলার শেষ নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধ হয়েছিল উদয়নালার মাঠে, যা টিলার ওপর থেকে দেখা যায়। পিরবাবার মাজারের পেছনে একটি নিমগাছ ছিল। ওই নিমগাছের মন্দিরের দিকের পাতাগুলি ছিল তিতো আর অপরদিকের

পাতাগুলো ছিল মিষ্টি। এগুলি আমার দেখা। ওই নিমগাছের তিতো ও মিষ্টি, সব পাতাই খেয়েছি। পুরো পাহাড়টি ছিল জঙ্গলে ভরা। সেখানে চারটি বটগাছ ছিল। প্রচলিত কাহিনী আছে, রামচন্দ্র নাকি এখানে এসে অস্থায়ীভাবে থাকার সময় রান্নাবান্না করার পর তাঁর পোঁতা গাছের ডাল থেকে একসময় সেগুলি বটবৃক্ষে পরিণত হয়। সেখানে একটি পাথর আছে যার গায়ে রয়েছে অনেকগুলি দাগ। প্রবাদ আছে, সীতা এখানে বসে চুল শুকিয়েছেন বলে পাথরের গায়ে ওই দাগগুলি হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালে মন্দিরের কাছাকাছি জায়গা থেকে প্রস্তরযুগের কিছু টাকা, পয়সা ও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এখন সেগুলি যাদুঘরে রাখা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামশরণ শর্মার বংশধরেরা এখনও নলহাটীতে বসবাস করেন। তাঁদের কাছেই জেনেছি, ওঁর পূর্বপুরুষ এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্পর্কে স্বপ্নাদিষ্ট হন। এখানকার একটি এলাকার নাম অরুণাচল, আর একটির নাম উদয়াচল। বামদেব তারাপীঠ থেকে এখানে প্রায়ই আসতেন এবং চারদিন-পাঁচদিন থেকে যেতেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কমলচন্দ্র মসকরা'র কাছে জানা গেছে দেবীর বিভিন্ন মাহাত্ম্যকথা। তিনি বলেছেন, একসময় মন্দিরের খুবই খারাপ অবস্থা হয়েছিল। ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ত। মায়ের পুজো হত কোনওরকমে। অনেকেই তখন মন্দিরে যেতে চাইতেন না। রাতে তো সেখানে থাকার কোনও প্রশ্নই ছিল না। সময়টা ছিল ১৯৯৪-৯৫ সাল। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। '৯৬ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। দুঃখের বিষয় হল, স্থানীয় জনগণের অনেকেই জানতেন না, নলাটেশ্বরী একান্ন পীঠের অন্যতম এবং মায়ের নলা এখানে পড়েছে। অবশ্য কারও কারও মতে, এখানে পড়েছে দেবীর পায়ের নলি। নলহাটী নাম কেন হয়েছিল এ নিয়েও দ্বিমত রয়েছে। একপক্ষের মতে, রাজা নলের নামে এই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে। অন্যমতে হল দেবীর অঙ্গ পতনের জন্যই এই জায়গার নাম নলাটেশ্বরী রাখা হয়েছে। এটি এক ঐতিহাসিক জায়গা। লুণ্ঠনকারীদের জায়গা হিসাবে চিহ্নিত বর্গীডাঙ্গা আছে। এখান মাটির তলায় জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানেই বর্গীরা আশ্রয় নিত। একসময় এখানে মুসলমান ও বর্গীদের মধ্যে যুদ্ধও হয়েছিল। শোনা যায়, নলহাটী নাকি তিনটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বের সময় মহাদেব যোগীশকে নলহাটী থেকে সরিয়ে 'হরিওকা'-তে (চলিত ভাষায় বলা হয় হরিওকা, আসল নাম হরিতকা—এখানে হরিতকির গাছ ছিল বলে জায়গাটির এরকম নামকরণ করা হয়েছে) ওই নিয়ে যাওয়া হয়। নলহাটী থেকে জায়গাটির দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। আরও শোনা যায়, মায়ের মন্দিরে দু'টি সাপ ছিল। প্রতিদিন পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুললে দেখতে পেত মহামায়ার ওপর দু'টি নাগ-নাগিন রয়েছে। দরজা খোলার পর সাপ দু'টি সামনের পুকুরের মধ্যে চলে যেত। আশ্চর্যজনকভাবে, পরের দিন সকালে আবার মন্দিরের মধ্যে সাপ দু'টিকে দেখা যেত। একদিন এই দু'টি সাপের মধ্যে একটিকে কেউ বা কারা মেরে

ফেলে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই হত্যাকারীর বংশ লোপ পেয়ে যায়। আমার অনুভব, মন্দিরের উত্তরদিকে একটি পাথরের নীচে এখনও অন্যতম সাপটি থাকে। কেউ কেউ তাকে দেখতেও পেয়েছে। স্থানীয় দোকানদারেরা সাপটির অবস্থান সম্পর্কে জানানোর পর সেখানে গিয়ে দেখেছি, পাথরের নীচে দিয়ে যাবার রাস্তা আছে। একসময় সেখান থেকে বড়মাপের সাপের খোলসও পাওয়া গেছে।

মন্দিরের দক্ষিণদিকে একটি সাদা নাগ আছে। তার মাথাতে সিঁদুরের দাগ ছিল বলে অনেকে দাবি করে থাকেন।

অনেক পঙ্গু মানুষ মা নলাটেশ্বরীর কাছে এসে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। একদিন মন্দিরের অফিসে বসে কাজ করছি। কলকাতা থেকে জনৈক ভদ্রলোক এসে বললেন, আপনি কি জানেন মায়ের মন্দিরে আসার চারটি রাস্তা আছে। মন্দিরে আসবার রাস্তা তো আছেই, কিন্তু ভদ্রলোক কেন সংখ্যায় চারটি বললেন, ভেবে পেলাম না। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, না এরকম কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তখন ওই ভদ্রলোক, ঠিক আছে চিন্তা করে দেখবেন বলে, চলে গেলেন। অনেকদিন আমি এই বিষয়ে ভেবেছি। কিন্তু কিছুতেই উত্তর খুঁজে পাইনি। একটি রাস্তা তো রয়েছে যেখান দিয়ে মন্দিরে আসা যায়।

অনেকদিন ধরেই এই নিয়ে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই যায় নলহাটির কমল চন্দ্র মসকরার। মন্দিরের যদি চারটি রাস্তা থাকে, তাহলে তার প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়? বেশ কিছুদিন চিন্তা করার পর কয়েকটি বিষয় তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বর্গীরা লুণ্ঠনকারী, ওরা মা কালীর ভক্ত। মায়ের পুজো না করে ওরা কোনো কাজ করত না। তাই মা নলাটেশ্বরী মন্দিরে আসার জন্য বর্গীডাঙ্গা থেকে কোনও একটি আন্ডার গ্রাউন্ড রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। অনুসন্ধান করে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এর আগে বছরের পর বছর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ওই রাস্তার খোঁজ করেছি। কিন্তু তখন কোনও সন্ধান পাইনি। মায়ের ঘরের পাশে একটি কুয়ো আছে। তার পাশে একটি গর্ত আছে। মনে হয়েছিল, সেখান দিয়ে কোনো রাস্তা থাকতে পারে। কিন্তু একসময় সেই সন্দেহ অমূলক বলে ধরে নেওয়া হয়। একসময় মন্দির কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ অমল ধর। একদিন তিনি কথায় কথায় বললেন, মন্দিরের চারদিকে অনেকগুলি গর্ত আছে। ওইসব গর্তের মধ্যে কেউ পড়ে গেলে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে মন্দিরের পাশে ডাঃ ধরের যে জায়গা আছে সেখানে দিয়েই বর্গীডাঙ্গায় যাওয়ার রাস্তা আছে।

নলহাটির ব্যবসায়ী-ভক্ত কমল চন্দ্র মসকরা আরও জানিয়েছেন, নলহাটিতে রাজপরিবারের বাড়ি এখনও আছে। রাজারা যখন মা নলাটেশ্বরীকে প্রণাম করতে যেতেন তখন চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। একথা ধরেই নেওয়া যেতে পারে, এই সময়

রাজবাড়ির বিশেষত মহিলাদের যাতায়াত করার জন্য কোনও 'আন্ডারগ্রাউন্ড' রাস্তা ছিল। তখন জায়গাটি এমনই জঙ্গলে ঢাকা ছিল, দর্শনার্থীরা সকাল সকাল মাকে দর্শন করে ফিরে যেতেন। সূর্য ডোবার পর সেখানে কেউ থাকত না। আর এখন যেদিক থেকে সকলে মা'কে দর্শন করতে যান সেই রাস্তাটি তো ছিলই। তাহলে চতুর্থ রাস্তাটি কোথায় আছে?

এরপর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়ল গাছের নীচে একটি দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমায় ডেকে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমার তখন মন ছটফট করছে আরতির সময় মন্দিরে মায়ের কাছে যাবার জন্য। সে কথা বুঝতে পেরেও ভদ্রলোক আমায় বললেন, বাকি রাস্তাটা খুঁজে পেলেন? হকচকিয়ে গেলাম ওঁর কথায়। একি বলছেন, আমি তো এই কথাই দিনরাত ভাবছি। বললাম, আপনি আমার মনের কথা জানলেন কী করে? আমার প্রশ্নে কান না দিয়ে তিনি বললেন, মন্দিরে আসার চারটে রাস্তা আছে? বললাম হ্যাঁ, তিনটে সন্ধান পেয়েছি। বলে ওঁকে তিনটে রাস্তার সন্ধান দিলাম।

তখন ভদ্রলোক বললেন, নলহাটি থেকে পূর্বদিকে তিন, সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে একটি শুকনো ইদারা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে মন্দিরে আসার রাস্তা ছিল। তিনি আরও জানালেন, সন্ন্যাসী, মহাত্মারা ওই রাস্তা দিয়ে আসতেন মা নলাটেশ্বরী মন্দিরে।

জানতে চাইলাম ওই রাস্তাটা কোথায় আছে? ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে জানালেন, সে কথা জানার সময় এখনও আপনার হয়নি। সময় হলেই জানতে পারবেন।

এদিকে আরতির ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। শ্রীকমলবাবু মন্দিরের দিকে ব্যস্ত হয়ে কয়েক পা এগোতেই হঠাৎ মনে হল, কে এই ভদ্রলোক, কী তাঁর পরিচয়, যিনি আমায় এত কথা বলে এত গভীর রহস্যের সন্ধান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে সেই জায়গায় এসে দেখলেন সেখানে কেউ কোথাও নেই। এরপর আশেপাশের অনেককে জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তাঁকে কেউ দেখেছে কিনা? কিন্তু কেউ তাঁকে সদুত্তর দিতে পারেনি।

সেই রহস্য আজও ভাবায় ওকে। আর একবার এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে। মন্দিরের অফিসে বসে রয়েছেন শ্রীমসকরা। সময় বারোটা-সোয়া বারোটা। একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে অফিসঘরের গেটের কাছে দাঁড়াল। শ্যাওলা রং, পাতলা গড়ন। ফিকফিক করে হেসে বলল, আমি ভোগ খাব। শ্রীমসকরা বললেন, মা, তুমি ভোগ খাবে, কিন্তু এখন তো সময় হয়ে গেছে। ভোগ 'রেডি' হয়ে গেছে। এর থেকে ম্যানেজ করা তখন খুবই মুশকিল ছিল। বললাম, মা আজ হবে না। কাল এসো, নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেব। মেয়েটি বলল, আমি আজই ভোগ খাব।

জিজ্ঞেস করলাম, মা, কোন বাড়িতে থাকো? মনে হচ্ছে, তুমি আশেপাশে কোথাও

থাকো?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, আমি পাশের বাড়িতে এসেছি।

কথাগুলি শুনে আমার খটকা লাগতে শুরু করল। আবার বললাম, মা তুমি কাল এসো। অবশ্যই ভোগের ব্যবস্থা করে দেব।

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, মা'কে দেখেও চিনতে পারলাম না। এই চিন্তা করতে করতে চার-পাঁচটা বিনিদ্র রাত কেটে গেল। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? তখন তাঁকে সব বললাম, তিনি আমার সব কথা শুনে বললেন, হুবহু এই মেয়েটি তো আমাদের বাড়িতে খেয়ে গেছে। মনে মনে স্ত্রীকে বললাম, তুমি আমার থেকেও বেশি ভাগ্যবান।

বুঝতে পারলাম, মায়ের কিছু আদেশ আছে। সেই আদেশ পালন করা বিশেষ প্রয়োজন। পরের দিন মন্দিরে গিয়ে ঠিক করে দিলাম, প্রথমে কোনও কুমারীকে ভোগের প্রসাদ দেওয়া হবে। তারপর যথাক্রমে মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও ভক্তেরা প্রসাদ পাবে।

আর একবার জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমাদের মা নলাটেশ্বরী আসলে একজন পাঁচ বছরের মেয়ে। উনি লাল পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান। পায়ে মল পরা আছে এটাই হল ওর প্রকৃত রূপ।

একবার এক সাধক নবরাত্রির সময় এসে বললেন, আমি এখানে ন'দিন পুজো করব। বললাম, করুন। ন'দিনের মাথায় বললেন, আমি ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াব। উত্তরে জানালাম, যেমন বললেন, তেমন ব্যবস্থা করে দেব। তিনি যতটা জিনিসের কথা বলেছিলেন আমি তার অর্ধেক দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, একশ জনক কুমারীর ব্যবস্থা করতে। সেদিন ষাট-সত্তর জন কুমারী, ব্রাহ্মণসহ দেড় থেকে দু'হাজর মানুষ মায়ের প্রসাদ পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত কিন্তু প্রসাদ কম পড়েনি।

মায়ের যে নলা আছে, সেখানে দুধ বা কিছু দিলে মানুষ যেভাবে খায় সেইভাবে আস্তে আস্তে নেমে যায়। এই নয় যে, কিছু দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দিয়ে নেমে যাবে। শোনা যায়, যখন মন্দির হয়নি, তখন সাহা পরিবারের কর্তাকে মা স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমি এখানে খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছি। আমার আচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর। তাঁরই তত্ত্বাবধানে মন্দির তৈরি হয়। একসময় এই জায়গায় নানান ধরনের জীবজন্তু থাকত। আজও মন্দিরের চারপাশে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোনও পাথরের আকৃতি হাতির মতো, আবার কোনটা বাঘ বা অন্য প্রাণীর মতো। কারও কারও মতে, এগুলি হল জীবজন্তুর ফসিল, পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

অহিভূষণ কবিরাজ এবং আমার দাদু— দু'জনে ছিলেন কালীভক্ত। অমাবস্যার রাতে মায়ের চত্বরে যে পঞ্চমুক্তির আসন আছে ওঁরা সেখানে পুজো করতে যেতেন। মা তখন শিয়ালরূপে সেখানে আসতেন। আমার বাবা চণ্ডীপ্রসাদ নস্কর এবং আমার আর

এক দাদুর ছেলে (তাঁর নাম আমার জানা নেই) ওঁরা তখন ছেলে মানুষ। দু'জনে ঠিক করেন অমাবস্যার রাতে সেখানে কী হয় দেখবেন। শিবাভোগ দেওয়ার পর শিয়ালের লকলকে জিভের থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা আগুনের রূপ দেখে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে যান। ওঁরা চিৎকার শুনে কবিরাজ মশাই বলেন, আরে এখানে বাচ্চার আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। ওই ঘটনা দেখার পর আমার বাবার সাতদিন পর জ্ঞান ফেরে এবং সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁর জ্ঞান ফেরে তিনমাস পরে।

মা নলাটেশ্বরী মন্দিরের জন্য রাণী ভবানী তিনশো পঁয়ষট্টি বিঘা জমি দান করেন। এখানে একটা মায়ের বাগান আর একটা বাবার বাগান ছিল। এটা আমরা ছোটবেলায় দেখেছি। এখনও ওই জায়গাগুলি রেজিস্ট্রি করা সম্ভব হয়নি। মায়ের পুজোর জন্য রাণীমা সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। সামান্য দূরত্বে বয়ে চলেছে যকধরী নদী, যার আসল নাম ব্রাহ্মণী। একসময় এই নদী মায়ের মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে যেত।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : (শিয়ালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস বা অন্য কোনও ট্রেনে অথবা রামপুরহাটে এসে সেখান থেকে ট্রেনে ২০ মিনিটের মধ্যে নলহাটিতে যাওয়া যায়। স্টেশনের কাছে থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। স্টেশন থেকে নলাটেশ্বরী মন্দিরে রিকশায় যেতে সময় লাগে ১০-১৫ মিনিট। সকাল ৬-১২ মিনিটে নলহাটি স্টেশন থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে বেলা ১১-২৫ মিনিটে হাওড়ায় পৌঁছানো যায়।)

850

শ্মশানতীর্থ বক্রেশ্বর

একসময় শ্মশানতীর্থ বক্রেশ্বরে কয়েক ঘর মানুষ ছাড়া কারও বসতি ছিল না। তখন এখানকার নাম ছিল 'ডিহি'। এখনও অনেকে 'ডি-বক্রেশ্বর' নামে এই জায়গাকে চিহ্নিত করে থাকেন। এর পূর্বদিকে একটি নদী আছে। নদীর পারে একটি জঙ্গলের মতো ছিল যেখানে বক্রেশ্বর শিবের অবস্থান।

বক্রেশ্বর শিবের সঙ্গে অষ্টাবক্রমুনির জন্ম এবং তাঁর জীবন নানাভাবে জড়িয়ে আছে। অষ্টাবক্র মুনির বাবার নাম কহোড়মুনি এবং মায়ের নাম ছিল সুজাতা দেবী। বেদজ্ঞানে, পারদর্শী কহোড়মূলর মতো মানুষের সংখ্যা তখন হাতে গোনা যেত। অষ্টাবক্রমুনি যখন তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন, তখন স্ত্রীকে বেদ পাঠ করে শোনাতেন কহোড়মুনি। অনেকের ধারণা, গর্ভে থাকার সময় বাবার বেদ পাঠ শুনে অষ্টাবক্র মুনি পৃথিবীর আলো দেখার আগেই বেদজ্ঞানের অধিকারী হন। ওই সময় একদিন কহোড়মুনি নাকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভুল বেদপাঠ করেন। তখন গর্ভস্থ সন্তান অষ্টাবক্র বলে ওঠে, বাবা, আপনার কৃপায় মায়ের গর্ভে থাকার সময়েই আমি বেদজ্ঞানে পারদর্শী হয়েছি। সেই সূত্রে বেদপাঠের সময় আপনি যে কিছু ভুল পাঠ করছেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

কহোড়মুনি গর্ভস্থ সন্তানের কথা শুনে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তোমার অষ্টাঙ্গ বিকৃত হোক। সেই অভিশাপের সূত্রেই অষ্টঅঙ্গ বিকৃত সন্তানের জন্ম হয় এবং তিনি অষ্টাবক্র নামে পরিচিত হন।

একসময় জনকরাজাকে যিনি সন্তুষ্ট করতে পারতেন তার কোনও অভাব থাকত না। অভাবের তাড়না থেকে মুক্ত হবার জন্য কহোড়মুনি একদিন জনকরাজার রাজসভায় যান। কিন্তু রাজাসভার সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত হন। তখন কহোড়মুনিকে বরুণের সেবায় নিযুক্ত করা হয়।

অষ্টাবক্রের বয়স যখন বারো বছর তখনই তিনি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। সেই সময় তিনি তাঁর মা সুজাতার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারেন। মায়ের কাছে থেকে সবকিছু শোনার পর সেখানে চলে যান। কিন্তু দ্বাররক্ষী তাঁকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেননি। বালক তখন স্বয়ং রাজাকে পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট করেন এবং রাজসভায় প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। রাজার অনুমতিক্রমে সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শর্ত ছিল, যদি অষ্টাবক্র সভাপণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করতে পারেন তাহলে তাঁর বাবাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

শাস্ত্রযুদ্ধে সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাজিত করেন বালক অষ্টাবক্র। ছেলের এহেন

সাফল্যে মুক্ত কহোড়মুনি তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, তুমি সমঙ্গ নদীতে স্নান করলে তোমার অঙ্গ-বিকৃতি দূর হয়ে যাবে। সমঙ্গ অর্থাৎ সমান গতিতে যে নদী বয়ে চলেছে এমন জলতরঙ্গের সন্ধান করতে করতে অষ্টাবক্র ডিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে এসে তিনি দেখলেন, পূবদিকে জঙ্গলের মধ্যে আটটি কুণ্ড অর্থাৎ জলধারা রয়েছে, যেখান থেকে জলপ্রবাহ বয়ে চলেছে। তিনি আরও দেখলেন, সাতটি কুণ্ডের জল গরম আর একটি কুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। এই সাতটি কুণ্ডের জলধারা একটি জায়গায় মিলিত হচ্ছে। অষ্টাবক্র সেখানে স্নান করে তাঁর শরীরের বিকৃতি থেকে মুক্তি পান।

অবশ্য এ সম্পর্কে অন্য জনশ্রুতিও শোনা যায়। শরীরের গঠন অনুযায়ী ইড়া পিঙ্গলা হচ্ছে নদীর মতো আশ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে তার জলধারা। একদিন এই শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর থেকে একুশহাজার ছ'শ বার বের হয়। মুনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

অষ্টাবক্র একদা ডিহি গ্রামে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গের সন্ধান পান। কয়েক হাজার বছর তিনি এখানে শিবের সাধনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব 'তুমি সব শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হও'—এই বর দেন। অষ্টাবক্রামুনির নামানুসারে এই শিবের নাম হয় বক্রনাথ এবং ডিহি গ্রামের নামকরণ করা হয় 'বক্রেশ্বর'।

এই গ্রামেই অষ্টাবক্রমুনির সিদ্ধিলাভের পর অনেক সাধক এখানে এসে সাধনা করেছেন। তাঁদের অনেকেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

দক্ষযজ্ঞের পর সতীহারা শিব পাগলের মতো স্ত্রীর দেহ কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় সুদর্শন চক্র দিয়ে সতী'র তিনটি চোখ কেটে ফেলেন। দেবীর তৃতীয় নয়ন পড়েছে এই বক্রেশ্বর তথা ডিহি গ্রামে। তাই দেবী এখানে মহিষমর্দিনী।

বাবা বক্রেশ্বরকে কেন্দ্র করে পাঁচটি শিব আছেন। কুবেরেশ্বর আছেন দক্ষিণ দিকে। সিদ্ধেশ্বর আছেন নাটশালার উত্তরদিকে। জ্যোতিলিঙ্গেশ্বর আছেন শ্বেতগঙ্গার উত্তর পূর্বদিকে। কালারুদ্রেশ্বর আছেন ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে আর জম্ভেশ্বর আছেন বক্রেশ্বরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে। এখানেই আছে আটটি জলের কুণ্ড। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন, ভৈরবকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জীবৎসকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, ব্রহ্মাকুণ্ড এবং শ্বেতকুণ্ড।

জনশ্রুতি আছে, কোনও একসময় ভৈরবদেব তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন, যার জন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি দেখে ভৈরবদেব কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি শান্তির উদ্দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে শুরু করেন। একসময় বক্রেশ্বরে এসে কুণ্ডের জলে স্নান করে তপস্যা শুরু করেন। তারপর তাঁর মন শান্ত হয়। সেই থেকে এই কুণ্ডের নাম হয় ভৈরবকুণ্ড। এখানে জলের উষ্ণতা ৬৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

আর একটি কুণ্ডের নাম ক্ষারকুণ্ড। একবার দৈবশক্তিতে বলীয়ান জনৈক মুনি সমুদ্রের সব জল পান করতে শুরু করেন। তখন মুনির ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রের নুন কুণ্ডের

জলের আশ্রয় নেওয়ায় সেখানকার জল ক্ষারে পরিণত হয় এবং এই জায়গাটি ক্ষার কুণ্ড নামে পরিচিত হয়। এখানকার জলের উষ্ণতা ৬৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

অগ্নিকুণ্ডের নামকরণের সঙ্গে ভগবান নৃসিংহ ও হিরণ্যকশিপু'র নামও জড়িয়ে আছে। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করার জন্য ভগবান, নরসিংহ রূপ ধারণ করেন। তপ্ত অবস্থায় ভগবান নরসিংহ বক্রেশ্বরের কুণ্ডে স্নান করার পর তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হয়। তখন থেকে ওই কুণ্ডের নাম হয় অগ্নিকুণ্ড। এই কুণ্ডের জলের উষ্ণতা ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

বক্রেশ্বরের আর একটি কুণ্ডের নাম জীবৎসকুণ্ড। আশ্চর্যজনকভাবে এখানকার জল সবসময়ে ঠাণ্ডা থাকে এবং কোনও সময়েই এখানকার জল বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। এই কুণ্ডের নামকরণের ক্ষেত্রেও এক অলৌকিক জনশ্রুতি আছে। বাল্মীকি আশ্রমে শিক্ষা নেওয়ার পর ব্রাহ্মণ-সন্তান সর্বজয়া এবং ক্ষত্রিয়-সন্তান মধুকর তীর্থ ভ্রমণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁদের গুরু বলেন, তোমাদের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তারপর তোমরা তোমাদের সংসার জীবন শুরু করতে পারবে। গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে বিভিন্ন তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে একসময় তাঁরা বক্রেশ্বরে এসে উপস্থিত হন। সেখানে দু'জনেই মহাদেবের কৃপালাভের জন্য সাধনায় ব্রতী হন। একদিন মধুকর পুজোর জন্য বেলপাতা সংগ্রহ করতে যান।

দীর্ঘক্ষণ সময় পার হয়ে যাবার পরে সর্বজয়া তাকে খুঁজতে বের হন। একসময় তিনি দেখেন বেলগাছের তলায় দিবাকর মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। আর্তনাদ করে ওঠেন সর্বজয়া, তখন সেখানে ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হন বাবা বক্রেশ্বর। তিনি সর্বজয়াকে বলেন, তুমি দিবাকরকে কুণ্ডের জলে স্নান করালে ও প্রাণ ফিরে পাবে। সর্বজয়া দিবাকরকে কুণ্ডের জলে স্নান করানোর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণ ফিরে পায়। সেই থেকে ওই কুণ্ডের নাম হয় জীবৎস কুণ্ড। ইদানীংকালে অনেক মেয়েরা, যাদের সন্তান হয় না, তারা এই কুণ্ডে স্নান করে বাবা বক্রেশ্বরের পুজো দিয়ে সন্তান কামনা করেন।

বক্রেশ্বরের অন্যতম একটি কুণ্ডের নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। এখানকার জলের তাপমাত্র ৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বিশেষ বিশেষ তিথিতে সূর্যোদয়ের আগে থেকে দুধ মেশানো জলের যেমন হালকা সাদা রং হয়, তেমনই এই কুণ্ডের জল সেরকম আকার ধারণ করে। আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তা ক্রমশ মিলিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, যাদের ভাগ্যে থাকে তাঁরাই এই বিরল দৃশ্য দেখতে পান। কথিত আছে এক সময় পার্বতীর ইচ্ছা ছিল রূপবতী হওয়ার আর সেইজন্য তিনি বক্রেশ্বরে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তপস্যার সময় তিনি এই কুণ্ডের জল ব্যবহার করতেন। একসময় তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহাদেব পার্বতীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন থেকেই এই কুণ্ডের নাম হয়, সৌভাগ্য কুণ্ড।

বক্রেশ্বরের সূর্যকুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ৬১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই কুণ্ডকে আবর্তিত

করেও নানান কাহিনী শোনা যায়। শোনা যায়, এক সময় নাকি বিন্ধ্য পর্বত ভীষণ রেগে যান, যার জন্য তিনি ক্রমশ তার উচ্চতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। এই অবস্থা এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে, সূর্যদেবের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থার নিরসনে সূর্যদেব বক্রেশ্বরে এসে বক্রনাথের সাধনা শুরু করেন। দীর্ঘদিন সাধনায় বক্রনাথ সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেবকে এমন বর দেন যে, বিন্ধ্য পর্বতের মাথা নিচু হয়ে যায়। যেহেতু এই কুণ্ডের পাশে সূর্যদেব সাধনা করেছিলেন, সেইজন্য এর নাম হয় সূর্য কুণ্ড।

এখানেই আছে ব্রহ্মকুণ্ড। এখানকার জলের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। স্বয়ং ব্রহ্মা একবার কামদেবের কবলে পড়েন। তখন একদিন কামনার জ্বালায় নিজের মেয়ে সন্ধ্যার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে এগিয়ে যান। ব্রহ্মার ছেলেরা বাবার এই অবস্থা দেখে হাতজোড় করে তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন করেন। তখন তিনি (ব্রহ্মা) নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বক্রেশ্বরে এসে কুণ্ডের জলে স্নান করে পাপমুক্ত হন। সেই থেকেই কুণ্ডের নাম হয় ব্রহ্মাকুণ্ড।

শ্বেতকুণ্ড বক্রেশ্বরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কুণ্ড। এখানকার জলের উষ্ণতা ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এখানকার জলের বক্রেশ্বরের অধীশ্বরদের ভোগ রান্না হয়।

অনেকদিন আগে এখান থেকে ৪০ মাইল দূরে মণ্ডলকোটে শ্বেত রাজার রাজধানী ছিল। ধার্মিক ও ঈশ্বরপ্রেমিক হিসেবে শ্বেতরাজার পরিচিতি ছিল। শোনা যায়, প্রতিদিন তিনি মঙ্গলকোট থেকে বক্রেশ্বরকে দর্শন করতে আসেন। শ্বেতরাজার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বাবা বক্রেশ্বর দর্শন দেন এবং বর প্রার্থনা করতে বলেন। শ্বেতরাজা প্রার্থনা করে বলেন, শেষদিনে যেন তোমার চরণে স্থান পাই। পূর্ণ হয় রাজার প্রার্থনা। সেই থেকে এখানকার নাম হয় শ্বেতগঙ্গা।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মহামুনি অষ্টাবক্র ও সংহিতা' বই-এর মাধ্যমে অষ্টাবক্রমুনির সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বাশ্রমে মুনির নাম ছিল 'সুব্রত ঋষি'। তিনি ছিলেন রাজাপুত্র, তাঁকে দেখতেও ছিল খুব সুন্দর। প্রবাদ আছে, সূর্যবংশের কোনও রাজার দুই মহিষী কেশীনি ও সুমতির অভিশাপে পরজন্মে অটাঙ্গবক্র হয়েছিলেন (সুব্রত ঋষিই)। কোশল রাজ্যের অবস্থান ছিল তমসা নদী ও সরযূ নদীর ব্যবধানে। সরযূ নদীর তীরে ছিল সুব্রত ঋষির আশ্রম। দুই রাজ মহিষী প্রতিদিন সকালে সরযূ নদীর তীরে স্নান করতে আসতেন। এবং ঋষি আশ্রমের কাছে নদীর তীরে শিবলিঙ্গে শিবপুজো করে রাজবাড়িতে ফিরে আসতেন। সুব্রত ঋষিও স্নান ও তর্পণ করতেন সরযূ নদীতে। একদিন ওই দুই রানী যখন নদীতে স্নান করছিলেন এমনসময় ঋষি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে দুই রানী অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমার সুন্দর দেহ যেন বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। তাঁদের সেই অভিশাপ আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেন ঋষি। পরবর্তী সময়ে ওই রাজ্যের রাজা হন কৌশল বা কুশল। তাঁরই নাম অনুসারে

রাজ্যের নাম হয় কোশল। বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আড়াই হাজার বছর আগে এই জায়গাটি খুবই 'সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল।

অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, বাবার অভিশাপে ছেলে হয়ে যান অষ্টবক্র। বেদের সঙ্গে এই ঘটনার সংযোগ আছে। মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে সন্তান তার বাবার বেদ তত্ত্বের ভুল ধরেন। বাবা সে কথা শুনে কোনও কিছু না দেখে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তোমার রূপ সৌষ্ঠভ অলংকারাদি সকলই বিকল হউক। এই ঘটনায় মা কৌশির কাঁদতে কাঁদতে সুতিকাগারে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করেন। একসময় তিনি শুনলেন আকাশবাণী 'তোমার পুত্রে আমার সকল আশীর্বাদ বর্তাবে।'

শিশু ক্রমশ বড় হতে থাকে। যখন তাঁর পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেন জামদগ্ন ঋষি। শিশু যাই শুনত তাই তাঁর মনে গেঁথে যেত। একদিন গুরুদেব তাঁকে অঙ্কশাস্ত্র সম্পর্কে শেখানোর জন্য ডাকলেন তখন তিনি বললেন, 'গুরুদেব আমার অঙ্কশাস্ত্র মোটেই ভালো লাগে না। আমার পূর্ব হইতেই যোগ আছে বিয়োগ নাই।'

শিশুর গর্ভ ধরে আট বছর বয়সে জামদগ্ন ঋষি তাঁর উপনয়ন এবং ব্রহ্মদীক্ষা দিলেন। রাজপুত্র হয়েও তাঁর কিন্তু রাজকীয় জীবন ভালো লাগত না। তাই তাঁর কাছে একমাত্র পথ খোলা ছিল, তা হল 'ব্রহ্মচর্য'। সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার সাধনপথ হল, অষ্টমার্গ। অষ্টমার্গ পথগুলি হল, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি। এই সাধনার জন্য কিশোরের প্রয়োজন ছিল একজন সৎ গুরুর। একসময় শুরু হল সেই অন্বেষণ। অবশেষে তিনি সন্ধান পেলেন সাধনপথের গুরুর, বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাবক্র মুনি কর্মযোগের মাধ্যমে উপাসনার পথ খুঁজে পান। এই সময়ে হয়ত বা তার আগে থেকেই মুনিকে মানসিকভাবে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন 'সুপ্রভা' নামে দীর্ঘতপা জনৈকা ঋষিকন্যা। অনেক রাজা-মহারাজা তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেও তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হননি।

দেবতারা যুক্তি করে তাঁর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। নারদ মুনি ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেখানে আসেন, সঙ্গে নিয়ে যান অষ্টাবক্র মুনিকেও। সকলকে অবাক করে দিয়ে ঋষিকন্যা অষ্টাবক্র মুনিকেই পতিত্বে বরণ করেন। যোগেই যার জন্ম, তাঁর কি কেউ কোনোদিন বিয়োগ ঘটাতে পারে। তাই সংসার করার বাসনা তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। অন্যদিকে গুরুর কৃপায় তিনি জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেন। দর্শন করেন পরমেশ্বরকে। তিনি আরও বুঝতে পারেন, কর্ম ও জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকৃতি ও পুরুষ, গুণত্রয়ের তফাত, ক্ষর-অক্ষর, পুরুষোত্তম দৈব ও অসুর এবং শ্রদ্ধাত্রয়ের পার্থক্য। তাঁর গুরুদেব, সরযূ নদীর তীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেন এবং তিনি সেই আদেশ পালন করেন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, মহাযোগী অষ্টাবক্র মুনি কেন বীরভূমে এসেছিলেন? গুরুদেব

তাঁকে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন, তার মূল কারণ হল তাঁর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া। বৃদ্ধ বয়সে মহাযোগী বক্রেশ্বরে আসেন তখন সেখানে আবির্ভূতা হন দেবী মহিষাসুরমর্দিনী। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় স্বয়ং দেবাদিদেব সেখানে 'বক্রনাথ' রূপে অবস্থান করতে সক্ষম হলেন। সাধনতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছানোর পর 'তারকব্রহ্ম' নাম করতে করতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে অষ্টাবক্র মুনির মহাপ্রয়াণ হয়।

মহাযোগী অষ্টাবক্র যখন সরযূ নদীর তীরে থাকতেন তখন জনক রাজা তাঁর কাছে দীক্ষা নেন।

এখন বক্রেশ্বরে অষ্টাবক্র মন্দির হয়েছে। চত্বরের পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল বটুকভৈরব এবং বক্রনাথ শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছেন চারটি শিবলিঙ্গ। কুবেরেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, জ্যোতি লিঙ্গেশ্বর, রুদ্রেশ্বর—এগুলি আলাদা আলাদা মন্দিরে রয়েছে। বক্রেশ্বরকে চারভাগে ভাগ করা যায়—

(১) শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর (২) শক্তিতীর্থ বক্রেশ্বর (৩) বৈষ্ণবতীর্থ বক্রেশ্বর (৪) যোগতীর্থ বক্রেশ্বর।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'মহামুনি অষ্টাবক্র ও সংহিতা' বইতে এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, শৈবতীর্থ বক্রেশ্বরে মনশ্চক্রে ভ্রূমধ্যের মনস্থিত অর্থাৎ এক লক্ষ্যবস্তুতে ধরার জন্য মনকে স্থির করার প্রকৃষ্ট স্থান। কারণ, সতী'র মন, মতান্তরে ভ্রূমধ্য, বক্রেশ্বরেই পড়েছে। ভৈরব এখানে বক্রনাথ হিসাবে অবস্থান করছেন।

বক্রেশ্বরকে শৈবতীর্থ ও শক্তিতীর্থ দু'ভাবেই অভিহিত করা হয়। মহামুনি অষ্টাবক্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন মিথিলার রাজা 'জনক'। অষ্টাবক্র মুনি শিষ্য জনককে বৈরাগ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেন এবং সংসারে থেকেও যোগমার্গে বিচরণ করে কীভাবে মোক্ষলাভ করা যায়, সে-বিষয়েও নানান উপদেশ দেন। 'জনক' রাজা বক্রেশ্বরে বেশ কিছুদিন সাধনার উচ্চমার্গের বিচরণ করে মিথিলায় ফিরে যান।

কেউ কেউ বক্রেশ্বরকে যোগতীর্থ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। কারণ, এখানে বিয়োগের কোনও অস্তিত্ব নেই। এখানে যোগীদের শক্তি একত্রিত হয়ে 'বিষ্ণু সম' হয়।

অনেকের বিশ্বাস, বক্রেশ্বরকে অবশ্যই বৈষ্ণবতীর্থ বলেও অভিহিত করা উচিত। একই সঙ্গে তাদের মতে, এই স্থানটিকে শক্তিতীর্থ বলা যায়। দেবী দুর্গাকে জগন্মাতা রূপে যুগে যুগে সাধনা করেছেন সাধক— সাধিকরা। এজন্যই ওই মহান সাধক সাধিকার দেবী দুর্গার মধ্যে একেধারে মহাশক্তির আবেশ এবং অন্যদিকে বৈষ্ণবীর সমস্ত লক্ষণ দেখেছেন।

বীরভূমের অনেক জায়গা খুঁড়ে আদিমযুগের ব্যবহার করা জিনিস ও পাথরের মূর্তির সন্ধ্যান পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলে রামকবি বিষ্ণুপাল রচিত পুঁথিতে লেখা আছে—

খুড়িয়া উভয় কর বন্দে প্রভু বক্রেশ্বর।

বন্দ অষ্টাচক্র মহামুনি।
জাবর্দ্ধ্যান তেজবান সর্ব্বতীর্থ মহীতলে
গঙ্গা যাইলা বহিএগ্রা উজানে।
শ্বেতগঙ্গা ধরিনাম এক আসে অগ্নিধাম
তার মধ্য স্থানে যমদ্বার
তাহাতে হইলে পার নাহি যমের অধিকার
যাইতে সাহসী হয় জীব
শিবের নিকট দিয়া যোগবতী যায় বইয়া
অগ্নিকুণ্ডে হয় অগ্নিলাভ॥

অষ্টাবক্রমুনি বলেছেন, আত্মাকে চেন। একমাত্র আত্মাই অবিনশ্বর। দেহরূপ খাঁচার পতন হয় কেননা তাঁর বৃদ্ধি আছে, তেমনই ক্ষয় আছে। সংহিতায় আরও বলা হয়েছে, বিষয় বিষকে সব সময় চিহ্নিত করে নিজেকে অনুভব করতে হবে। আমি'র কোনও আকৃতি নেই বা তার কোনও প্রাণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই আমি সমুদ্রমাবিষদ্। তাই যিনি পরমাত্মা ও পরমেশ্বরকে অভেদ কল্পনা করে সবসময় তাঁর পূজায় মগ্ন থাকেন, তাঁর ভজনা করেন এবং তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকেন কোনো কিছুতেই তার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে না। যখন 'আমি' ভিন্নজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তখন আত্মাভিমানে পূর্ণ হলেই সৃষ্টি হয় 'বন্ধন'। কিন্তু আত্মাভিমানশূন্য হলেই 'মোক্ষ' লাভ সম্ভব হয় অর্থাৎ নিরহঙ্কার ও পঞ্চবিধ গুণ থেকে আসক্তহীন হতে পারলেই জীব সুখ অনুভব করে। অষ্টাবক্র সংহিতায় বলা হয়েছে, প্রশংসায় যার আনন্দ হয় না, নিন্দায় যার রাগ হয় না, মরণে যার উদ্বেগ সৃষ্টি হয় না, পাণ্ডিত্য আছে অথচ যিনি নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করেন না, তিনিই প্রকৃত সুখী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন।

রাজা জনক এক সময় মহামুনি অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রভু কীভাবে জ্ঞান লাভ এবং মোক্ষলাভ করা যায় এবং আর কীভাবে মোক্ষলাভ করা সম্ভব, কোন উপায়ে হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়?

মহামুনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, যদি মুক্তির বাসনা হয় তাহলে বিষের মতো বিষয়বাসনা ত্যাগ করে ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্যকে অমৃত হিসাবে বিবেচনা কর। আত্মা পৃথিবী নয়, জল নয়, আগুন নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয় আর আমাদের এই দেহও আত্মা নয়। আত্মা সব সময়েই সাক্ষীস্বরূপ, বিভু (সর্ব্বব্যাপী), পূর্ণ (সর্ব্বৈশ্বর্য্য যুক্ত), এক(অদ্বিতীয়)মুক্ত (নির্লিপ্ত), চিৎস্বরূপ, অক্রিয়, অসঙ্গ স্পৃহাশূন্য ও শান্ত। যেখানে যেখানে (তোমার) বাসনার প্রকাশ হবে অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে স্পৃহা জাগবে, তখনই (তুমি) সংসারী হিসাবে গণ্য হবে। কারণ, সংসারের মূল সূত্র হল কামনা। এই কামনা তথা ভোগের ইচ্ছা হল বন্ধন আর তার বিনাশ হলেই মুক্তিলাভ সম্ভব। যিনি সংসারী মানুষের মতো ব্যবহার করেও সব বিষয় থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখেন, তিনিই মহা

হ্রদের ন্যায় ক্ষোভশূন্য এবং ক্লেশহীন অবস্থায় বর্তমান থাকেন।

অষ্টাবক্রমুনির পরে অনেকেই বক্রেশ্বরে এসে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অঘোরীবাবা। তাঁর শরীর ছিল যথেষ্ট লম্বা চওড়া। অনেক তীর্থ ঘুরে তিনি বক্রেশ্বরে আসেন। সেই সময় বক্রেশ্বর মহাশ্মশান ছিল এখনকার মেয়েদের স্নানের ঘাটের পাশে। সেখানে খুব বড় একটি অশ্বত্থগাছ ছিল। ওই গাছের তলায় তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন। চারদিকে পড়ে থাকত মড়ার খুলি। অঘোরীবাবা সবাইকে ভালোবাসতেন কিন্তু সহজে ধরা দিতেন না। তাঁর আহার ছিল শ্মশানে অর্ধদগ্ধ নরমাংস আর মদ। শোনা যায়, একদিন কলকাতার কয়েকজন যুবক মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে অঘোরীবাবাকে খেতে দেয়। বাবা ওই যুবকদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বলেন, 'আমি মদ খাই না, মায়ের নামে সুধা পান করি, বুঝলি এবং তাদের দেওয়া খাবার খেয়ে নেন। এরপর একটি পোড়া কাঠ নিয়ে তিনি ওই যুবকদের মারতে যান। তখন তারা পালিয়ে যান। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়। ভক্তের ওই আশ্রমেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করেন।

বক্রেশ্বরে সিদ্ধ হওয়া খাঁকিবাবা ছিলেন শিবের সাধক। তাঁর শরীর ছিল দীর্ঘ। তিনি ঢিলা পোশাক ব্যবহার করতেন। কোনও ভক্ত তাঁর কাছে গেলেই তিনি খেঁকিয়ে উঠতেন। তাই ক্রমে তিনি খেঁকিবাবা থেকে খাঁকিবাবা নামে পরিচিত হন। খাঁকিবাবার উদ্যোগে সেবায়েতরা সতীর দেহখণ্ডের শিলা যেখানে পড়েছিল তার ওপর ধাতুর মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি স্থাপন করেন।

উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন এই মহাযোগী। কখনও সখনও তাঁকে শ্বেতগঙ্গার জলে যোগাসনে বসে থাকতে দেখা যেত। একসময় কিছু মানুষ তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করে। একদিন রাতে তারা বাবা'র গুহায় হত্যার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে দেখে তাঁর দেহ তিনখণ্ড হয়ে তিন জায়গায় পড়ে আছে। পরের দিন সকালে আবার তাঁকে সশরীরে দেখা যায়। এরপর এই দুষ্কৃতীরা খাঁকিবাবার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবাও তাদের ক্ষমা করে দেন। এরপর কিছুদিন বক্রেশ্বরে থাকার পর তিনি বৈদ্যনাথ ধামে দেহত্যাগ করেন। ভক্তেরা তাঁর দেহ সেখান থেকে নিয়ে এসে বক্রেশ্বরে শ্বেতগঙ্গার উত্তরদিকে সমাধিস্থ করেন। পরবর্তী সময়ে সেখানে সমাধিমন্দির তৈরি হয়। ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ তাঁর জীবনাবসান হয়।

কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটের হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় খাঁকিবাবার ভক্ত ছিলেন। বাবার ইচ্ছানুসারে শ্রী মুখোপাধ্যায় একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩১ আষাঢ় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু একসময় বক্রেশ্বরে এসেছিলেন। হাড়াই পণ্ডিত এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে বসবাস করতেন। তাদের সাতটি ছেলে হয়। তারা হলেন, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, সর্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। নিত্যানন্দ ছোটবেলা থেকে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আজন্ম প্রেম

লক্ষ্য করে অভিভূত হন গ্রামের মানুষজন। বাংলা ৮৮০ সালে এবং ১৩৯৫ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। নিত্যানন্দের উপনয়নের পর এক সন্ন্যাসী তাদের বাড়িতে আসেন, এবং তাঁকে দীক্ষা দেন। সন্ন্যাসীর নাম শ্রীপদ ঈশ্বরপুরী। কিছুদিন পরে তিনি নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বের হন। বৃন্দাবনে থাকার সময় কৃষ্ণ দর্শনের জন্য নিত্যানন্দের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে নির্দেশ দেন বিয়ে করে সংসারধর্ম পালন করার।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ কালনার সূর্য দাস পণ্ডিতের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহ্নবীকে বিয়ে করে খড়দহে বসবাস করতে শুরু করেন। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়। ছেলের নাম বীরচন্দ্র এবং মেয়ের নাম গঙ্গা। বক্রেশ্বরে নিত্যানন্দ প্রভু'র বক্রেশ্বরে আগমনকে উপলক্ষ করে ভক্তেরা শ্বেতগঙ্গার উত্তরদিকে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ বুধবার সকালে সিউড়ির ভবানীশঙ্কর দাসের বাড়ি (জগদীশ ভবন) থেকে কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে বক্রেশ্বরে এসেছিলেন শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কার নাথ। সেবায়েত ভোলানাথ চক্রবর্তী তাঁকে মন্দির দর্শন করান।

প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে এই পীঠের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরে উল্লিখিত হয়েছে। শিবচরিতে বক্রেশ্বরের নাম করেই পীঠবর্ণনা করা হয়েছে। পীঠ নির্ণয়ের মতে, এখানে দেবী সতীর মন পড়েছিল। কিন্তু অনেকের মতে, এখানে সতীর ভ্রূ-মধ্য পড়েছে। মন্দিরে যে অষ্টাধাতুর দেবীমূর্তি আছে সে ছাড়াও ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামে পাণ্ডার বাড়িতে আর একটি মূর্তি আছে। এই দুটি মূর্তি তৈরির পিছনে রয়েছে এক বিচিত্র ঘটনা। গৌড়ে সুলতানের সেনাপতি কালাপাহাড় একবার রাজনগরের পথে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কালাপাহাড়ের ভয়ে পূজারিরা অষ্টাদশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি একটি পুকুরে ডুবিয়ে রেখে পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে পুকুর সংস্কারের সময়ে মূর্তিটি পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে বক্রেশ্বরের মন্দিরে আর একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তখন জনৈক পূজারি পাথরের প্রাচীন মূর্তিটিকে ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামে তাদের বাড়িতে রেখে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করেন।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : রেলপথে বোলপুর, সিউড়ি বা দুবরাজপুর হয়ে বাসে অথবা গাড়িতে বক্রেশ্বরে যাওয়া যায়।

সৃষ্টিতীর্থ কামাখ্যা

১৯৮২ সাল। প্রথমবার পা রাখলাম অসমের মাটিতে। একটি বিশেষ কাজে দু'দিন সেখানে থাকার কথা। সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন। সংখ্যাধিক্যের জয় সর্বত্র। এক্ষেত্রেও তাই হল। দু'জনে সিদ্ধান্তে তৃতীয়জনও সঙ্গী হলেন গুয়াহাটির কামাক্ষা মন্দিরে। সময় বিকেল তিনটে। পা চালাতে হল তাড়াতাড়ি। কারণ, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। পাহাড়ের নীচে অবধি যাওয়ার জন্য যানবাহনের অভাব নেই। আজকাল পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের চাতালের কাছে বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড় কেটে তৈরি করা রাস্তা বেশিদিনের নয়। অতীতে হেঁটে উঠতে হত। এখনও কোনও কোনও পুণ্যার্থী বেশ পুণ্য অর্জনের তাগিদে হাঁটা পথ দিয়ে নীলাচল পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত মন্দিরে এসে পৌঁছান।

এক সময় এসে পৌঁছালাম মন্দিরের ভিতরে, অনেকটা নীচে। পাণ্ডাদের হাঙ্গামা নেই। বাড়তি তাগাদা নেই পুজো করিয়ে দেওয়ার জন্য। চারদিকে অর্থাৎ মন্দিরের চাতালে অবাধে, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অগুণতি পায়রা। জানা গেল, এদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাদের আর কেউ নিপীড়ন করতে পারবে না।

সতীর অঙ্গ এখানে পড়ায় জায়গাটি মহাপীঠে পরিণত হয়েছে। এখানে পড়েছে তাঁর যোনিমণ্ডল, তাই এই জায়গাকে বলা হয় 'সৃষ্টিতীর্থ'। দেবী কামাখ্যা। যোনিমণ্ডলের দৈর্ঘ্য একবাহু, প্রস্থে দ্বাদশ আঙ্গুলি, যোনি মধ্যে আপাতাল জল। পুরোহিতের নির্দেশে সেই জল স্পর্শ করে মাথায় দেওয়ার সময় নাকে ভেসে এল এক বিচিত্র গন্ধ, যা সম্ভবত বিবাহিতরাই অনুভব করতে পারবেন। বুঝতে অনুবিধা হয়নি, এখানে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন দেবী কামাক্ষা। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম সোনার টোপর দিয়ে ঢাকা আছে যোনিমণ্ডল।

কামরূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান পৌরাণিক কাহিনী। এখানকার যে সবচেয়ে প্রাচীন রাজার কথা জ।না যায়, তার নাম মহিরঙ্গ দানব। একই বংশে ছিলেন, হটক অসুর, সম্বর অসুর ও রত্ন অসুর। ঐতিহাসিকদের অনুমান, যেখানে তাদের নামে 'অসুর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই তারা ছিলেন অনার্য।

যেনিমণ্ডল কামরূপে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের রং হয়ে যায় নীল এবং তার ভার সহ্য করতে না পেরে ক্রমশই তা পাতালে চলে যেতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাদের শক্তি দিয়ে পাহাড়ের পতনরোধ করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছু হল না। তখন ভার বহনের দায়িত্ব স্বয়ং মা কামাক্ষা। একসময় এই পাহাড়ের উচ্চতা ছিল একশো যোজন। এখন মাত্র এক ক্রোশ উচ্চতায়, বিরাজ করছে। তিন ভাগে বিভক্ত এই পাহাড়। পূর্বদিকে ব্রহ্মা পাহাড়, মধ্যিখানে শিব পাহাড় বা নীল পাহাড় আর পশ্চিমদিকে বিষ্ণু বা বরাহ পাহাড়। সমগ্র নীল পাহাড়কে অনেকে কামাখ্যা পাহাড় বলে থাকেন।

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকুট রহোগতা॥
কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গানাশিনী যস্মাৎ
কামাখ্যাতেন চোচ্যতে॥

অর্থাৎ 'এই মহাদেবী অভিলাষ পুরাণের জন্য আমার সঙ্গে নীলকুটে আসায় নাম লাভ করেছেন কামাখ্যা। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামদায়িনী আবার কামনানাশিনী। এজন্যই দেবীকে বলা হয়, কামাখ্যা। পাহাড়ের যেখানে যোনিমণ্ডল পড়েছিল তার নাম কুব্জিকা। বলাবাহুল্য, সেখানে পড়ামাত্রই তা পাথরে পরিণত হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস, এই যোনিমণ্ডলের ওপরে লোহা রাখা হলে মুহূর্তে তা ছাই হয়ে যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যোনিমণ্ডলের পরিমাণ হল, দৈর্ঘ্যে ২১ আঙ্গুল, বিস্তৃতি প্রস্থে ১/২ (আধ) হাত। মা কামাখ্যা প্রতিদিন পূজিত হন, পঞ্চ কামিনীরূপে। তাঁকে বলা হয় কামাখ্যা, ত্রিপুরী, কামেশ্বরী, সারদা এবং মহোৎসাহা। মায়ের চারদিকে আছেন আটজন যোগিনী—বিন্ধ্যাবাসিনী, ধনস্থা, দীর্ঘেশ্বরী, কটিশ্বরী, গুপ্তকামা, শ্রীকামা ও পাদদুর্গা। যোনি ঢাকা থাকে লালশালুকে। কারও কারও ধারণা, প্রতিমাসে কামাখ্যা মা এখানে রজস্বলা হন। অন্নদামঙ্গলে বলা হয়েছে,

মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়।
রামানন্দ ভৈরব কামাখ্যা দেবী তায়॥

সতীর দেহ শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মহাদেব ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু ধ্যান ভাঙার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তখন দেবতারা সেই ধ্যান ভাঙানোর জন্য কামদেবকে পাঠালেন। কিন্তু মহাদেবের তেজে তিনি ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। তখন তাঁর স্ত্রী দেবাদিদেবের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। প্রাণ ফিরে পেলেও আগের আকৃতি ফিরে না পাওয়ায় স্বামী স্ত্রী যৌথভাবে মহাদেবের আরাধনা শুরু করেন। দেবাদিদেব তখন কামদেবকে বললেন, তুমি নীলপর্বতে যোনিমঙ্গলের পাথরের মন্দির তৈরি করে দাও। মন্দির তৈরির কাজ যেদিন শেষ হবে, সেদিনই তুমি তোমার আগের চেহারা ফিরে পাবে। কামদেব শিবের আদেশে নীলপর্বতে সেই মন্দির তৈরির পর তাঁর আগের রূপ পেয়েছিলেন।

ওই মন্দিরের গায়ে চৌষট্টি যোগিনী ও অষ্টাদশ ভৈরবের মূর্তি খোদাই করা ছিল। কালে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। মন্দিরের কোনও চিহ্নই প্রত্যক্ষ করা যেত না। জায়গাটি ক্রমেই বিশাল জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে তখন বসবাস করত কোচ মেষজাতীয় অনার্য মানুষেরা। কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহের পরাক্রম নিয়ে কারও মধ্যে কোনও সন্দেহ ছিল না। অসমের অনেক ছোট ছোট রাজা তাঁর অধীনস্থ ছিলেন। একসময় তারাই একত্রিত হয়ে বিশ্বসিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা করেন। বিশ্বসিংহ ও তাঁর ভাই শিবসিংহ বিদ্রোহী রাজাদের দমন করার জন্য পুবদিকে রওয়ানা হন। একসময় পথ হারিয়ে তারা নীলপর্বতের নীচে এসে উপস্থিত হন। তৃষ্ণার্ত হয়ে তাঁরা দু'ভাই কাছের মেষ বস্তিতে গিয়ে বটগাছের তলায় এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেলেন। তাঁর পরামর্শে রাজা ও তাঁর ভাই কাছের একটি টিবি ও ছোট ঝরনার জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। তারপর ওই বৃদ্ধা টিবি ও ঝরনার জল দেখিয়ে বললেন, সামনেই আমাদের আরাধ্য দেবতা আছেন। আপনারা তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করবেন তিনি তাই মঞ্জুর করবেন। রাজা প্রণাম করে সহচরদের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার অনুচরেরা সেখানে এসে উপস্থিত। দেবতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে রাজা ও তাঁর ভাই বৃদ্ধার কাছে পুজো দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বৃদ্ধা বললেন, পুজোর জন্য গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বলির জন্য ছাগ, সিঁদুর ও মেয়েদের পরিধেয় রক্তবস্ত্র ও অলংকার দিতে হবে। রাজা তখনই দেবীর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, যদি তিনি যুদ্ধে জয়ী হন তাহলে সোনার মন্দির তৈরি করিয়ে দেবেন। কথিত আছে, স্বয়ং মা কামাখ্যা বৃদ্ধার ছদ্মবেশে সেদিন রাজাকে উপদেশ দেন। যুদ্ধে জয়ী হবার পর রাজা পণ্ডিতদের আহ্বান করে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। পণ্ডিতেরা বললেন, নিশ্চয়ই ওই জায়গাটি একটি মহাপীঠ, যা এখন প্রকটিত হয়নি। তাঁর শাস্ত্র অনুসন্ধান করে জানালেন, ওই জায়গায় মা কামাখ্যার অবস্থান। দেবাদিদেব যখন সতীর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খণ্ডিত অংশগুলি বিভিন্ন জায়গায় ফেলেছিলেন তখন মায়ের 'যোনি' সেখানে এসে পড়েছিল।

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে,

"যত্র চ ভৈরবী দেবী যত্র নক্ষত্র দেবতা॥
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র, মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা।
বগলা, কমলে তত্রভুবনেশী সধুনিমী (সুধামিনী)।
এতানি নবপীঠানি শংসন্তি নবভৈরবাঃ।
এবং তু দেবতা সর্বা এবং তুদশ ভৈরবাঃ॥"

অস্ত্রচূড়ামণিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে শুধু কামাখ্যা নন, আরও আছেন ন'জন দেবী—শ্রীভৈরব, নক্ষত্রদেবতা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাম্বিকা, বগলা, কমলা, ভূবনেশী ও সধুমিনী। সব মিলিয়ে এখানে ভৈরবও আছেন দশজন। তবে মা কামাখ্যার ভৈরব

হিসাবে যাঁকে চিহ্নিত করা হয় তাঁকে সবাই উমানন্দ নামে ডাকেন। ব্রহ্মপুত্রের মাঝে পাহাড়ের মধ্যে তাঁর অবস্থান। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে শিবানন্দ, রামানন্দ বা রাবনানন্দ নামেও অভিহিত করে থাকেন।

রাজা বিশ্বসিংহের নির্দেশে তাঁরই লোকজন ওই বটগাছটি কেটে মাটির টিবি ও ঝরনার সন্ধান করতে শুরু করেন। বৃদ্ধারও অনেক খোঁজ করা হল। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। কিছুদিন খনন কাজ চালানোর পর যোনিমুদ্রাসহ মহাপীঠের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিন দিনের বেলায় যে ইট গাঁথা হয়, রাত্রিবেলা তা খসে পড়ে।

একদিন রাতে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, একজন কুমারী তাঁকে বললেন, তুমি যে সোনার মন্দির তৈরি করে দেবে বলেছিলে তার কী হল? রাজা বললেন, মা, এত সোনা তো আমার ভাণ্ডারে নেই। তাই কি করব? প্রত্যুত্তরে কুমারী বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য প্রতিটি ইটের সঙ্গে এক রতি করে সোনা দিও।

পরের দিন দেবীর আদেশ অনুযায়ী ওইভাবেই মন্দির তৈরির ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর রাজা হলেন নরনারায়ণ। তিনি মা কামাখ্যার পুজো দিয়ে যুদ্ধ করতে বেরোতেন। একবার নরনারায়ণের ভাই শুক্লধ্বজ গৌড়ের রাজা সুলেমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দি হয়ে যান। সেবার তাঁরা মায়ের পুজো দেননি। ইতিমধ্যে 'কালাপাহাড়' কামাখ্যা মায়ের মন্দির ধ্বংস করে দেন।

মায়ের অপার মহিমা নিয়ে শোনা যায় অনেক অলৌকিক কাহিনী। বন্দিশালায় শুক্লধ্বজ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মা কামাখ্যার চরণ ধ্যান করতে শুরু করেন। মা তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়ে বললেন, কালই তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করব। কাল রাজার মা'কে সাপে কামড়াবে। অনেক চিকিৎসা করিয়েই কোনও ফল হবে না। তখন তুমি রাজমাতাকে ভালো করে দিতে পারবে এবং সেইজন্য তোমার এব্যাপারে সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানাবে। তুমি ক্ষতস্থান স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজমাতা সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং তোমার মুক্তি হবে। পরের দিন হুবহু সেই ঘটনা ঘটল। রাজার মা সুস্থ হয়ে শুক্লধ্বজ ও নিজের ছেলের হাত একত্র করে বললেন, আজ থেকে সব ঝগড়া ভুলে গিয়ে তোমার সহোদর ভায়ের মতো বসবাস করবে। তারপর নিজের ছেলেকে আদেশ দিয়ে বললেন, মণিমাণিক্য ও সৈন্য দিয়ে শুক্লধ্বজকে নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা কর। কিন্তু শুক্লধ্বজ একটি সোনার ডম্বরু নিয়ে বললেন, আমার আর কোনও মণিরত্নের প্রয়োজন নেই। সবই আমাদের আছে। শুক্লধ্বজ রাজা নরনারায়ণকে সব কথা জানালেন। রাজার আদেশে আবার মন্দিরের পুনঃনির্মাণ শুরু হল। দেব-দেবীর পুজো করার জন্য গৌড়, কাশী, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণদের আনানো হল। তাঁদেরই বংশধরেরা এখন পাণ্ডা হিসেবে পরিচিত। সহজায়ন গ্রন্থ চতুষ্পীঠতন্ত্রে চার ধরনের পীঠ, আত্মপীঠ, পরপীঠ, যোগপীঠ এবং গুহ্যপীঠের কথা বলা হয়েছে। বজ্রসত্ত্ব বিভিন্ন ধরনের

যোগিনীদের সঙ্গে, উদাহরণস্বরূপ প্রজ্ঞাপারমিতা সঙ্গম করেছিলেন। এই সঙ্গমকে ঋষিরা অধ্যাত্ম সঙ্গম বলে চিহ্নিত করে থাকেন। প্রজ্ঞাপারমিতাকে আদিবুদ্ধের এক ধরনের গুণের প্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তাই যোগিনীদের এই গুণের বুদ্ধের সঙ্গমের ওপর নির্ভর করে আধ্যাত্মিক গুহ্যতত্ত্বের বিষয়টি সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। বৌদ্ধ তন্ত্রে আত্মপীঠ ও পরপীঠের বর্ণনা আছে। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদেব হেবজ্রতন্ত্রে এ-দেশের চারটি জায়গাকে পীঠস্থান বলা হয়েছে। সেগুলি হল, (১) জালন্দর (২) পূর্ণগিরি (৩) কামরূপ (৪) ওড়্ডিয়ান। কালিকাপুরাণেও বর্ণিত আছে চারটি পীঠের কথা। সেগুলি হল, (১) ওড্রা (২) পূর্ণ শৈল (৩) কামরূপ (৪) জালশৈল। তাদের মতে, পশ্চিমদিকে ওড্রা হল কাত্যায়নী ও জগন্নাথদেবের পীঠস্থান। অর্থাৎ হেবজ্রতন্ত্রের ওড়্ডিয়ান হল ওড়িশায়। দক্ষিণের পূর্ণশৈল পূর্ণগিরিতে দেবী পূর্ণশ্বরী ও ভগবান মহানাথের পীঠস্থান। (৩) কামরূপে দেবী কামেশ্বরী ও ভগবান উমানন্দের পীঠস্থান এবং জালশৈল অর্থাৎ জলন্ধরে দেবী চণ্ডী ও দেবাদিদেবের পীঠস্থান। বৌদ্ধ গ্রন্থ সাধনামালাতেও চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। তবে সেখানে একটিতে বাদ দিয়ে নতুন একটি পীঠকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে যে চারটি পীঠের উল্লেখ আছে, সেগুলি হল, (১) শ্রীহট্ট বা শিরিহট্ট (২) কামরূপ (৩) পূর্ণগিরি (৪) ওড়্ডিয়ান। জলন্ধরের পরিবর্তে এখানে শ্রীহট্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে সময় চারতন্ত্রে পীঠ বর্ণনায় বলা হয়েছে,

অথেদানিং প্রবশ্যামি জপার্থং পীঠমুত্তমম।
পূর্ণগিরিশ্চ প্রথমুড্ডিয়ানিং দ্বিতীয়কম।।
জালন্ধরং তৃতীয়শ্চ কামরূপং চতুর্থকম।

মোগল সম্রাট আকবরের দরবারের নবরত্নের অন্যতম আবুল ফজলের লেখায় পাওয়া যায়, তখন চারটি জায়গা সতীপীঠ হিসাবে চিহ্নিত হত। তাদের অবস্থান ছিল, (১) কামরূপে কামাখ্যা (২) তুলজা ভবানী বর্তমান মুম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণভাগে (৩) জালন্ধরী পাঞ্জাবে নাগরকোটের কাছে এবং (৪) বর্তমান উত্তর কাশ্মীরের শারদা তথা শার্‌দি।

কামাখ্যা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, সেখানে বলা হয়েছে একশো চল্লিশ জন মানুষের মাথা তাম্রপাত্রে রেখে দেবীকে পুজো করা হয়। কথিত আছে, ভোগী নামে একদল মানুষ একসময় বাস করতেন কামরূপে। 'অই' নামে জনৈক দেবীর উদ্দেশে তারা স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। গুহায় বাস করতেন সেই 'অই' নামের দেবী। শোনা যায়, তারা নাকি শুনতে পেতেন দেবী'র ডাক। তাই আশা করা যায়, অনেকের মতো কামরূপের দেবীও আদিম অধিবাসী তথা অনার্যদের ঈশ্বর ছিলেন। বিজ্ঞজনের ধারণা, অষ্ট্রীক শব্দ 'কামোই'-এর অর্থ হল দৈত্য; 'কামোইত' শব্দের অর্থ শয়তান। কারও কারও ধারণা, সাঁওতালদের দেবতা 'কমরু' থেকে কামাখ্যা শব্দের

উৎপত্তি হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ অস্ত্রশাস্ত্রে থাকলেও, মহাভারতে কামরূপ কামাখ্যার উল্লেখ নেই। চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভের গায়ে কামরূপের বর্ণনা করা হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের লিখিত বর্ণনায় জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে তিনি কিছুদিনের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের (৬০০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) দরবারে ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিকদের মতে, হর্ষবর্ধনের বন্ধু হিসাবে রাজা ভাস্কর বর্মণ কামরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার প্রভাবে কামাখ্যা মায়ের মাহাত্ম্য সাময়িকভাবেই চাপা পড়ে যায়। অনেকের ধারণা, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল 'রুদ্রযামল' তন্ত্র। এখানে দশটি পীঠের বর্ণনা করা হয়েছে :

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং তথা।
ললাটে পূর্ণগির্যাখ্যম ওড়্ডিয়ানং তদুর্দ্ধকে।।
বারাণসীং ভ্রূবোর্মধ্যে জ্বলন্তীং লোচনত্রয়ে।
মায়াবতীং মুখদ্বন্তে কণ্ঠে মধুপুরীং ততঃ॥
অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কণ্ডঘাং কাঞ্চীং বিনির্দেশেবত্॥
দশৈতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদ্যঃ।
হ্রস্বদীর্ঘস্বরৈ বর্গের্ণে ভ্যোন্তৈঃ ক্রমতো ন্যসেৎ॥

আবার রাজা নরনারায়ণের কাহিনীতে ফিরে আসি। একদিন তিনি শুনলেন, সন্ধ্যাবেলা পুজোর সময় পুরোহিতকে মা কামাখ্যা দর্শন দেন। তিনি কামরূপের নীলপাহাড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণকে দেবীদর্শন করানোর জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। রাজার বারংবার অনুরোধে পুরোহিত বললেন, রাজামশাই, সন্ধ্যার সময় যখন মন্দিরের ভেতর থেকে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবেন, তখন মা কামাখ্যার ভোগ-মূর্তির উত্তরে যে গবাক্ষ আছে সেখান থেকে দেবীকে দর্শন করতে পারবেন। সন্ধ্যাবেলা পুরোহিত শুরু করলেন দেবীপূজা। রাজাও নির্দিষ্ট গবাক্ষে চোখ রাখলেন। হঠাৎ দিব্য জ্যোতিতে ঘর প্রচণ্ড আলোয় ভরে গেল। ঝলসে গেল রাজার চোখ। ব্রাহ্মণের মুণ্ড টেনে ছিড়ে নিলেন দেবী আর রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি বা তোমার বংশধর কেউ যদি এই পীঠস্থান দর্শন করা তো অনেক দূরের কথা, নীলপর্বতে উঠলেই তোমাদের বংশ লোপ পাবে। সেই থেকে কোচবিহারের রাজপরিবারের কেউ এই মহাপীঠে আসেন না। কামাখ্যা মায়ের কোনও প্রাকৃত দেবী মূর্তি এই পীঠে নেই। দেবীমূর্তিকে যিনি যেভাবে সেইভাবে কল্পনা করে মায়ের চরণবন্দনা করেন। তাঁর প্রণাম মন্ত্র হল,

কামাখ্যে বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোহস্তুতে॥

এই ব্রহ্মরূপিণী প্রকৃতি শক্তির প্রতীক হলেন কুমারী। কুমারী হল ষোলো রকমের।

একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিধাতুমূর্তিশ্চতুবর্ষাতু কালিকা।
সুভগাপঞ্চবর্ষাতু ষড়বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্ঠবর্ষা চ কুব্জিকা।
নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চা-পরাজিতা।
একাদেশে চ রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী।
ত্রয়োদশে মহালক্ষী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশাভিঃ- ষোড়শে চাম্বিকা স্মৃতা।
এবং ক্রমেণ সম্পূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে।।

কথিত আছে, এই ত্রিভুবন সৃষ্টির আগে ব্রহ্মা নিজেই নিজেকে পুরুষ ও প্রকৃতি দু'টি ভাগে ভাগ করে দেন। হয়তো সেই সুবাদেই শিবলিঙ্গ ও যোনিমণ্ডলের পুজো হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, 'অহমেদ স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং, দেবে ভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তবমুগ্রং কৃণোমি, তং সুমেধাম্।।' অর্থাৎ দেবী মা সমগ্র জগতের ঈশ্বর এবং তিনিই পরমব্রহ্ম। তিনিই সেরা। প্রাপক হিসাবে তিনি নানাভাবে অবস্থান করেন। দেবতা ও মানুষজনকে তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের গূঢ় রহস্য জানান। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি সেইভাবে সকলকে তৈরি করেন। এই অদম্য কুমারী হিসাবে চিহ্নিত হন।

সৃষ্টির শুরুতে সধবা হিসাবে পুজো করার ব্যবস্থা ছিল, যা আজও বিদ্যমান। একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন নামে কুমারী রূপে তাঁর পুজো করার রীতির প্রচলন হয়। কামরূপে মা কামাখ্যার যোনিমণ্ডল পড়ায় সাধকদের মতে, সবচেয়ে শক্তি রয়েছে এই মহাপীঠে। কারণ, সৃষ্টির শুরু এখানে। একই মত অনেকে ব্যক্ত করেছেন একটু অন্যভাবে। তন্ত্রশাস্ত্রে এই তথ্যের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে মানবদেহের মূলধারে আছে আত্মশক্তি কুণ্ডলিনী, যা সাড়ে তিন পাক পেঁচিয়ে সবসময় ঘুমন্ত অবস্থায় বিরাজ করেন। পদ্মের কুঁড়ির মতো তার আকৃতি। তিনিই আদি জননী। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় এর সঠিক অবস্থান? বলা হয়, গুহ্যদেশ থেকে উঁচুতে আবার লিঙ্গ মূল থেকে নীচে সুষুম্না এর অবস্থান। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বজ্রনাড়ীর মুখে আছে 'ত্রৈপুর' নামে একইরকম দেখতে ত্রিকোণ। এখানেই রয়েছে লাল জীবধারক কন্দর্প বায়ু। শ্রীক্রমমতে এই ত্রিকোণ হল, কামাখ্যা যোনি এবং কন্দর্প অপানবায়ু। রজস্বলা নারীর মধ্যে বিকশিত হয় নারী শক্তি। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিকে বলা হয়েছে ষোড়শী। সেই অর্থে মা কামাখ্যাও নিত্য ষোড়শী। বেদে অনুমতি ও রাকা পূর্ণিমার উল্লেখ আছে। এই রাকা পূর্ণিমাই হলেন নিত্যা ষোড়শী। রজঃপ্রবৃত্তির দিন থেকে প্রতিদিন এক এক কলা করে সৌম্য আনন্দের সৃষ্টি হয়। তাকেই তন্ত্রে বলা হয়েছে, কামকলা। ষোলোদিনের দিন নারী হয় ষোড়শী, ব্রহ্মানন্দস্বরূপিনী, রাজরাজেশ্বরী। উপনিষদে বলা হয়েছে, আনন্দো ব্রহ্মযোনিঃ। অম্বুবাচীতে কামরূপের

কামাখ্যা পীঠে অনেক মানুষের সমাগম হয়। 'অম্বু' শব্দের অর্থ জল। সেই থেকে সৃষ্টি হয়েছে অম্বুবাচী। অম্বুবাচীর সময় সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রের প্রথমপাদে থাকে। সূর্যের মৃগশিরা নক্ষত্রে তিন দিন কুড়ি দণ্ড হল অম্বুবাচীর সময়। অনেকের মতে, স্বয়ং পৃথিবী এই সময় রজস্বলা হয়। রাজমর্তণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে,

'মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্রপাদে অম্বুবাচী।
ঋতুমতী খলু পৃথিবী।
ঋতুমতী হ্রস্বত্বমার্যম্।'

রুদ্রযামলে আছে,

'প্রাবৃটকালে সমায়াতে রৌদ্রঋক্ষনাতে রবৌ।
নারীবেধ সমাযোগে জলযোগং বদাম্যহম্॥'

অর্থাৎ রবি বা সূর্য আর্দ্রা নক্ষত্রে উপস্থিত হলে বর্ষা আসবে। সেই সময়ে নাড়ীবেধ হলে আমি তোমাকে বর্ষাকালের যোগ বলব। অনেক রাজ্যের কৃষকেরা এই সময় জমির 'আল' বেঁধে রাখে। কারণ, ভালো বৃষ্টি হলে কৃষিকাজে সুবিধা হয়। অম্বুবাচীর সময় পৃথিবী ঋতুমতী হন বলে ওই সময় মাটি খোঁড়া হয় না।

অমিয় কুমার মজুমদার তাঁর 'সতীপীঠ পরিক্রমা' বইতে লিখেছেন, অথর্ববেদে ১২।১।১২ সূক্তে পৃথিবীকে মাতা বলা হয়েছে। ঋকবেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে এবং প্রথম মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তে দ্যাবাপৃথিবীর স্তব আছে। এখানে পৃথিবীকে মাতা এবং দেবী দুই-ই বলা হয়েছে। সৃষ্টির মূলাধার হলেন 'কাল'। কালেই সমগ্র বিশ্ব প্রাপকের সৃষ্টি-স্থিতিলয় হয়। তাই কালের অমোঘ নিয়মে প্রতি বছর মিথুনরাশিতে আষাঢ় মাসে সূর্য আদ্রা নক্ষত্রে এলে অম্বুবাচী হয়ে থাকে। কালিপুরাণে আছে—

'নীলকুটে ময়া সার্দ্ধং দেবী রহসী সংস্থিতা।
সত্যাস্তু পতিতং তত্র বিশীর্ণং যোনিমণ্ডলম্॥
শিলাত্বমগমৎ শৈলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা।
সংস্পৃশ্য তাং শিলাং মর্ত্যোহ্যমর্ত্যত্ব মবাপ্নুয়াৎ।
অমর্ত্যো ব্রহ্মসদনং তত্রস্থো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
তস্যাঃ শিলায়া মাহাত্ম্যৎ যত্র কামেশ্বরী স্থিতা॥

গরুড়পুরাণে কামরূপের কামাখ্যা মহাতীর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।' যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে, এই জায়গাটি আক্ষরিক অর্থে দেবী ক্ষেত্র। রাধাতন্ত্রে কামরূপকে 'ব্রহ্মার মুখ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টির পর ব্রহ্মা এখান থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন বলে এই জায়গাটির নাম হয়েছে প্রাগ্ জ্যোতিষপুর'। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে, কামদেব মহাদেবের ক্রোধে ভস্মীভূত হবার পর এখানে তপস্যা করে দেবাদিদেবের কৃপালাভ করেন বলে, এই জায়গার নাম হয়েছে কামরূপ। কামরূপের উত্তর সীমায় রয়েছে কঞ্জগিরি, পশ্চিমদিকে করতোয়া নদী, পুবদিকে দিক্ষুনদী

এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রনদত্ত লাক্ষানদীর সঙ্গমস্থল। সমগ্র কামরূপ অঞ্চলটি ত্রিকোণাকৃতি। চওড়ায় একশো যোজন, লম্বায় ত্রিশ যোজন।

প্রতিবছর অম্বুবাচী শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত কামাখ্যা মায়ের মন্দির বন্ধ থাকে। এই তিনদিন মন্দিরের বাইরে পুজো ও ভোগের আয়োজন করা হয়। অম্বুবাচী শুরু হওয়ার আগে নতুন চেলিকাপড় দিয়ে দেবীপীঠ আচ্ছাদিত করা হয়। চতুর্থদিনে দরজা খোলার পর দেখা যায়, ওই আবরণটি রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এসবকিছুই নির্ভর করে মানুষের বিশ্বাসের ওপর।

ভগবান কৃষ্ণ তাঁর উরুর মধু ও কৈটব নামে মহাপরাক্রমশালী দুই অসুরকে রেখে তাদের মাথা কেটে ফেলেছিলেন। সেই উরুচিহ্নই পাণ্ডুনাথ নামে এখানে রয়েছে। শোনা যায়,পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার পর তাঁরা রাজ্য ফিরে পাবার জন্য ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করে মা কামাখ্যার কাছে রাজ্য ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এখানে পূর্ব দিক দিয়ে উঠলে ধনলাভ হয়, উত্তরদিক দিয়ে উঠলে মুক্তি, পশ্চিমদিক দিয়ে উঠলে রাজ্য লাভ এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে উঠলে রাজত্ব চলে যায় ও মৃত্যু হয়।

মায়ের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্র হল,

নমস্তে পাণ্ডবে মহাভৈরব রূপিণে।
অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ কামাখ্যা দর্শনং প্রতি।।

পাণ্ডু নাথের উদ্দেশ্যে পাণ্ডবেরা প্রার্থনা করে বলেছিলেন,

পাণ্ডুনাথ নমস্তে হস্তু নমস্তে মোক্ষকারকঃ
ত্রাহি মাং সর্বলোকেশ বিষ্ণুরূপ নমোহস্তুতে।।

মা কামাখ্যার মন্দিরে কুমারী পুজোর প্রচলন অনেকদিন থেকে আছে। এদের বয়স হতে হবে, পাঁচ থেকে বারো বছরের মধ্যে। কামাখ্যায় দেবী কুমারী রূপে বিরাজ করেন একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রণাম মন্ত্র হল,

ওঁ জগৎপূজ্যে জগদ্‌বন্দ্যে সর্বশক্তি স্বরূপিনি।
পূজাং গৃহাণ কৌমারি জগন্মাতর্ণ মোহস্তুতে।।

যানি যানিহ পাপানি জন্মান্তরকৃতানিচ। তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে— এই মন্ত্রপাঠ করে ভক্তেরা মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। এখানে দশমহাবিদ্যার মন্দির ছাড়া কামেশ্বর শিব, আম্রাতকেশ্বর শিব, সিদ্ধেশ্বর শিব ও কমলেশ্বর বিষ্ণু—এই চারটি মন্দির আছে। ব্রহ্মপাহাড়ে আছে ভুবনেশ্বরী মন্দির।

কামাখ্যা মায়ের মন্ত্র হল,

কামাখ্যাং কামসম্পন্নং কামেশ্বরীং হরিপ্রিয়াম
কামানাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বরী নমোহস্তুতে।।

প্রণাম মন্ত্র ঃ

কামাখ্যে বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোঽস্তুতে।।

সৃষ্টিতীর্থ কামাখ্যা'র সম্পর্কে নানান তথ্য পরিবেশনের ফাঁকে অসমের কিছু বিষয় এখানে গ্রন্থিত হল। অসমের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাকি অংশের সংযোগ ঘটে ব্রিটিশ আমলে। তবে এখানকার কথা বর্ণিত আছে রামায়ণে। সীতাকে রাবণ চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরে সুগ্রীব যূথপতিকে বলেছিলেন, তুমি সহস্র বানরকে সঙ্গে নিয়ে পূবদিকে সীতা ও রাবণের সন্ধান করো।

এ প্রসঙ্গে কবি কৃত্তিবাস বলেছেন,

ব্রহ্মপুত্র তরি রঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দর পর্বতে যাইও কিরাতের দেশ।।

শুধু রামায়ণ নয়, মহাভারতেও প্রাগজ্যে তিষপুর, অর্থাৎ বর্তমান অসমের উল্লেখ আছে। শোনা যায়, মহাভারতের যুগে অসম, অসুর বংশের রাজাদের শাসনাধীন ছিল। রাজার নাম ছিল নরকাসুর। মহাভারতে কৌরব পক্ষের ভগদত্তের কথা উল্লেখ আছে দ্রোণাপর্বের ২৯ অধ্যায়ে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে অর্জুন সুশর্মা'র ভাইদের বধ করেন। তখন প্রাগজ্যোতিষপুরের মহাবীর ভগদত্ত অর্জুনকে আক্রমণ করেন হাতির পিঠে চড়ে। শুরু হল দুই মহাবীরের সম্মুখ সমর। একসময় ভগদত্ত অর্জুনের বুকে লক্ষ্য করে বৈষ্ণব-অঙ্কুশ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন এই অস্ত্রের দাপট সহ্য করার ক্ষমতা পার্থ'র নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সখাকে আড়াল করতে তা নিজের বুকে গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবশাস্ত্র স্বয়ং নারায়ণের বুকে আঘাত করে পরিণত হল বৈজয়ন্তীমালায়। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ভগদত্তের ছেলে বজ্রদত্তের কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। শোনা যায়, বর্তমানে অরুণাচলের সদিয়ার কাছে একটি রাজত্ব ছিল, যার নাম হল বিদর্ভ। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন রুক্মিনীর বাবা ভীষ্মক। রুক্মিনীকে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে দ্বারকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আধুনিক অসমের ইতিহাস জানা যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় (৪৩০-৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এখান রাজত্ব করেছেন বর্মন বংশীয় রাজারা। ৬৬৪ থেকে ৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি স্তম্ভ বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। পাল বংশীয় রাজারা অসমে রাজত্ব করেন ১০০০ থেকে ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার পরে শাসন করেন দেব বংশীয় রাজারা। এরপর শাসনভার গ্রহণ করেন আহোমরা। নেতৃত্বে ছিলেন সুকাফা। ইতিহাসবিদদের মতে, আহোমরা 'তাই' এবং 'শান' উপজাতীয়দের বংশধর। তারা নিজেদের 'তাই' অর্থাৎ দেবতার বংশধর বলে চিহ্নিত করতেন।

এ-সম্পর্কে একটি কাহিনীও শোনা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পঙ-এর (সেখানকার আদি অধিবাসী ছিলেন আহোমরা) রাজত্ব নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সেই

সময় সুকাফা সুবিধা করতে না পেরে ন'হাজার বিভিন্ন বয়সের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ইরাবতী উপত্যকা ও পাটকৌ পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। একসময় সুকাফা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাটকৌ পাহাড় পার হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চলে আসেন। তখন স্থানীয় অধিকাংশ উপজাতীয়রা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নেন। ১২৬৮ সালে সুকাফা প্রয়াত হন। সিংহাসনে বসেন তাঁর ছেলে সুতেফা। এইভাবে আহোমরা এখানে রাজত্ব করেন ১২২৮ থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ। ১৮২৪ সাল থেকে অসমে ব্রিটিশদের রাজত্ব শুরু হয়। তবে ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানকার শেষ রাজা পুরন্দর সিংহ ব্রিটিশদের আশ্রিত হিসাবে আপার-অসমে রাজত্ব করেছেন।

আহোমরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নাম রাখেন সুনখান অর্থাৎ সোনালি বাগানে ভরা দেশ। অনেকের মতে, যেহেতু এই রাজ্যের জমি অসমান তাই জায়গাটির নাম হয় 'অসম'। পরবর্তী সময়ে মোগল আমলের লেখকেরা আহোমদের রাজ্যকে 'আসাম' বলে সম্বোধন করেন।

এ প্রসঙ্গে ডক্টর বি. কাকতি বলেছেন, Assam might have come from asama which in its turn was the Sanskritisation of achom meaning undefeated or unconquered.'

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'The word Aham... is just an indian modification of Burmese, Rham.'

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে প্রাগজ্যোতিষপুর ও কামরূপ দু'টি নামেরই উল্লেখ আছে। কালিকাপুরাণেও একই তথ্য পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াঙ অসমের সম্পর্কে লিখেছেন, "The climate is soft and temperate. The manners of the people are simple and honest. The men are of small stature and their complexion a dark yellow. Their language differs a little from that of mid-India. Their nature is very impetuous, their memories are retentive and they earnest in study... The king is fond of learning and the people are so like-wise in imitation of him. Men of his talent from distant regions, seeking after office, visit his dominion."

পর্যটক আল বিরুনি বলেছেন, 'Thence we come to mountains of Kamru which streteh away as far as the sea.'

তেজপুরের কাছে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে, কেবল গুপ্ত স্থাপত্য কলা নয়, নবম শতাব্দী থেকে অসমে গুপ্তাব্দের প্রচলন হয়েছিল। এছাড়াও জানা গেছে, রাজা সুকাফা শিবসাগরের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে সরাইদেও নামে একটি জায়গায় প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। তারপর রাজধানী হয় গড়গাঁও, রংপুর, শিবসাগর এবং শেষকালে জোড়হাট।

* * *

সমতল থেকে কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার জন্য যে গাড়ির রাস্তাটি আছে তা তৈরি হয় ১৯৫৮ সালে। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তখনকার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এই রাস্তার উদ্বোধন করেন। তবে অতীতে এখানে যে পায়ে হাঁটা রাস্তা ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ আছে, 'The path is steep and the rocks have worn to a slippeny smoothness by the feet of pilgrims... huge people and rubber trees cast their shadows over the path. At either and it passes through an archway ot fine masonry, and here and there the rocks along the side have been hewn into the semblence of quaint Hindu gods.'

বর্তমানে কামাখ্যা একটি শহর হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর উচ্চতা ৯৬১ ফুট। অবস্থান ২৬°১০ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯১°৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমায়। আয়তন ২.৫৯ বর্গকিলোমিটার।

কামরূপের আগের নাম ছিল মর্ধারণ্য। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন তন্ত্র ও পুরাণে কামরূপের নামের উল্লেখ আছে। কালিদাসের 'রঘুবংশম'-এ কামরূপ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগীনিতন্ত্রের মতে, পুরাকালে কামরূপ—কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সৌমারপীঠে বিভক্ত ছিল।

কামাখ্যা মায়ের মন্দিরের সামনে একটি কুণ্ড আছে যাকে বলা হয় সৌভাগ্যকুণ্ড। এটি দেবতাদের ক্রীড়াপুষ্করিণী হিসাবে পরিচিত। কথিত আছে, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা এই কুণ্ডটি খনন করেন। কুণ্ডের মাঝে একটি পাঁচিল আছে। পাঁচিলের একপাশের জল দেবীর স্নান, ভোগ ও পুজোর জন্য ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে প্রাচীরটি ভেঙে যায়। পরে দ্বারভাঙার মহারাজা সেটি আবার তৈরি করিয়ে দেন।

কামাখ্যার উল্লেখযোগ্য উৎসব হল, দুর্গাপুজো, পৌষবিয়া, বাসন্তী ও অম্বুবাচী। পৌষবিয়া হল, কামাখ্যা দেবীর সঙ্গে কামেশ্বর শিবের বিবাহোৎসব। তবে আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীতে সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। হিন্দু দেবতা মা কামাখ্যা অনেকের মতে, প্রাক্-আর্য যুগের দেবী। এ প্রসঙ্গে হেম বরুয়া লিখেছেন, distinctly tribal in its traits and ideal...it is relic of the pre-Aryan sex worship that was a part of the aucient social organisation of the tribal people.

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কামাখ্যা দর্শনে এসেছিলেন। মা'কে দর্শনের পর অসুস্থতার জন্য তিনি সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করেছিলেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী গুয়াহাটিতে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে থেকে তিনি শিলং-এ যান এবং খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসমের সেইসময়ের চিফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন স্বামীজীর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন।

উমানন্দ মা কামাখ্যার সদাজাগ্রত ভৈরব। ব্রহ্মপুত্রের মাঝে একটি দ্বীপে পাহাড়ের ওপর অবস্থান করেন উমানন্দ। দ্বিপটি দেখতে অবিকল ময়ূরের মতো। ইংরেজরা এই

জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন 'Peacock Island'। ওই পাহাড়ে উর্বশীকুণ্ড নামে একটি জলাশয় আছে। কামাখ্যা মায়ের জন্য উর্বশী, স্বর্গ থেকে এখানে অমৃত নিয়ে এসেছিলেন। যোগিনীতন্ত্রে বলা আছে, মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ওই কুণ্ডে স্নান করলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়। আহোমরাজ গদাধর সিংহের নির্দেশে গঙ্গা সন্নিকটে বরফুকণ ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির তৈরি করান।

অসমের ব্রহ্মপুত্র নদ দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচশ মাইল। এর মধ্যে নাব্য প্রায় সাড়ে চারশো মাইল। এখনাকার সব নদী যথা দিবং, লুহিত, দিখৌ, ডিহিং, ঝাঁজি, ধনশ্রী, দিশং, কুলসী, সুবনগিরি, ভরলু, মাস, সঙ্কোস ও ধরল ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রের অধিকারে আছে তিনলক্ষ একষট্টি হাজার বর্গমাইল। অসমের ইতিহাস তথা সংস্কৃতি সবকিছুতেই ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কামাখ্যা মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ। এক এক জায়গায় প্রশস্ত প্রায় ছ'মাইল। যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মপুত্রের জলে একবার স্নান করলেই সমস্ত পাপ ধুয়ে যায়। তাই ব্রহ্মপুত্রকে অনেকে তীর্থরাজ বলেও সম্বোধন করেন।

* * *

বরাহ অবতারে নারায়ণের ঔরসে ধরিত্রীর গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়। মা ধরিত্রী, দেবতাদের কাছে ছেলেকে নিয়ে গেলে তিনি তিরস্কৃত হন। তখন ধরিত্রী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাগে-দুঃখে ছেলেকে যথাযথভাবে গঠন করে কামরূপে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। মা ধরিত্রী ছেলেকে দেবতাদের অসম্মানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তবে ধরিত্রী বলেছিলেন, 'বৎস স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও অত্যাচার করবে না। যদি কর তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। তা না হলে নারায়ণের বরে তুমি অমর। কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।' মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নরক দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের বন্দি করে ধরিত্রীদের কাছে এনে হাজির করেন। দেবতারা তখন পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। পিতামহ তাঁদের কামাখ্যা মায়ের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিলেন। দেবতারা ধ্যান শুরু করলেন মায়ের। এদিকে যতদিন যায়, নরকও আরও অত্যাচারী হয়ে উঠল। তবে তিনিও কামাখ্যা মায়ের পরম ভক্ত ছিলেন, তবে তাঁর পুজো করত আসুরিক পদ্ধতিতে।

দেবতাদের বাঁচাতে এবং নরকাসুরের আয়ু শেষ হয়ে আসছে দেখে মা কামাখ্যা ছলনার উদ্দেশ্যে অপূর্ব সুন্দরীর রূপ ধরে তার সামনে উপস্থিত হলেন। দেবীর অপরূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে নরকাসুর তাঁকে পত্নীরূপে কামনা করলেন। দেবী ছলনা করে বললেন, এক রাতের মধ্যে যদি আমার এই পাহাড়ের চারদিকে চারটি পথ ও পাথরের তৈরি একটি বিশ্রামাগার তৈরি করে দিতে পার তাহলে আমি তোমার শর্ত পূরণ করব। রাতের মধ্যেই চারটি পথ তৈরি হয়ে গেল। বিশ্রামাগারের কাজ শুরু হল। এসব দেখে দেবী চিন্তিত হয়ে গেলেন। তখন মায়ার সাহায্যে একটি কুক্কুট (মোরগ) তৈরি করালেন।

হঠাৎ-ই সেই কুক্কুট ডেকে উঠল। দেবী নরকাসুরকে বললেন, অসুর, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারো নি। অসুর সঙ্গে সঙ্গে সেই মোরগটিকে মেরে ফেলল। তখন কামাখ্যা মায়ের আদেশে ভগবান বিষ্ণু নরকাসুরকে মেরে ফেললেন। আগেই বলা হয়েছে, দেবী এখানে কুমারীরূপে বিরাজ করছেন। কুমারীর ধ্যানমন্ত্রটি হল,

ওঁ বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কারনম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্।।
চারু হাস্যাং মহানন্দ হৃদয়াৎ চিন্তয়েৎ শুভাম্।।

কুমারীরূপে কল্পনা করে আরও বলতে হয়,

ওঁ মন্ত্রাক্ষরময়ীং দেবীং মাতৃণাং রূপধারিণীম্।
নবদুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবহয়াম্যহম্।।

উপনিষদে মাতৃগর্ভ এবং উৎপত্তিস্থান অর্থে যোনি'র ব্যবহার করা হয়েছে। কেনো উপনিষদ (২।২।৭), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ (১।১।৩, ৪।১১) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১।৪।৬) শ্লোকেএ-বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে যজ্ঞবেদিকেও 'যোনি' বলা হয়েছে। নিরুক্ততন্ত্রে বলা হয়েছে। 'যোনিশ্চ জনিকা মাতা লিঙ্গশ্চ জনকঃ পিতা। মাতৃভাবং পিতৃভাবমুভয়োরপি চিন্তরেৎ'। অর্থাৎ জগতের জনিকা মাতা যোনি, জনক পিতা লিঙ্গ। যোনিকে পীঠ বলা হয়েছে। এই পীঠই হল কামরূপ। তন্ত্রমতে পূর্ণগিরি, উড্ডীয়ান, জালন্ধর এবং কামরূপ—এই চারটি পীঠে দেবী পূর্ণরূপে বিরাজমানা। বিজ্ঞজনের মতে, শক্তির সমস্ত দেহ হল, পূর্ণগিরি পীঠ, মস্তক উড্ডীয়ান, স্তনদু'টি হল জালন্ধর এবং যোনি হল কামরূপ পীঠ। বৌদ্ধ 'হেবজ্র' তন্ত্রে চারটি পীঠের উল্লেখ করা হয়েছে, জালন্ধর, ওড়িয়ান (উড্ডীয়ান), পূর্ণগিরি ও কামরূপ। মধ্যযুগে লেখা বজ্রযানমতের বৌদ্ধগ্রন্থ 'সাধনমালা'-তে চারটি পীঠের নাম পাওয়া যায়— ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি, কামরূপ ও সিরিহট্ট (শ্রীহট্ট)।

বাংলার তন্ত্র সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরি ও তাঁর শিষ্য পূর্ণানন্দ গিরির নামের কামরূপ পীঠের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। এঁদের আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীতে। ব্রহ্মানন্দগিরির গুরুর নাম ত্রিপুরানন্দ। শোনা যায়, নিজের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে মদমত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। তখন গুরু তাকে অভিসম্পাত দেন। পরে গুরুর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে বলেন, তুমি যদি উপযুক্ত উত্তর সাধক নিয়ে কামাখ্যা মহাপীঠে সাধনা করতে পার তাহলে সিদ্ধিলাভ করবে।

ব্রহ্মানন্দগিরি উত্তর সাধকের সন্ধানে একসময় এসে উপস্থিত হন মৈমনসিংহ জেলার কাটিহালি গ্রামে। সেখানে পিতৃমাতৃহারা বালক জগদানন্দের মধ্যে গুরু নির্দিষ্ট সব লক্ষণ দেখতে পেলেন। উত্তরকালে তিনিই পূর্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন। একসময় গুরু ও শিষ্য একসঙ্গে তন্ত্র আলোচনা করে কামাখ্যা মহাপীঠের স্থান চিহ্নিত করেন এবং

তার উদ্ধারে ব্রতী হন। পূর্ণানন্দ, গুরুর আদেশে গুরুর আগেই সিদ্ধিলাভ করেন। কামাখ্যাতন্ত্রে আছে, কামাখ্যা দেবী যোনিরূপিণী মহাবিদ্যা। তিনি আনন্দপ্রদা, বরদায়িনী, নিত্য এবং মহাসম্পদ বৃদ্ধিকারিণী। তিনি জননী আবার তিনি রমণী ও ত্রাণকর্ত্রী। তিনি স্থূল, সূক্ষা ও মঙ্গলময়ী। দেবী কামাখ্যা রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, বরদানে উদ্যতা, নিষ্কলঙ্কা। তাঁর মুখমণ্ডল সুধাময় ও অলকদামের দ্বার পরিবেষ্টিত। দেবীর দেহে আছে স্বর্ণমাণিক্য খচিত গহনা। রত্নাখচিত সিংহাসনে তিনি উপবিষ্টা। দেবী সর্বদা হাস্যরতা। পদ্মরাগ মণির মতো তাঁর অনুপম কান্তি। সন্তানের জন্য তিনি পয়োধরা। কৃষ্ণবর্ণ, চোখ আকর্ণবিস্তৃতা। কামাখ্যা তন্ত্রের তৃতীয় পটলে আছে, কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করলে দারিদ্র্য নাশ হয়। মা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজ্য। তিনি বুদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির স্বরূপ। তিনিই আবার কামদাত্রী কামিনী। জগন্মাতাকে সবসময় ঘিরে রাখেন কামিনীরা। তিনি ত্রিনয়না, হাতে পুষ্পধনু ও বাণ। তিনি অশেষ গুণসম্পন্না এবং মঙ্গলদায়িনী। ডাকিনী, যোগিনী ও বিদ্যাধরী তাঁকে ঘিরে থাকেন। বলাবাহুল্য, অনেক বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন তিনি।

তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে, কামরূপে শুধু মা কামাখ্যাই নন, আছেন আরও ন'জন দেব-দেবী— শ্রীভৈরব, নক্ষত্রদেবতা, প্রচণ্ড চণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাম্বিকা বগলা, কমলা, ভুবনেশী ও সুষুমুনি। আর আছেন দশজন ভৈরব।

দেবীর বাহন শ্বেত-প্রেত, রক্তপদ্ম ও সিংহ। তিনিই প্রকৃতি আবার তিনিই উৎপত্তি। দেবীকে ধরে আছেন ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহাদেব। ব্রহ্মা হলেন রক্তবর্ণ পদ্ম, বিষ্ণু হলেন সিংহ এবং শিব হলেন শ্বেতবর্ণ প্রেত। সিংহের ওপরে রক্তপদ্ম, তার ওপরে শব, শবের ওপরে অবস্থান করছেন মা কামাখ্যা। যিনি দেবী দুর্গা-মহামায়া, তিনিই মা কামাখ্যা। তাই ঋষিরা তাঁর ধ্যানের যে মন্ত্র সৃষ্টি করেছেন তা হল নিম্নরূপ:

ওঁ কামেশ্বরি জগন্মাতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহে।
গৃহাণার্চ্চামিমাং প্রীত্যা প্রসীদ পরমেশ্বরী॥

এর অর্থ হল, মা কামাখ্যা, তুমি আমার প্রার্থনা তথা পুজো গ্রহণ করো। হে পরমেশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও।

কালিকাপুরাণে ত্রিপুরাদেবীর বর্ণনা আছে। সিঁদুরের মতো লাল, তিনটি চোখ, চারটি হাত, বাঁদিকের ওপরের হাতে পুষ্পধনু ও নীচের হাতে বই, ডানদিকের ওপরের হাতে পাঁচটি বাণ, নীচের হাতে অক্ষমালা। চারটি শবের ওপরে একটি শব রেখে, তার পিঠে দাঁড়িয়ে জটাজুট হয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে সমানভাবে রাখা কেশ, নগ্না, অপূর্বসন্দরী, সর্ব সুলক্ষণা।

দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্তি রক্তবর্ণা, জটাটুট সমন্বিতা, সর্বলক্ষণ যুক্তা, ভূষিতা রয়েছেন নানান অলঙ্কারে। দেবী যোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎ হাস্যযুক্ত নবযৌবনসম্পন্না। তাঁর মৃণালের মতো ভুজ চারটিতে গ্রন্থ, অক্ষমালা, অভয় ও বরমুদ্রা। তিনি স্রবদ্‌রজা সূর্যের আভা সমন্বিতা এবং মুণ্ডমালাধারিণী। তিনি কল্পদ্রুমাবলম্বেন সংস্থিতা, কদম্ব উপবনে স্থিতা, শুভদায়িনী

এবং কামাহলাদকরণ।

মা কামাখ্যার তৃতীয় মূর্তি হলেন দেবী কামেশ্বরী। চুলের রং নীল। স্নিগ্ধ শান্ত আকৃতি। তাঁর দু'টি মুখ, বারো হাত, আঠারোটি চোখ, দু'টি মাথা রয়েছে। প্রতিটি মাথার ওপর রয়েছে অর্ধেক চাঁদ। মায়ের ডানদিকে দু'টি হাতে বই, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড়গ, শক্তি, শূল থাকে। বাঁদিকের হাতগুলিতে থাকে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, অভয়মুদ্রা, চর্ম, পিণাক ও কোদণ্ড। দেবী কামেশ্বরীর ঈশান কোণ, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম উত্তর ও মাঝখানের মাথার বর্ণ যথাক্রমে সাদা, লাল, পীত, হরিৎ, কালো এবং নানান বর্ণ বিশিষ্ট। সাদা মুখ মহেশ্বরীর, লাল কামাখ্যায়, পীত-ত্রিপুরা, হরিৎ শারদা, কৃষ্ণবদন কামেশ্বরী এবং বিচিত্রবর্ণের মুখ হল দেবী চণ্ডীর।

সিংহের ওপর শ্বেতবর্ণের একটি প্রেত, তার ওপর লাল রঙের পদ্ম। এই পদ্মের ওপরে দেবী কামেশ্বরী হাসিমুখে বসে আছেন। পরণে বাঘের ছাল। কালিকাপুরাণে সিদ্ধি কামেশ্বরী ও সর্বকামেশ্বরী দেবীর ধ্যানমন্ত্রও আছে।

দেবী কামাখ্যার চতুর্থ মূর্তি হল শারদা দেবী সিংহবাহিনী দুর্গা। পূজিতা হন শরৎকালে।

মায়ের পঞ্চম মূর্তি হলেন মহোৎসাহা বা দেবী মহামায়া। বৈষ্ণবী তন্ত্রের মন্ত্র দিয়ে পুজো করা হয়। তাঁর স্বর্ণকমলের ন্যায় মৃণাল সপ্তপাতালে প্রবেশ করেছে। পদ্মটি বিস্তৃত রয়েছে ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত। এর চুলের রঙ কাঞ্চনবর্ণ। এই স্বর্ণ কমলের ওপর মহামায়ার অধিষ্ঠান। মাথায় সোনার ও নানান রত্নখচিত মুকুট আছে। ত্রিনেত্র তিন রঙের। সাদা, কালো ও লাল।

কালিকাপুরাণে মা কামাখ্যার মূর্তিভেদ রহস্যের বর্ণনা করা হয়েছে :

> 'একৈব তু মহামায়া কার্য্যার্থং ভিন্নতা গতা।
> কামাখ্যা তু মহামায়া মূলমূর্তিঃ প্রগীয়তে।
> পীঠে ভিন্নত্বয়া সা তু মহামায়া প্রগীয়তেঃ॥
> এক এব যথা বিষ্ণু নিত্যত্বাদি সনাতনঃ।
> জনা নার্মদনাৎ সো হপি জনার্দন তি শ্রতঃ॥
> তথৈব সা মহামায়া কামার্থাং সঙ্গতা গিরৌ।
> কামাখ্যোতি সদা দেবৈর্গদ্যতে সততং নরৈঃ॥

যাতায়াতের ব্যবস্থা : গুয়াহাটি শহর থেকে কামাখ্যা ৮ কিলোমিটার পথ। শহর থেকে মূলমন্দির অবধি গাড়ি ও বাস যায়। রাস্তা থেকে ৩২০টি সিঁড়ি ভেঙে পায়ে হেঁটে মন্দিরে পৌছানো যায়। শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটির দূরত্ব প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার। বিমানে কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা।

থাকার ব্যবস্থা : কামাখ্যা পাহাড়ে মন্দিরের পাশে পাণ্ডাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। গুয়াহাটিতে অনেক ভালো ও বিভিন্ন দামের ভালো হোটেল ও লজ আছে।

কেতুগ্রামের বহুলা মা

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা। পীঠ নির্ণয়ের দ্বাদশ পীঠ হিসাবে এই স্থানটির বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনায় আছে,

বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো দেবতাস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।।

কেতুগ্রাম বাসস্টপে নেমে মিনিট আট-দশ হাঁটলেই গ্রামের মধ্যে দেবীর মন্দিরে পৌঁছে যাওয়া যাবে। এখানে ভৈরব হচ্ছেন ভীরুক। এ সম্বন্ধে কবি ভারতচন্দ্র রায় লিখেছেন,

বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব।।

অন্নদামঙ্গলে বহুলা-র স্থানে বাহুলা লেখা হয়েছে এবং পীঠদেবীর নাম বলা হয়েছে বাহুলা চণ্ডিকা। গ্রামে মধ্যে খুব পুরনো দেবীর যে মন্দির আছে, সেটির নতুন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সমতল ছাদ। ছোট মন্দির। দেবীর মূর্তি স্থাপন করা আছে একটি কালো পাথরের ওপর। মন্দিরের পূজারি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, আমি বারো বছর যাবৎ এই মন্দিরের পুজো করছি। মন্দিরটি বর্তমানে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালনাধীন। তারাই আমায় মায়ের পুজো করার জন্য মনোনীত করেছেন। এটি একান্ন পীঠের একটি পীঠ। এখানে মায়ের বামবাহু পড়েছে। সেইজন্য দেবীর নাম বাহুলক্ষ্মী। মায়ের প্রণাম মন্ত্রে বলা আছে,

বহুলায়াং চতুর্ভুজাং পতিপুত্রসমন্বিতাম
নমস্তে ভীরুকপত্না সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।।

অর্থাৎ ভক্তের যে কোনও মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন। মায়ের পাশে রয়েছে অষ্টভুজ গণেশ। তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা। পশ্চিমবঙ্গে এ-ধরনের একটি গণেশেরই সন্ধান পাওয়া যায়। শোনা যায়, অন্যান্য তিনটি রাজ্যে নাকি এ-ধরনের গণেশ আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরও বলেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের উত্তর পুরুষদের কাছে একই মূর্তি বর্ণনা করেছেন। অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী মহানবমী তিথিতে এখনও মোষ বলি দেওয়া হয়। পাশাপাশি ছাগল বলিও দেওয়া হয়। দোলের সময় পাঁচ-সাতদিন ধরে উৎসব চলে। সেই সময় এখানে অনেক ভক্তসমাগমও হয়ে থাকে। এখানে মায়ের মন্দিরে যে পুকুর আছে সেখানে

স্নান করলে যে কোনও রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে অনেকের বিশ্বাস। মায়ের স্বপ্নপ্রদত্ত ঔষধ পাওয়া যায়। সেটি ধারণ করে অনেকে দুরারোগ্য অসুখ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিনাপয়সায় এই স্বপ্নৌষধ মন্দির থেকেই দেওয়া হয়। মহানবমীর যে মোষবলি দেওয়া হয় তার বাঁট বা কান কেটে তা থেকে মায়ের স্বপ্নৌষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অম্বলশূল, মহিলাদের সূতিকা ইত্যাদি অসুখও এই বিশেষ ঔষধে নিরাময় হয়ে যায়। এখানে মায়ের নিত্য পুজো হয়। সকাল ছ'টায় সময় মন্দির খোলা হয়। তারপর মন্দির পরিষ্কার হলে বেলা দশটার সময় মায়ের পুজো শুরু হয়। দুপুর বারোটার সময় অন্নভোগ দেওয়া হয়। তারপর সন্ধ্যার সময় আরতি করা হয় মা'কে। এখানে ভৈরব মায়ের মধ্যেই আছেন। যে প্রণাম মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, সেখানে উল্লেখ দেবী পতিপুত্র সমন্তিতাম অর্থাৎ পতি ও পুত্র সহযোগে তিনি এখানে বিরাজ করছেন। অন্নদামঙ্গলে এই স্থানের উল্লেখ আছে। তাছাড়া 'তন্ত্রাভিলাষী সাধুসঙ্গ' নামক বইতে এই সতীপীঠ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। দেবীর বাঁদিকে আছেন মা লক্ষ্মী। মায়ের মূর্তির ডানদিকের একটি হাত ভাঙা। মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে। অনেকদিন আগে রাও পদবিধারী জমিদারেরা বহুলা দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। এখনকার 'রায়' পদবিধারী সেবাইতরা তাদের বংশধর।

বহুলা দেবীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন হাত। দেবীর ধ্যান মন্ত্র হল,

ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং
পদ্মাসনস্থাং শুভম্।
দোর্ভিঃ কম্ফতিকাং বরাভয় যুক্তাং
(ত্রিনয়নাং) বামে স্বপুত্রান্তিতাম্॥
গৌরঙ্গীং মণিহারকণ্ঠ নমিতাং
চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥

অর্থাৎ হিমালয়সুতা পদ্মাসনাস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করবে। তাঁর চার হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অন্য দুই হাতে বর ও অভয়, বামপাশে নিজের ছেলে।

প্রাচীনত্বের হিসাবে কেতুগ্রামের বয়স অনেক। শোনা যায়, এই গ্রামে একসময় ভূপাল নামের তিলিবংশজাত এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক ছেলের নাম হল চন্দ্রকেতু। সেই চন্দ্রকেতুর নামেই জায়গাটির নাম হয় কেতুগ্রাম। অনেকে মনে করেন, কেতুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নানুরের বিশালাক্ষী-বাশুলীদেবীর উপাসক চণ্ডীদাস। সেখানেই ছিল তাঁদের আদি বাসস্থান। কেতুগ্রামের উত্তরদিকের একটি জায়গাকে আজও স্থানীয় মানুষজন চণ্ডীভিটা বলে সম্বোধন করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু'র মতে, শিবচরিতে যে জায়গাটিকে রণখণ্ড নামে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি মরাঘাট নামে পরিচিত। অনেকের ধারণা, এখানেই বহুলা মা'র বামবাহু পড়েছিল। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদর' আছে। ব্রহ্মখণ্ডে এই ছোট স্রোতসিনী নদীকেই 'বকুলা'

বা বহুলা বলা হয়েছে। এই বষয়ে স্থানীয় প্রাজ্ঞ মানুষ ঁদক্ষিণাপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে ধরাধর চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমার বাবার দাদু এই মরাঘাট-মহাতীর্থ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেখানে অনেকদিন থেকে সাধনা করেন। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন তখন মহামায়ার নামে আমাদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে যান। সেই থেকে মহামায়া দুর্গার নামেই সেখানে পুজো হয়। তবে ঁকার্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে সম্পত্তি দিয়ে যান তা দিয়ে পুজোর খরচ নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। আমাদের পরিবারের সবাই মিলে বাকি খরচের জোগান দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন সেখানে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। নবমীর দিন বলি হয়। অনেকে বলেন, ওই জায়গাটি নাকি কোনও একসময় শ্মশান ছিল। তবে এর স্বপক্ষে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায়, অনেক সময় ছোট ছোট শিশুরা মারা গেলে নদীর ধারে পুঁতে দেওয়া হত। আমরাও শুনেছি, সুদূর অতীতে সেখানে মৃতদেহ দাহ করা হত। তবে তা কতদিন আগে হত তা বলা সম্ভব নয়। এখন আর এ-ধরনের কোনো কাজ সেখানে হয় না। শিবরাত্রির দিনে সেখানে এক বিশেষ উৎসব হয়। আমাদের পারিবারিক উদ্যোগেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। মরাঘাট মহাতীর্থে অনেক সিদ্ধপুরুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। অনেকে আবার সেখানে দেহত্যাগও করেছেন। ন্যূনতম একজন সাধু সেখানে সর্বদাই থাকেন। শুনেছি, মহামায়ার কাছে মানসিক করে অনেকে শারীরিকভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন। ওখানে ঘটে পুজো করা হয়। সেখানে গেলেই বোঝা যাবে, ওই জায়গাটি মূর্তি রেখে পুজো করার পক্ষে আদর্শ স্থান নয়। মহাপীঠ হতে হলে তার কাছাকাছি উত্তরবাহিনী নদী থাকা প্রয়োজন। এই মরাঘাটের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী ঈশানী নদী। আমার এক দাদার নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি একবার সেখানে সাধনা করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। কিন্তু তার সঠিক অবস্থান আজও জানা যায়নি। দাদা গদাধর সেখানে গিয়ে জপ-ধ্যান করার সময় হঠাৎই অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পাবার পর তিন-চারদিন তিনি প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন। সেখানে কী ঘটনা ঘটেছিল এ-কথার কোনও সদুত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আর একজন তান্ত্রিক সাধু অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, তিনিও অনেকদিন সেখান সাধনা করেছেন। তাঁর কাছেই শুনেছি, সেখানে কোনও কোনও সময় সমগ্র জঙ্গল আলোয় ভরতি হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে তা মিলিয়ে যায়।

মরাঘাটে স্বামী ওঙ্কারানন্দ জানিয়েছেন, এখানে মা বহুলা, মা জয়দুর্গা ও মা দুর্গার নামেও পুজো হয়। কমপক্ষে একশো বছর আগে স্থানীয় পণ্ডিত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই ধ্যান রচনা করেন। স্থানীয় মানুষেরা ভৈরবকে ডাকেন ভূতনাথ নামে, শাস্ত্রীয় নাম ভীরুক। শাস্ত্রে বলা আছে,

নমস্তে ভীরুকায় ভূতনাথ নাম ধারিনে।

বহুলাক্ষ্মী ভৈরবায় সদা শ্রীখণ্ডবাসিনে।।
শুদ্ধশিব স্বরূপায় আনন্দঘন মূর্তয়ে।
লোকপাবন কারণায় নমস্তুভ্যম পুনঃপুনঃ।।

মহাপীঠ হওয়ায় শাস্ত্রীয় শর্ত অনুসারে এই মরাঘাটের পাশ দিয়ে যেমন বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী ঈশানী নদী, তেমনই এক যোজনের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ম্ভু শিব ভীরুক।

প্রায় আড়াই দশক আগে জনৈক সন্ন্যাসী এই জায়গাটি সংস্কার করেন। এখানে যে মন্ত্রে পুজো হয় তা হলঃ

বহুলায়াং বামবাহু বহুলাক্ষা চতুর্ভূজা
ভীরুক ভৈরবস্তোত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।।

ছাবিবশ-সাতাশ বছর আগেও এখানে শিবাভোগ হত। এখানে একটি ঘণ্টা ছিল। ঘণ্টাধ্বনি শোনার সঙ্গে এখানকার প্রতিটি পাখি কিচকিচ করে ডেকে উঠত। তাদের প্রত্যেককে মায়ের ভোগ দেওয়া হত। এখানে মায়ের কোনও মূর্তি নেই তবে মা দুর্গার রূপ আঁকা আছে। আমাদের গুরুদেবের ধারণা, এই মরাঘাট মহাপীঠে দেবীর দেহের খণ্ডিত অংশ পড়েছিল। তিনি বলেছেন, এই জায়গাটিই যে মহাপীঠ তার সব লক্ষণই এখানে বর্তমান। তাঁর কাছেই শুনি এক অভূতপূর্ব ঘটনা। একদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন ধরে। কাঁদরের জল এপার থেকে ওপারে উপচে পড়ছে। একই সঙ্গে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সন্ধ্যা হওয়ার সময় গুরুদেব মায়ের মন্দিরে দীপ দেখানোর জন্য একটি ছোট লণ্ঠন হাতে নিয়ে মন্দিরের কাছে আসার পর বিদ্যুৎ চমকানো আলোয় দেখতে পেলেন, সামান্য দূরত্বে জনৈকা দিগম্বরী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করামাত্র 'বাঁচাও-বাঁচাও' শব্দের বিকট চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এই রাতের বেলায় কী করে কোনও নারী এখানে উপস্থিত হতে পারেন? তিনি যদি বিপন্নই হবেন তাহলে আমি যখন লণ্ঠন হাতে এলাম তখনই তো বলতে পারতেন। তিনি ঘরের থেকে বের হলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন, যদি কারও প্রয়োজন হয় তাহলে সে এখানেই আসবে। তারপর আর কোনও শব্দ শোনা যায়নি, কেউ আসেও নি। আর একদিনের ঘটনা গুরুদেবের কাছে শুনেছি। একদিন এখানে একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষ এসে দরজা ভেঙে সবকিছু তছনছ করে শিবের ত্রিশূল নিয়ে চলে যায়। গুরুদেব সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরের দিন সব শুনে তিনি বললেন, আর কেউ নন, মায়ের ভৈরব এসেছিলেন মন্দিরে।

মরাঘাট মন্দিরের ডানদিকে পৃথক ঘরে লিঙ্গরূপ মহাদেব বর্তমান। কিন্তু কেতুগ্রামের পীঠস্থানে দেবীর ভৈরব ভীরুক নেই। কারও কারও মতে, তিনি আছেন শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ড কেতুগ্রাম থেকে খুব দূরে নয়। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্শ্বদ নরহরি সরকার ও আরও কয়েকজন বৈষ্ণব সাধক। সম্ভবত এই জন্যই এখানে বৈষ্ণব ভক্তদের

প্রভাব যথেষ্ট। শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শ্রীশ্রীখণ্ডেশ্বরী। তাঁর থান রয়েছে খণ্ডেশ্বরী তলায়। গ্রামের উত্তরপ্রান্তে রয়েছে অনাদি লিঙ্গ ভূতনাথ। এই মন্দিরটি আপাতভাবে নতুন দেখালেও দেওয়ালে লাগানো পাথরের ফলকে রাজা রাজবল্লভের নাম আছে। পুরোনো মন্দিরেও ফলকটি ছিল। কালো পাথরের অমসৃণ ভূতনাথ শিবলিঙ্গের পাশেই রয়েছেন বটুক ভৈরব ও দুধকুমার নামে দু'টি শিবলিঙ্গ। এখানে প্রতিবছর গাজনের উৎসবে মেতে ওঠেন অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ। স্থানীয় মানুষেরা প্রাণতোষিণী তন্ত্রকে উল্লেখ করে বলেন, এই ভূতনাথ শিব-ই হলেন কেতুগ্রামের দেবী বহুলার ভৈরব ভীরুক। আগেই বলা হয়েছে, প্রাণতোষিণী মন্ত্রে আছে—

নমস্তে ভীরুকায় ভূতনাথ নাম ধারিণে,
বহুলাক্ষী ভৈরবায় সদা শ্রীখণ্ড বাসিনে।

তবে মরাঘাটে এলে মনটা যে অন্যরকম হয়ে যাবে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে তাই প্রায়শই ঘটে চলে নানান অলৌকিক ঘটনা। রাত দুটো। পুজোর পরে চোখে পড়ল শিবলিঙ্গের পাশে রয়েছে বড় একটি সাপ। আর একদিন সন্ধ্যারতি করার সময় সাধুবাবার চোখে পড়ল শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছে একটি সাপ। আরতি শেষ করে শঙ্খধ্বনি করার পর আর তাকে দেখা গেল না। ওই জায়গায় রয়েছে অনেক বিষাক্ত সাপ। কিন্তু তারা কোনোদিন মন্দিরের সেবাইত বা সন্ন্যাসীদের অনিষ্ট করেছে বলে শোনা যায়নি। স্থানীয় মানুষজন ওই এলাকা থেকে কাউকে সাপ ধরতেও দেন না। দেখেশুনে মনে হয়, সাপেরাও জানে এই তাদের নিরাপদ আশ্রয়। এক সময় শিবাভোগ হত এখানে। এখানে এলে চোখে পড়বে তার বিশেষ চিহ্ন। একসময় এই মরাঘাটে পাকা মন্দির বলে কিছু-ই ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভক্তদের উদ্যোগে স্থায়ী মন্দির গড়ে উঠেছে। তবে দেখলে বোঝা যাবে, সে-ও অনেকদিন আগের কথা।

মরাঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণে কোনও ঘড়ি ছিল না। কিন্তু সেবায়েত তথা সাধু বাবাদের প্রতি নির্দেশ ছিল সূর্য ওঠার আগে স্নান সেরে পুজোয় বসতে হবে। এজন্য কোনও কোনও দিন তারা ভুল করে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। স্বামী শিবানন্দ বললেন, এক সময় 'বড় বাবা' বললেন, রাত চারটে থেকে চারটে পনেরোর সময় একটি ঘুঘু ডেকে ওঠে। একথা শোনার পর সাধুবাবারা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সেই ডাক শুনতে পেয়েছেন। আর ছিল একটি বাদুড়। সেও ঘড়ির কাজ করত সঠিক সময়ে। জানা গেছে, এই অলৌকিক পরিবেশে অনেক মহাপুরুষই বিচরণ করেছেন। অনেকেই পরবর্তী সময়ে শুনতে পেয়েছেন খড়ম পায়ে চলার আওয়াজ। তাই সাধুজনের মতে, এটি একটি জাগ্রত পীঠস্থান।

মরাঘাটের সাধুবাবার কাছে ৫১ পীঠের এক বিচিত্র ব্যাখ্যা জানা গিয়েছে। তিনি বললেন, ৫১ কোনও আলাদা বিষয় বা স্থান নয়, এক অন্ন থেকে ৫১-র উৎপত্তি। এক ব্যক্তি যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত হন, তেমনই মায়ের পীঠ বা আসনের ব্যাপ্তি

এক অথবা বহু। কোথাও হিংলাজ আবার কোথাও কেতুগ্রাম। অর্থাৎ তিনি রয়েছেন বিশ্বব্যাপী। সর্বত্রই তাঁর বিচরণ। তিনি মায়ারূপে বহু রূপ ধারণ করেছেন। আসলে তিনি এক, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ৫১। তাঁর বাইরে আমাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেজন্য সব পীঠস্থানই জাগ্রত। আলাদাভাবে বিশেষণে ভূষিত করে সেগুলিকে ক্ষুদ্র করা অনুচিত। কারও মানত থাকলে তারা এখানে এসে পশুবলি দেন। তবে নিয়মিত এখানে বলি হয় না। স্থানীয় ভাষায় হাঁড়িকাঠকে বলা হয় 'ফসলা'। অনেকের মতে, বহুলা দেবী গ্রামের মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁর সেবার জন্যই বহুলাপুর জায়গাটি নির্দিষ্ট ছিল। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত মতে, ওই জায়গাটির নাম 'বহুলা' এবং সেখানে সতীর বামবাহু পড়ায় একে মহাপীঠ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বর্ধমানের ইতিকথা (১৩২১) বইতে লিখেছেন, 'দেবী এবং তাঁহার বর্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।' কারও কারও মতে, বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের (বর্ধমান) ফুল্লরা এই দুটিকে নিয়ে যুগ্মপীঠ। নরেন্দ্রনাথ বসু কিন্তু এই মতকে সমর্থন করেননি। তিনি বলেছেন, 'যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন মূর্তি।'

শিবচরিতের মতে, যেখানে সতীর ডান কনুই পড়েছিল সেখানকার নাম রণখণ্ড। শক্তি তথা ভৈরবীর নাম বহুলাক্ষী, ভৈরবের নাম মহাকাল। আর বামবাহু যেখানে পড়েছিল সেই জায়গার নাম বহুলা। ভৈরবী বা শক্তির নামও বহুলা এবং ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা দেবীর মন্দিরের এক মাইলের মধ্যে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্তির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ভৈরব মহাকাল এখন নতুন একটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মা বহুলার ধ্যানমন্ত্র হল,

ওঁ ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং তনয়াং
পদ্ম সনস্থাং শুভম।
দোর্ভি কঙ্কতিকাং বরাভয় জুক্তাং
দার্শনিত্বাম শোভিতাং নিদ্রাবেশ
বসান চিত্বাং ত্রিনয়তাং
বাগযুক্ত পুত্রান্বিতাং গৌরাঙ্গীং
মনিহার কণ্ঠ নমিতাং।।
চিন্ত্যাং সুখং কামোদাং
ওঁ হ্রীং বহুলাক্ষী ভগবৎ দুর্গা দেব্যাঐ হ্রীং নমঃ।।

মা বহুলার প্রণাম মন্ত্র ঃ

ওঁ নম বহুলায়াং চতুর্ভুজাং পতিপুত্র সমন্বিতাং

নমস্তে ভীরুকঃত্ব্যা
সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী।।

মরাঘাটে বিশেষ পুজো হয় বোধ নবমী ও শিবরাত্রির দিনে। এখানে দুর্গাপুজোর তিনদিন সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিনও দুর্গার ধ্যানে বিশেষ পুজো হয়। মা যেহেতু এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছেন তাই এখানে কোনও দশমী নেই। যার আবাহন আছে তার বিসর্জন আছে। সেজন্য এই জায়গাটিকে বলা হয় 'অচল'। কারণ, এখানে কোনও আহ্বানও নেই আবার বিসর্জনও নেই।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : কাটোয়া, আহমেদপুর রেলপথে দশ মাইল দূরে নিরোল স্টেশনে নেমে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম। কাটোয়া থেকে কেতুগ্রামের দূরত্ব মাত্র সতেরো কিলোমিটার। কেতুগ্রামে বাস থেকে নেমে হেঁটে বা সাইকেল রিকশায় পীঠস্থানে যাওয়া যায়। এখান থেকে সব চেয়ে কাছের রেলস্টেশন, কাটোয়া-আহমদপুর শাখার অম্বলগ্রাম।

থাকার ব্যবস্থা : কেতুগ্রামে যাত্রীনিবাস আছে। তবে কাটোয়ায় থাকার ভালো হোটেল আছে।

মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরী

ত্রিভুবনে অন্যতম এ'ভারত ভূমি।
দেবদেবী কৃপাধন্য বঙ্গমাতা তুমি।।
পুরাণে রয়েছে গাঁথা কত না কাহিনী।
পুণ্যসাক্ষী ভাগীরথী; পশ্চিমবাহিনী—
সুজলা-সুফলা তীরে গ্রাম 'কিরীটকণা'।
'কিরীটেশ্বরী' নামে রয়েছে বর্ণনা।।
মুর্শিদ-আবাদ জেলা; নবগ্রাম থানা;
বিশ্বমাতার পীঠ এ'পুণ্য ঠিকানা।।
যবে......
স্বামীর নিন্দায় 'সতী' দেহত্যাগ করে।
শিবির ভৈরব নৃত্য দক্ষযজ্ঞাগারে।।
সুদর্শনে ছিন্নভিন্ন পূর্ণ্য সতীদেহ।
একান্নটি অংশ হ'ল পতিত সে গেহো।।
মর্তভূমি বুকে ধরে সেই অঙ্গ যত।
একান্ন পীঠের জন্ম হয় সেইমত।।
তন্মধ্যে অন্যতম 'কিরীটেশ্বরী' ধাম।
শক্তিরূপী মা বিমলা; লহো হে প্রণাম।

এই মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নাম বিমলা এবং ভৈরব হলেন সংবর্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত 'তন্ত্রচূড়ামণি' গ্রন্থে এই মহাপীঠের উল্লেখ আছে। 'পীঠ নির্ণয়' গ্রন্থে বলা হয়েছে।

ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা
কিরীটসহ কিরীটতঃ।
দেবতা মিলা নাম্নী
সংবর্তো ভৈবরস্তথা।।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ আছে,

কিরীটকণায় পড়ে কিরীটস্বরূপ
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধিরূপ।।

ভারতচন্দ্রের মতে জায়গাটির নাম কিরীটকোণা। দেবীর নাম ভুবনেশী, ভৈরবের নাম সিদ্ধিরূপ। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, জায়গাটি অবস্থিত মুর্শিদাবাদে। হাজারদুয়ারীর উলটোদিকে নদী পার হয়ে এলে পড়বে ডাহা পাড়া। সেখান থেকে আধক্রোশ দূরে কিরীটকোণা (মতান্তরে কিরীটকণা)। গ্রামের নাম বটনগর। এই একবিংশ শতাব্দীতেও গ্রামের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। অর্থনৈতিক ভাবে বিধ্বস্থ। মন্দিরটি অবস্থিত কাঁচারাস্তায়। বিজলি বাতির চিহ্ন দেখা যায় না। ইদানীং মন্দির চত্ত্বরকে ঘিরে কয়েকটি স্থায়ী তথা পাকা দোকান ঘর হয়েছে। কিরীটেশ্বরী প্রাঙ্গণে রয়েছে দেবীর নতুন ও পুরোনো মন্দির। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক মতে, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত হয়ে সতীর মাথায় থাকা কিরীট (মুকুট) এই কিরীটকণা বা কিরীটদেশে পড়েছিল। তান্ত্রিক মতে এটি একান্ন পীঠের অন্যতম।

মহানীলতন্ত্রে কিরীটতীর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই তন্ত্রের পঞ্চম পটলে বলা হয়েছে,

'কালীঘাটে, গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাঘে লিঙ্গবাহিনী।।

দেবী ভাগবতের অন্তর্গত দেবীগীতায় মুকুটেশ্বরী নামটি উল্লেখ করা আছে এবং জায়গাটির নাম বলা হয়েছে 'মাকোট'। অনেকের ধারণা, মুকুট থেকে মাকোট শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। এখানে দেবীর কোনও অঙ্গ না পড়ায় 'শিবচরিত' গ্রন্থে এক উপপীঠ বলা হয়েছে। শিবচরিত মতে, দেবীর নাম ভুবনেশী, ভৈবরের নাম কিরীটী, মতান্তরে সিদ্ধিরূপ বা সিদ্ধরূপ।

মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দিলীপ ভট্টাচার্য জানালেন, মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে প্রাচীন স্থান হল এই কিরীটেশ্বরী মন্দির। যে সময় দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল সেই সময় কিরীটেশ্বরীতে দেবীর 'কিরীট' পড়েছিল। অনেকে ভাবেন, কিরীট হচ্ছে মাথার মুকুট। কিন্তু আসলে কিরীট হল "কপালের ওপরে শিরের নীচের সংযোগস্থল"। এই অংশটিই এখানে শিলারূপে রক্ষিত আছে। প্রাচীনকালে এই শিলা বর্তমান মন্দিরের পাশে পুরোনো মন্দিরে রাখা ছিল। সেই মন্দির কালের গতিতে ধ্বংস হয়ে যায়। এই শিলা তখন অবহেলিত অবস্থায় পূজিত হচ্ছিল। বর্তমান মন্দিরটি তখন ছিল জঙ্গলে ভরা। এখানে রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ রায় পাঁচটি নরমুণ্ড এনে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে সাধনা করতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মায়ের দর্শন লাভ। সাধনা শেষ হয়ে যাবার পরে গভীর রাতে মাকে দেখা দেবার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করে বলেন, আমি পরিচ্ছন্ন ভাবে সব ক্রিয়া করেছি। কিন্তু সময় না হওয়ায় তিনি দেবীর দর্শন লাভে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

একসময় রাজা রামকৃষ্ণ দুঃখে, অভিমানে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করলেন। তখন দেবীর দৈববাণী হল, তোমার সময়, কাল, স্থান ঠিক হয়নি। সময় কাল হলেই তুমি আমার দর্শন পাবে, বাবা। 'বাবা' ডাকে সম্বোধিত হলে তিনি শান্ত হলেন। কিন্তু তখনও তিনি জানেন না, কবে, কোথায় তিনি মায়ের দর্শন পাবেন। সেই দৈববাণীর পর তিনি বাংলাদেশের নাটোরে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনপক্ষ (মতান্তরে তিন মাস) করতোয়া নদীর ধারে যে পীঠস্থান আছে, সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করেন। সেখানেই তাঁর মাতৃরূপ দর্শন হয়। কিন্তু রাজার পরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার সুবাদে রানী ভবানীকে মা স্বপ্নে দেখা দেন। মা তাঁকে বলেন, তুমি এখানে মন্দির তৈরি কর। রানীমা কিরীটেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন, মন্দির প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ধন্দে পড়ে গেলেন রানীমা। তিনি ভাবলেন, মা আমায় আদেশ দিয়েছেন মন্দির তৈরি করার জন্য অথচ তা প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়ে আছে। আমি কী করে মায়ের আদেশ ছাড়া ভিটে ছেড়ে শিলা নিয়ে যাব। মনে মনে আরও ভাবলেন, এই শিলাকে বাঁচাতেই হবে, নাহলে পরবর্তী সময়ে তাকে কেউ চিনতেও পারবে না। তখন তিনি ধ্বংসের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে পঞ্চমুণ্ডির আসন থেকে এক ইঞ্চি ওপরে স্থাপন করেন। শিলা ধোওয়া জল থাকত পঞ্চমুণ্ডির কুণ্ডে। গর্ভ তৈরি করে তিনি তার ভেতরে শিলাকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। সেখানে সৃষ্টি করিয়ে দিলেন মাতৃরূপ। রানী ভবানী মায়ের একটি মূর্তিও দিয়ে গেছেন। সেটি ওঁর সময়ে না তাঁর আগে তৈরি হয়, তা জানা যায় না। সেই মূর্তি অষ্টধাতুর, সোনার মুকুট দিয়ে তৈরি। পৌষ মাসের চারটি মঙ্গলবার দুপুর একটার পর এই মূর্তির অধিষ্ঠান হয়। সেটি একটি গোপন জায়গায় সারাবছর রাখা থাকে।

শোনা যায়, নবাব মীরজাফর যখন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন, তখন মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে মা কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

শঙ্করাচার্যের 'মঠান্মায়' গ্রন্থে তাঁর সভাপতি মঠ চতুষ্টয়ে তন্ত্রে পীঠমালায় বর্ণিত দেবদেবীদের কথা বলা হয়েছে। কোনও কোনও বিদগ্ধ গবেষকদের মতে, খ্রীস্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দে ভগবান শঙ্করের জন্ম হয়। এজন্য আনুমান করা যেতে পারে, খ্রীস্ট জন্মের ৪৫০ বছর আগেই পীঠগুলির মাহাত্ম্য প্রকাশ হতে শুরু করে। ৪০০ অব্দে গুপ্ত বংশীয়েরা ভারতের রাজা হন। তাদের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। এই রাজত্ব অনেকদূর অবধি ছড়িয়ে ছিল। রাঢ়দেশ, বঙ্গভূমিও তাদের অধিকারে ছিল। এক সময় রাঢ়দেশের কর্ণ-সুবর্ণেও ওরা রাজধানী স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি ও কর্ণ-সুবর্ণ একই স্থান। এই গুপ্ত বংশীয় রাজারা শক্তির উপাসক ছিলেন। সেই সময়কার মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার সূত্রে এ-তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের রাজত্বের সময় থেকেই দেবী কিরীটেশ্বরীর প্রচার প্রাধান্য পায়। এই রাজারা খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ থেকে খ্রীস্ট পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেন। শূর বংশ, পাল বংশ, সেন বংশের সময়েও দেবীর অস্তিত্ব লোপ পায়নি।

মুসলমান রাজাদের আমলেও এই জায়গাটি তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। গৌড়ের পাঠান রাজাদের আমলেও দেবীর গৌরব অটুট ছিল। জানা গিয়েছে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল বৈষ্ণব ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা দেবী কিরীটেশ্বরীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মঙ্গল বৈষ্ণবের জীবিতকালে সম্রাটের আসনে আসীন ছিলেন হোসেন শাহ।

ভৈরব মন্দিরের সামনে যে শিবমন্দির আছে সেখানে একটি পাথরের ফলকে লেখা আছে, ১৬৮৭ শকাব্দে সভারামের ছেলে রঘুনাথ এই শুভ মঠ স্থাপন করেন। ১৬৮৭ শকাব্দে বা ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের বছর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দূর দেশ থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে এসে সাধনা করতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবেরাও দেবী কিরীটেশ্বরীকে বিশেষ সম্মান করতেন। সৈয়র মুতরীক্ষণে লেখা আছে, নবাব মীরজাফর তাঁর প্রিয় দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে জীবনের শেষ সময়ে দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রিয়াজ-উস্ সালতিনে কিরীটকণাকে 'তিরুণ-কণা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চাননের কায়স্থ চারিকায় লেখা আছে,

ডিহি কিরীটেশ্বরী মধ্যে কিরীটেশ্বরী গ্রাম।
মহাপীঠ হয় সেই মহামায়ার ধাম।

বঙ্গাধিকারীদের পূর্বপূরুষ ভগবান রায় 'কানুনগো' পদলাভ করে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে যে জায়গীর পেয়েছিলেন তার সনদে কিরীটেশ্বরীকে বলা হয়েছে ভবানী স্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবীর সেবায়েত ছিলেন জনৈক বৈষ্ণব। তাঁর নাম ছিল মঙ্গল। জানা গিয়েছে, তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

রাজা রাজবল্লভ এখানে দুটি শিবমন্দির তৈরি করান। কথিত আছে, রাজা রাজবল্লভকে নবাব মীরকাশিম যেদিন গঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন সেদিন একটি শিবলিঙ্গ ফেটে যায়। আরও শোনা গেছে, রাজা রাজবল্লভের ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলে একটি বড় শিবলিঙ্গ আপনা-আপনিই ফেটে যায়। দেবী কিরীটেশ্বরীর ভৈরব হিসাবে যে মূর্তির পুজো করা হয় সেটি আসলে একটি বুদ্ধমূর্তি। গ্রামের মধ্যেই রয়েছে 'গুপ্তমঠ' নামে আর একটি মন্দির।

রাজা রামকৃষ্ণ রায় প্রত্যেক দিন রাতে মুর্শিদাবাদে তাঁর রাজধানী বড়নগর থেকে দেবী কিরীটেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটি খাল কাটিয়েছিলেন। রানী ভবানীর মেয়ে তারাদেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরের পিছনে একটি শুকনো বেলগাছের তলায় তাঁর পঞ্চমুণ্ডীর আসন রাখা আছে। জনশ্রুতি হল, যে শবের ওপর বসে রাজা রামকৃষ্ণ শবসাধনা করতেন সেটি বড়নগরে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় পোঁতা আছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে ভৈরব হিসাবে যাঁকে পুজো করা হয় সেটি আসলে একটি বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিটি 'ধ্যান বুদ্ধমূর্তি' নামে পরিচিত। অন্যান্য ভৈরব মূর্তির সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। পাল বংশীয়রা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। অনুমান

করা হয়, তাদের আমলে এই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে। 'বঙ্গাধিকারী' নামে চিহ্নিত উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ভগবান রায় ও তাঁর বংশধরেরা বাংলা, বিহার, ওড়িশার কানুনগো পদে আসীন হন। ভগবান রায়, রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় প্রধান কানুনগো পদে উন্নীত হন ও সম্রাট আকবর তাঁকে 'বঙ্গাধিকারী' উপাধি দেন। তিনি বাদশাহের কাছ থেকে যে সমস্ত দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তি জায়গির হিসাবে পেয়েছিলেন তার মধ্যে কিরীটেশ্বরীও ছিল। সনদে কিরীটেশ্বরীকে 'ভবানী যান' নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বংশের দর্পনারায়ণ রায় সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় প্রধান কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ঢাকায় আসেন। তখন বাংলার আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ্-শান বাংলার সুবাদার ছিলেন। অন্যদিকে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন মুর্শিদকুলি খাঁ। কিছুদিনের মধ্যে দেওয়ান ও সুবাদারের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। এই অবস্থায় দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ রাজার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুখসুদাবাদে (পরবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদ) তাঁর দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। বলা বাহুল্য, একইসময়ে কর্মসূত্রে মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে ডাহাপাড়া গ্রামে বাসভবন তৈরি করান দর্পনারায়ণ রায়। সেখান থেকে আধক্রোশ দূরে দেবী কিরীটেশ্বরীর পীঠস্থান। ওই সময় পুরো জায়গাটি জঙ্গলে ভরতি ছিল। দর্পনারায়ণের তত্ত্বাবধানে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত 'গুপ্তমঠ' নামে প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করান। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। তাঁর উদ্যোগে সেখানে পশ্চিমদ্বারী মন্দির, কয়েকটি শিবমন্দির ও ভৈরব মন্দির স্থাপিত হয়। তাঁর উদ্যোগেই মন্দিরের কাছে 'কালীসাগর' নামে একটি বড় দীঘি কাটিয়ে ঘাট বাঁধানো হয়েছিল। তিনিই কিরীটেশ্বরী মেলার প্রবর্তন করেন। সেই মেলা আজ পৌষমাসের প্রতি মঙ্গলবারে মন্দির প্রাঙ্গণে বসে।

দর্পনারায়ণের ছেলে শিবনারায়ণ যাতায়াতের সুবিধার জন্য কিরীটেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার পথে বড় সেতু তৈরি করান। আজও তার চিহ্ন বর্তমান। দেবী মন্দির থেকে একটু দূরে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পুকুর পাড়ে একটি ভাঙা মন্দির আছে। তার নাম 'বাঁকা ভবানীর মন্দির'। এখানে একসময় মহিষমর্দিনীর মূর্তি ছিল। বর্তমানে তা স্থানান্তরিত হয়েছে। ব্রহ্মানন্দ গিরি ও আরও কয়েকজন সন্ন্যাসী এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। মন্দিরের পূর্বদিকে বেলতলা। গুপ্ত মন্দিরে দেবীর বার্ষিক উৎসব হয় দুর্গাষ্টমীর দিনে। ওই সময়ে দেবীর শিলার কাপড় বদলানো হয়।

মন্দিরের পুরোহিত জানালেন, প্রতি অমাবস্যার দিন বেশি রাতে মায়ের পুজো করি। অমাবস্যার আগের দিন শহরে গিয়ে সামান্য কিছু চেরিফল, কলা, আঙুর মায়ের পুজোর জন্য নিয়ে আসি। একদিন অমাবস্যার আগে তাই করেছি। কিন্তু কাঁচা মিষ্টি আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। যখন স্মরণে এল, তখন আমার কাছে পয়সা ছিল না। ভাবলাম দোকানদারের কাছ থেকে বাকিতে নেব। পরক্ষণেই ভাবছি, বাকিতে নিতে গেলে হয়তো এমনিতেই দিয়ে দেবে। এরকম দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় মিষ্টি না কিনে বাড়িতে ফিরে যাই।

ফিরে আসায় ভাবলাম, সারাদিন তো অমাবস্যা থাকবে। কাউকে না কাউকে দিয়ে সেটা আনিয়ে নেব। কিন্তু এধরনের ভাবনার কথাও আর মনে নেই। মাকে ঘি মাখিয়ে স্নান করিয়ে আহ্নিক করতে বসেছি। এমন অবস্থায় দেখলাম কয়েকজন ভক্ত প্রায় এক কেজি ওজনের মিষ্টির বাক্স এনে বলছেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এটা দিয়ে পুজো দিয়ে দিন। মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে ভাবলাম, রাতের পুজোর জন্য কিছুটা মিষ্টি সরিয়ে রাখব। কিন্তু কী জানি কেন সবটাই মাকে নিবেদন করে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ওই ভদ্রলোকদের একজন মন্দিরে ফিরে এসে বললেন, একটা মিষ্টির প্যাকেট গাড়িতে থেকে গিয়েছিল এটা আপনি অন্য কোনও সময় পুজোয় দিয়ে দেবেন। বুঝলাম, মা অন্তর্যামিনী। তিনি নিজের জিনিস নিজেই আনিয়ে নিলেন।

একবার অম্বুবাচীর মধ্যেই অমাবস্যা পড়েছিল। ঘরে বৃদ্ধা মা। তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, অম্বুবাচীর মধ্যে অন্নভোগ দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু ভক্তদের তো অন্ন ভোগ দেব বলে কথা দিয়েছি। তাই মনে মনে স্থির করলাম, ভক্তদের জন্য সামান্য ভোগ তৈরি করে নিয়ে যাব। আর বাকিটা তো ওঁরা মন্দিরের বাইরে রান্না করে নেবেন। ওই সামান্য ভোগটা মাকে নিবেদন না করে মন্দিরের এক কোণায় রেখে দেবে আর সেটাই প্রসাদ বলে দিয়ে দেব। ভাবনা মতো সেখানে অন্ন ভোগ রেখে দিলাম। অদ্ভুত মায়ের লীলা। ভক্তদের একজন বললেন, ঠাকুরমশাই ওই ভোগ আমাদের একজনের পায়ে ঠেকে গেছে, ওতে ভোগ আর দেবেন না।

এই ভাবেই আমার, মায়ের সম্পর্কে অনুভূতি হয়েছে। এখানে দক্ষিণা কালী ধ্যানেই মায়ের পুজো হয়। মহাকালের ধ্যানেও শিবের ভোগ নিবেদন করা হয়। তারপর ডাকিনী-যোগিনীর ধ্যানে ফুল বেলপাতাসহ নৈবেদ্য নিবেদন করার পর আদ্যাস্তব পাঠ করি ও কিঞ্চিৎ চণ্ডীপাঠ করি।

খগেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য (বর্তমান পুরোহিতের বাবা) তাঁর ষোলো বছর থেকে ছিয়াশি বছর পর্যন্ত পুজো করেছেন। একই সময়ে তিনি একশ'র বেশি বলি দিয়েছেন। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি, দৈহিক নয়, বাবার এই মানসিক শক্তি কে ধরে রেখেছিল? এখানকার নিয়ম হল, আমরা পুজো করব, আমরাই বলি দেব। এখানে প্রতিদিন বলি হয় না। যখন ভক্তরা বলির জন্য নিয়ে আসে, তখন তা উৎসর্গ করা হয়। এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, রাস্তার সংস্কার হলে ভক্ত সমাগম বৃদ্ধি পাবে আর এখানে যদি ভক্তদের থাকার জন্য একটি আবাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ উপকৃত হবেন।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে মুর্শিদাবাদ ১৯৭ কিলোমিটার। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে সাহা নগরের খেয়া পার হয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটাপথে বা রিকশায় ৫ কিলোমিটার। বারহারোয়া লাইনে হাওড়া থেকে ২১৩ কিলোমিটার দূরে ডাহাপাড়াধাম।

সেখান থেকে হেঁটে বা ভ্যান রিকশায় (যদি পাওয়া যায়) কিরীটেশ্বরী মন্দিরে যাওয়া যায়। হাওড়া থেকে আজিমগঞ্জ (২১২ কিলোমিটার) জংশনে নেমে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় ভ্যানরিকশায়। তবে অবশ্যই যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট ভ্যানরিকশা ভাড়া করে যাওয়া উচিত।

মন্দির প্রাঙ্গণে বা কাছে পীঠে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। রাত্রিবাস করতে হলে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ বা আজিমগঞ্জ শহরে থাকতে হবে।

মুসলমান-শিখ-হিন্দু নির্বিশেষে

সকলের মা দেবীবর্গভীমা

তাম্রলিপ্তে তখন রাজত্ব করতেন ময়ূরবংশীয় রাজারা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা। অন্য মতে, অশ্বমেদের ঘোড়া আটকানোর জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাম্রলিপ্তে। তাম্রলিপ্তের সেই রাজার নাম তাম্রধ্বজ। আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত। তাই মদনমোহনের মধ্যস্থতায় অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটকে রাখেননি তাম্রধ্বজ। তাই মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি হয়ে যায় সেদিনই। সেই প্রবলপরাক্রান্ত রাজার হুকুম মাছ চাই। জেলেনি তাই রোজ মাছ দিয়ে যান রাজবাড়িতে। একদিন বনের মধ্যে দিয়ে মাথায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে আসার সময় তিনি জলে ভরা গর্ত দেখতে পান। জল দেখেই আঁচলা ভরা জল ছিটিয়ে দেন মাছগুলির গায়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সেই জলের ছোঁয়ায় মুহূর্তের মধ্যে মাছগুলি জ্যান্ত হয়ে ওঠে। শুধু জ্যান্ত হয়ে ওঠে তাই নয়, এমনভাবে তারা লাফাতে থাকে যে সেগুলিকে ঝুড়ির মধ্যে রাখাই দায় হয়ে ওঠে। একসময় রাজাও এই অলৌকিক কাণ্ডের কথা শোনেন। ডেকে পাঠান জেলেনিকে। বলেন, কোথায় কোন জলে মাছ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে দেখাতে পারবে? জেলেনি বললেন, পারব মহারাজ। তিনি রাজা তাম্রধবজকে নিয়ে যান সেখানে।

রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, সেই জলে ভরা গর্তের জায়গায় রয়েছে একটি বেদি আর তার ওপরেই রয়েছে দেবীমূর্তি। মূর্তি দেখার পর সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে সেখানেই গড়ে ওঠে মন্দির। সেই দেবীই আজও পূজিতা হন দেবী বর্গভীমা রূপে।

এই কিংবদন্তি নিয়ে আরেকটি কাহিনী শোনা যায়। ময়ূরবংশের চতুর্থ রাজা গরুড়ধ্বজ প্রত্যেকদিন শোল মাছ খেতেন। জনৈক জেলে প্রতিদিন তাঁকে সেই মাছ দিতেন। একদিন কোনও কারণে তিনি রাজাকে শোল মাছ এনে দিতে পারেননি। তাই শুনে ক্ষুব্ধ রাজা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। রাজাদেশ শুনে ওই জেলে কোনোক্রমে জঙ্গলে পালিয়ে যায় সেখানে তিনি দেবী বর্গভীমার দর্শন পান। দেবী তাঁকে শোল মাছ জোগাড় করে শুকিয়ে রাখার এবং শুকনো মাছ প্রত্যেকদিন রাজবাড়িতে নিয়ে যাবার সময় একটি নির্দিষ্ট কুয়ো থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। একসময় জেলে আবার রাজবাড়িতে জ্যান্ত মাছ সরবরাহ করতে শুরু করে। বলাবাহুল্য, রাজবাড়িতে জ্যান্ত শোল মাছ সরবরাহ

করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। একসময় এই ঘটনায় রাজার সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। রাজার পীড়াপীড়িতে জেলে তাঁকে সেই অলৌকিক কুয়োর সন্ধান দেন। জেলের এই কাজে ক্ষুব্ধ দেবী একটি পাথরের মূর্তি হয়ে কুয়োর মুখে অবস্থান করতে থাকেন। সেই দেবীই হলেন বর্গভীমা। রাজা সেখানেই তৈরি করিয়ে দেন মন্দির।

আর একটি কিংবদন্তি হল, স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি বর্তমান দেবী বর্গভীমার মন্দিরটি তৈরি করান। মন্দিরটির গঠনশৈলী দেখে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা, কোনও বৌদ্ধ স্তুপকে এই মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কারও কারও মতে, সপ্তম শতকের প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্তে মহারাজ অশোকের যে প্রসিদ্ধ স্তম্ভটি দেখেছিলেন এটি তারই ওপর তৈরি।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত শিবহীন যজ্ঞের আয়োজক ছিলেন দক্ষ। ত্রিভুবনের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেও আমন্ত্রণ জানানো হল না জামাই মহাদেবকে। এমনকী নিমন্ত্রণ হল না সতীরও। তবু যজ্ঞের খবর পেয়ে বিনা আমন্ত্রণে বাপের বাড়ির এসে উপস্থিত হলেন দেবী সতী। তাঁকে দেখামাত্রই মহাদেবের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন যক্ষ। একসময় স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন সতী। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকে অধীর মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের মুণ্ডটা ছিঁড়ে একটা ছাগলের মাথায় বসিয়ে দেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপ লেগে রইল মহাদেবের সঙ্গে। তাঁর হাতেই লেগে রইল প্রজাপতি দক্ষের সেই ছিন্নমুণ্ড। এক তীর্থ আরেক তীর্থে, কত জায়গায় ঘুরলেন দেবাদিদেব। কী করবেন— তাই ভেবে ভেবে মহাদেব শুয়েছিলেন এক পাহাড়ের গুহায়। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নারায়ণ স্বয়ং। তিনি বললেন, তুমি যাও তাম্রলিপ্তি তীর্থে। সেখানে পাপহারী সরোবরে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আমায় আর বর্গভীমা দেবীকে পুজো দাও। তবেই খণ্ডন হবে ব্রহ্মহত্যার পাপ। নারায়ণের কথামত দেবাদিদেব এলেন তাম্রলিপ্তিতে। সরোবরে স্নান করে পুজো দিলেন দেবী বর্গভীমাকে। হাত থেকে খসে পড়ল দক্ষরাজার কাটা মাথা। সেই থেকেই এই সরোবরের নাম হয় শাপমোচন। একসময় দেবী মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যেত রূপনারায়ণ নদী। তারই গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সেই সরোবর।

স্মরণাগত কাল থেকে দেবী বর্গভীমা তাম্রলিপ্ত নগরে বিরাজিতা। একসময় তাম্রলিপ্তির বন্দরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। পুরাণের কথায় জানা যায়, পূতপবিত্র একান্ন পীঠের অন্যতম তমলুকের বিভাসক। শোনা যায়, দেবীর 'বাম গুল্‌ফ' অর্থাৎ বাম পায়ের গোড়ালি পড়েছে এখানে। অন্নদামঙ্গলে বলা হয়েছে,

বিভাসকে বামা গুল্‌ফ ফেলিল কেশব।
ভীমারূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব।।

ঋগ্বেদ দেবীসূক্ত-রাত্রিসূক্ত দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আছে। মহাভারত, হরিবংশে উচ্চারিত হয়েছে স্তব-বন্দনা। তিনি দশ মহাবিদ্যার 'তারা', দেবী বর্গভীমার প্রতিচ্ছায়া। তিনি ভক্তদের যুদ্ধক্ষেত্রে, অগ্নিদাহে, নদীতীরে, কাণ্ডারে, প্রবাসে, রাজরোষে-তস্কর ও

শত্রুসঞ্জাত ভয়ে সুরক্ষা প্রদান করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, 'দুর্গ-ভবসাগর-নৌ রসঙ্গা', অসঙ্গা মাগো, দুর্গম ভবসাগরে তরণীস্বরূপ তুমি। শিলালেখে ফুটে উঠেছে, শক্তিমন্দির ছিল ডাকিনী-যোগিনী পরিপূর্ণ, তাদের উচ্চগ্রাম ভয়াল কলরব আর কাপালিক শ্রেণীর আচারাদি উত্তাল করে তুলত সমগ্র অঞ্চলকে।

সুপ্রসিদ্ধ এই মন্দির এক উঁচু ভূখণ্ডে অবস্থিত। পশ্চিমমুখী মূল মন্দিরে পৌঁছাতে উঠতে হয় বাইশটি সিঁড়ি। দেউল 'সপ্তরথ' এবং সংলগ্ন জগমোহন 'চারচালা' রীতিতে তৈরি হয়েছে। সামনে রয়েছে নাটমন্দির। বড় দেউল ও জগমোহনের মাঝে 'অন্তরাল' ও 'যোগমণ্ডপ'। চার দেওয়ালে লক্ষ্য করা যায় টেরাকোটার অলঙ্করণ। কিছুদিন অন্তর অন্তর মন্দির সংস্কারের কাজে উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড় দেউলে ওড়িশার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবু 'বেকি' অংশ সামান্য বর্তুলাকারে ঊর্ধ্বমুখী, 'আমলক' খুবই ছোট। মন্দিরের মাথায় রয়েছে কনক-কলস। গর্ভগৃহে পূর্বদিকের দেয়াল সংলগ্ন উঁচু বেদিতে রয়েছেন দেবী বর্গভীমা। দেখলেন মনে পড়ে যায় পুরীর মন্দিরে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার অবস্থান। দেবী এখানে ভীমারূপা। তিনি বর্গভীমা। তবে অভিজ্ঞদের মতে, যিনি চতুবর্গের ফলদাতা, তিনিই দেবী বর্গভীমা। ভৈরবের নাম কপালী বা সর্বানন্দ। তিনি চতুর্ভুজা, শবের ওপর অবস্থান করছেন। ডানদিকের উঁচু হাতে খড়্গ, নীচের হাতের ত্রিশূল। বাঁদিকের উঁচু হাতে খপর, নীচের হাতে নৃমুণ্ড। দেবীমূর্তির সঙ্গে আনন্দেশ্বর ভৈরব, সিদ্ধেশ্বর ভৈরব, নিয়তি এবং দশভুজা মহিষমর্দিনী। মহিষের ওপর চতুর্ভুজা নিয়তি। মন্দিরের পশ্চিমদিকে নীচে সিঁড়ি, পাশে 'ভূতনাথ' শিবের দেউল। ১২৬০ সালে এই দেউলটি তৈরি করিয়ে দেন লাহোরের জম্মু পরগণার রামকোটের জনৈক মগলুরিয়া চৌধুরী। মন্দিরের সামনেই আছে একটি যজ্ঞ মন্দির। এটি তৈরি করিয়ে দেন এক পতিপুত্রহীনা বৃদ্ধা। শোনা যায়, তিনি সুতো বিক্রির মাধ্যমে পাওয়া অর্থের মাধ্যমে এটি তৈরি করান।

দেবী বর্গভীমার মন্দিরের ইটগুলি এই বাংলায় ব্যবহৃত ইটের থেকে আলাদা। অনেক বড় বড় পাথর দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করানো হয়। ছোট টুকরো পাথর এখানে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। তিরিশ ফুট উঁচু ভিতের ওপর এই অনন্য কারুকাজ করা মন্দিরটির উচ্চতা ষাট ফুট। এক টুকরো পাথরে তৈরি চূড়া ও চক্র ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে ভেঙে পড়ে যায়। তারপর উপযুক্ত পাথরের অভাবে ইট দিয়ে তৈরি করা হয়।

অনেকের মতে, এই মন্দিরটি আসলে কোনও বৌদ্ধ মন্দির। তাদের মতে, সপ্তম শতকের প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্তের রাজা অশোকের যে প্রসিদ্ধ স্তম্ভটি দেখেছিলেন এটি তারই ওপর তৈরি। 'তমোলুক ইতিহাস'-এর প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন, এই মন্দিরের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে এই মন্দিরকে 'বিশ্বকর্মার নির্মিত' বলিয়া জল্পনা করে। ইহার বাহিরের গঠনপ্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভেতরের গঠন বৌদ্ধ

বিহারের সদৃশ এবং অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। সম্মুখে প্রধান বা মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল, যাহাতে ভিক্ষুগণ একা একা নির্জনে উপাসনা করিতেন এবং সম্ভবত প্রধান বিহারের শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত (সর্ব-ধর্ম-সার) উপদেশ প্রদান করিতেন। পরে বৌদ্ধগণ কর্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে তাহাদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার, করিয়া পূর্বদিকের প্রধান দ্বারসহ পার্শ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র বিহার ভগ্ন করিয়া মধ্যের মূল বিহার ও পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বিহারের উপর পশ্চিমদ্বারী করিয়া এক মন্দিররূপে নির্মাণ করিয়াছেন।

পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নন্দলাল দে'রাও বর্গভীমা মন্দিরটি যে আসলে বৌদ্ধবিহার ছিল, সেই বিষয়ে একই মত পোষণ করেছেন।

কথিত আছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সওদাগর একসময় রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাম্রলিপ্ত বন্দরে নামেন। ঘটনাচক্রে তিনি জানতে পারেন, নগরপ্রান্তে একটি কুণ্ডে ডোবালেই পিতলও সঙ্গে সঙ্গে সোনায় পরিণত হয়। একদিন দেখলেন, একজন লোক একটি সোনার কলসি নিয়ে যাচ্ছে। লোকটি বলে, জঙ্গলের মধ্যে একটি আশ্চর্য কুয়ো আছে। সেখানকার জলে পিতল ডোবালেই তা সোনা হয়ে যায়। ধনপতি সওদাগর তার কাছে জেনে নিলেন সেই আশ্চর্য কুয়োর সন্ধান। ধনপতি এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। ব্যবসা করে ফেরার পথে তিনি তমলুকে দেবী বর্গভীমার মন্দিরটি তৈরি করান। মন্দিরকে কেন্দ্র করে আরও একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনা যায়। একবার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নদীগর্ভে মন্দিরটি তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু একসময় রূপনারায়ণের সেই তাণ্ডব মন্দিরের তলায় এসে থেমে যায়। আস্তে আস্তে স্রোত দিক-পরিবর্তন করতে থাকে। ধীরে ধীরে সরে যায় অনেক দূরে। ডবলু ডবলু হান্টারের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, *[Extract adopted from W. W. Hunter (A statistical Account of Bengal Vol. 3) 1876. J. D. Beglar (Revised list of Ancient Mounuments in Bengal) PWD. 1886 & L.S.S. O' malley (Bengal District Gazetteers, Midnapore) 1911.]*

It is known that at the dawn of history Tamralipta was a great sea port. In the Mahabharata epic the entity is admitted...famous city and kingdom of great antiquity...frequently mentioned in Jaina, Buddhist & Brahmanical Sanskrit Works. Emperor Ashoka (261 B.C.) erected a stupa here... Plotemy (150 A.D.) noticed it in his geography...several times referred to by mediaeval Chinese Pilgrims. Fa-Hian (405-411 A.D.) described it as being on the sea mouth, Hiuen Tsiang (629-643 A.D.) said that it lay near an inlet of the sea. I-tsing landed here at the close of the same century...other references in sanskrit the Dudhpari

rock inscription of Udaymana, which is not later than the 8th or 9th century A.D. Numbers Wealthy merchants and ship-owners resided here, and carried on an extensive over-sea trade...and almost forgotten name of the town, Ratnakar or Ratnabali, or the Mine of Gems, alone commemorates its former wealth.

The principle object of interest in the town is the temple of Barghabhima, who represents 'Tara' one form of Sakti...situated on the banks of the Rupnarayan river, in 22°17'50" north latitude and 87°57'30" east longitude. Some say that it was built by Biswakarma, the engineer of the gods. The temple is on a raised platform accessible by a flight of strairs consisting of 22 steps. The skill and ingenuity displayed in the construction of the temple still attract admiration. The idol is formed from a single block of stone with the hands and feet attacked to it. The goddess is represented standing on the body of Siva, and has four hands. The temple is divided into four apartments; Inner Sanctuary. Hall of Audience, Hall of Sacrifice, and dancing Hall. There is a small raised covered passage, where Pandits meet to discuss religious subjects. The whole is covered with a dome-shaped roof. Stones of enoromous size were used...and raise the spectator's wonder as to how they were lifted at a time when the aid of machinery was unknown. On the top of the temple, although dedicated to the wife of Siva, is the sacred disc. of Vishnu, surmounted by the form of a peacock. Outside the temple, but within its endosure, is a Kelikadamba tree, supposed to have the virtue of redeeming women from barrenness.

The Marhattas, when ravaging lower Bengal, and plundering every place that they came across, when they reached Tamluk, left it untouched, and made many valuable offerings to the temple, out of fear of the wrath of the goddess. Even the river Rupnarayan itself is believed to still its waters as if flows by the temple, while a short distance above or below the shrine the waves one turbulent. The river has on several occasions encroched near the temple, and once reached to within ten cubits of the walls; the stream was allowed no nearer approach. As often as it passed the line, the waters were forced back by the Divine will.

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম।
দক্ষিণে খড়্গাশূলঞ্চ তীক্ষ্ণ ধারো দুরাসদঃ।।
বামে খর্পরমুণ্ডঞ্চ লোলজিহ্বা ত্রিলোচ নাম্।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানাং ভীমাদেবী শবাসনাম্।।

এই হল দেবী বর্গভীমার ধ্যানমন্ত্র। ধবনির প্রকাশ অক্ষরে, আসলে অক্ষরই হল বীজ। মাতৃশক্তির যাবতীয় গূঢ়তত্ত্ব লুকিয়ে আছে এই অক্ষরের মধ্যে। দেবী বর্গভীমা মন্দিরে কোনও বন্ধ দরজা নেই, সব দ্বারই খোলা। শুধু অক্ষরগুলি উচ্চারণ করলেই পৌঁছে যাওয়া যায় মায়ের চরণে।

১৫৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা জয় করার অভিযানের উদ্দেশ্যে 'কালাপাহাড়' তমলুকে আসেন। সেইসময় তিনি দেবীদর্শন করার পরে আনন্দিত হয়ে একটি দলিল বা 'বাদশাহী পঞ্জ' দেন। কালাপাহাড়ের দেওয়া ওই পাঞ্জা বর্তমানে আইনগত জটিলতার কারণে মহামান্য হাইকোর্টে জমা রাখা আছে। শোনা যায়, কালাপাহাড় যখন একের পর এক হিন্দুমন্দির ধবংস করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ওড়িশার দিকে, তখন তমলুকের বর্গভীমা মন্দির দর্শন করে ভয় পেয়ে সেখানে ষোড়শোপচারে পুজো এবং অনেক রত্নালঙ্কার দেবীর পায়ে সমর্পণ করেন।

জেলার থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা তমলুকের (১২৮০ সন) সম্পাদক ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত রচিত 'তমলুক ইতিহাস' (১৯০২ সাল) বইটির মাধ্যমে জানা যায় অজানা আরও কিছু তথ্য—

ধনপতি নামে এক সওদাগর একদা তাম্রলিপ্তের রূপনারায়ণ নদের মোহনায় তাহার বাণিজ্য জাহাজ (অর্ণবপোত) নোঙর ও অবস্থানকালে এক ব্যক্তির হাতে সোনার জগ দেখিয়া প্রশ্নোত্তরে জানিতে পারেন ঐ ব্যক্তি অনুরূপ একটি গর্তের (জলাধার) বারি সিঞ্চনে পিতলের মগকে সোনায় রূপান্তর করেছে। ধনপতি সওদাগর অবিলম্বে তার জাহাজে রক্ষিত সমস্ত পিতলের পণ্য বাসনাদি ঐ বারি সিঞ্চনে সোনায় রূপান্তরিত করে সেগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থে ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যেতে পারে, কে এই কালাপাহাড়, যিনি অজস্র হিন্দু দেবমন্দির ধবংস করলেও অক্ষয় রেখেছিলেন দেবী বর্গভীমার মন্দির। আনুমানিক ১২৬০ সনে জালাল শাহের সময়ে তাঁর অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এঁদের উপাধি ছিল 'ভাদুড়ী'। কৃত্তিবাসের লেখায় তাঁর পূর্বপুরুষ জগদানন্দ রায়ের নাম উল্লেখ আছে। কালাপাহাড়ের হিন্দু নাম ছিল, কালাচাঁদ রায়। তাঁর বাবার নাম নয়নচাঁদ রায়। তিনি ছিলেন গৌড়ের বাদশাহের ফৌজদারি পদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কালাপাহাড়ের ছোটবেলার ডাক নাম ছিল 'রাজু'। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি মামাবাড়িতে বড় হন। সবদিক থেকেই রূপে, গুণে, দৈহিক শক্তি সামর্থ্যে ব্যতিক্রমী পুরুষ হিসাবে তিনি চিহ্নিত হন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ প্রতিদিন সকালে সোনার কোশাকুশি নিয়ে মহানন্দার জলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও স্নান করতে যেতেন। সেইসময় নবাবের সতেরো বছরের অপূর্বসুন্দরী রাজকুমারী দুলারী বিবি কালাচাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে যান। একদিন নবাব নন্দিনীর এই ভাবনার কথা মেয়ের বান্ধবীর মাধ্যমে নবাবের কানে এসে পৌঁছায়। এককাটিয়ার ভাদুড়ী বংশের (যে বংশের ছেলে

কালাচাঁদ) অনেক কুবকের সঙ্গে ইতিপূর্বে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই নবাব রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন কালাচাঁদকে। প্রস্তাব দিলেন দুলারী বিবিকে বিয়ে করার আগে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক। কিন্তু নবাবের মুখের ওপর কালাচাঁদ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কালাচাঁদের এ-হেন আচরণে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করা হয়। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বধ্যভূমিতে। আদেশ দেওয়া হয়, তাঁকে শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলা হোক। এইসময় দুলারীবিবি কোনওভাবে সেখানে পৌঁছে ঘাতকের পায়ে ধরে বললেন, ওঁর প্রাণ নেওয়ার আগে আমাকে হত্যা করো—তারপর ওঁকে স্পর্শ করবে। দুলালীর আবেদনে জীবন ফিরে পেলেন কালাচাঁদ। প্রেমিকার এই আচরণে কালাচাঁদের মনের পরিবর্তন হল। তিনি দুলারীকে বিয়ে করলেন, যদিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেননি।

সমস্যা হল, সমাজ তাদের এই বিয়ে মেনে নিল না। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সমাজের কাছে থেকে তীব্র আঘাত পান। শেষে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে প্রত্যাদেশের আশায় ধরনা দিয়ে সাতদিন পড়ে থাকলেন। কিন্তু পাওয়া গেল না কোনও স্বপ্নাদেশ। পক্ষান্তরে পাণ্ডারা নির্যাতন করে তাঁকে তাড়িয়ে দিল মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। ক্ষোভে, দুঃখে গৌড়ে ফিরে এসে কালাচাঁদ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে 'মোহম্মদ ফর্মুলা' নাম গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম ধবংসে মেতে ওঠেন। তাঁর আক্রমণে ধবংস হল শয়ে শয়ে হিন্দু বিগ্রহ ও মন্দির। তাঁর অমানুষিক অত্যাচারে তাঁকে সাধক... 'কালাপাহাড়' নামে সম্বোধন করতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয়, সার্বিকভাবে হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় ভয়ে অথবা ভক্তিতে মাথা লুটিয়ে দেন দেবী বর্গভীমার চরণে। স্তম্ভিত পাঠান সৈন্যরা দেখলেন, সুলেমান কারনানির সেনাপতি কালাপাহাড় এই প্রথম একটি তথাকথিত হিন্দু মূর্তিকে ধবংস না করে একটি পাঞ্জা উপহার দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। আজও এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দেবী মা বর্গভীমা আদতে দেবী দুর্গারই আর এক রূপ। পুরাণে বলা হয়েছে, সত্যযুগে মহিষাসুরের মতোই এক মহাশক্তিশালী অসুর দুর্গা, তপস্যা বলে অমিত শক্তির অধিকারী হয়। সেই শক্তিবলে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন দুর্গা। তাঁর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বিতাড়িত দেবতারা দেবী দুর্গার আরাধনা করলে দেবী অসুর বধে যথাযথ ব্যবস্থা নেন। দুর্গ নামক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তেমনই দুর্গ-র অনুচর ভীমকে বধ করার জন্য তিনি খ্যাত হন ভীমা নামে। যদিও এ-প্রসঙ্গে অনেক ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

দেবী বর্গভীমার মন্দিরে প্রতিদিনই পুণ্যার্থীদের ভিড় থাকে। তবে চৈত্র এবং পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে দু'টি মেলা বসে।

তন্ত্রমতে দেবীর পুজো করা হয়। দেবীর ভোগে দেওয়া হয় শোল মাছ। মন্দিরের গর্ভগৃহের আকার বর্গক্ষেত্রের মতো। ভেতরের ছাদ 'লহয়া' করা। জানা গেছে, পশ্চিমমুখী মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরটি আনুমানিক একশো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে তৈরি হয়।

মন্দিরটির বড় দেউলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি করে। জগমোহনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। বড় দেউল ও জগমোহনের মাঝখানে রয়েছে 'অন্তরাল' ও 'যোগমণ্ডল'। বড় দেউলের চার দেওয়ালে রয়েছে রামসীতা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, মুষিক বাহন গণেশ, সিংহবাহিনী, কার্তিক, সরস্বতী, শিবদুর্গা, যুদ্ধরত রামচন্দ্র, নীলপদ্মহস্তা নায়িকা, বকাসুর বধ, গঙ্গানয়ন ইত্যাদি। এগুলির সবকটিই টেরাকোটার কাজ। কারুকাজ খুবই সুন্দর ও উচ্চমানের। অনেকের ধারণা, প্রথমে এ ধরনের কাজ বড় দেউলের গায়ে ছিল না। পরে অন্য কোথা থেকে এনে লাগানো হয়েছে। বর্গভীমা মন্দিরের বর্তমান পূজারি নকুল চন্দ্র পারিয়াল জানালেন, প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি এই মন্দিরে পুজো করেছেন। এর আগে তাঁর বাবা এই মন্দিরে পুজো করতেন। বাবার দেহাবসানের পর তিনি এই দায়িত্ব পেয়েছেন। নকুলবাবু বললেন, দুপুরে এবং রাতে মায়ের ভোগে শোলমাছের অম্বল দেওয়া হয়। সকাল পাঁচটা থেকে রাত ন'টা-দশটা অবধি মন্দির খোলা থাকে। দুপুরবেলা মায়ের অন্নভোগের সময় বন্ধ থাকে। দিনে দু'বার মায়ের ভোগ হয়— দুপুরবেলা একটা ও রাতে ন'টার সময়। বলি হয়। দুর্গাপুজোর সময় সপ্তমী ও নবমীর দিন বলির সংখ্যা বেশি। কারও মানসিক থাকলে অন্যদিন বলি দেওয়া হয়। সকাল আটটার মধ্যে মায়ের নিত্যপুজো শেষ করা হয়। মায়ের মন্দিরের পাশে ষষ্ঠীতলার গাছে, কুণ্ডের জলে একডুবে যা হাতে পান সেটাই লাল সুতোয় বেঁধে দেন বন্ধ্যা নারীরা। যাদের সন্তান হয়নি, তারা এইভাবে বিশ্বাস রেখে অনুসরণ করলে মা হতে পারেন। সন্তান হওয়ার পর যে কোনও একটা ঢিল খুলে দিতে হয়। নিশ্চয়ই অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, নাহলে সন্তান কামনায় এত মহিলারা গাছে ঢিল বাঁধে কেন?

কীভাবে মন্দির পরিচালনা করা হয়, এ-প্রশ্নে শিবাজী অধিকারী বললেন, সেবাইতদের নিয়ে একটা কমিটি আছে। নির্বাচনের মাধ্যমে ওই কমিটিতে কাজের মানুষদের নির্বাচিত করা হয়। প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি বর্গভীমা মন্দিরের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। বিভিন্ন ধরনের ভক্ত মন্দিরে প্রতিনিয়ত আসেন। কিছুদিন আগে আমার পরিচিত মেচেদার এক যুবক মন্দিরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইন্টারভিউ-এর তারিখ চলে গেছে। অথচ চিঠিটা আমি আজকে পেয়েছি। ছেলেটি 'কোয়াক ডাক্তারি' করত। বললাম, মাকে জানান। তিনিই আপনার সহায় হবেন। সাতদিন পরে দেখলাম, একঝাঁকা মিষ্টি ও পুজোর নানান উপাচার নিয়ে তিনি মাকে পুজো দিতে এসেছেন। বললাম, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, আমার চাকরি হয়ে গেছে। কী করে চাকরি হল? বললেন, আমি গিয়ে দেখা করলাম নির্দিষ্ট অফিসে। বললাম, তমলুক থেকে এসেছি। অফিসাররা বললেন, বর্গভীমার প্রসাদ এনেছ? বললাম, না। পকেটে মায়ের বেলপাতা ছিল। তাঁদের প্রত্যেককে তা ভাগ করে দিলাম। শেষে চাকরিটা আমার হয়েই গেল। ছেলেটির কথা শুনে বুঝলাম, কী করে এমন হল তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। কোনও মহিলা হয়তো মায়ের কাছে সন্তান কামনা করেছেন। দু'বছর, তিন বছর

পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলছেন, দাদা, আমায় চিনতে পারছেন? কিছুক্ষণ পরে মনে পড়ল, ইনিই তো অমুক জায়গা থেকে এসে সন্তানের জন্য মানসিক করেছিলেন মা বর্গভীমার কাছে। মা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতে অকৃপণ হননি।

এরকম অনেক ঘটনাই চোখে পড়ে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মায়ের ভোগে শোল মাছ দেওয়া হয়। এখনও অবধি ঘটেনি যে শোলমাছ পাওয়া যায় নি। অতীতে দেখেছি, মাছের বাজার থেকে প্রতিদিন মায়ের ভোগের জন্য শোলমাছ দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা এখন আর চালু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোলমাছের জোগাড় কোনোদিন বন্ধ হয়নি। শোলমাছ ছাড়া কেউ মায়ের কাছে মানসিক করেন না। ছেলে কথা বলতে পারছে না—মায়ের কাছে বলে, বোল ফুটলে ওল দেব—এসব তো আছেই। মায়ের কাছে অনেক কচুমুড়ো মানসিক করে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে তাই মায়ের কাছে দিয়ে যায়।

মেদিনীপুর জেলায় সকলেই বর্গভীমাকে নিজের মা বলেই মনে করেন। তমলুক শহরের যে কোনও বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠান, যে কোনও মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মে, যাই হোক না কেন, মায়ের কাছে আগে পুজো দিয়ে তবে কাজ শুরু করেন। প্রত্যেকের ধারণা, মা বর্গভীমার কাছে পুজো না দিলে কাজ সফল হবে না। তমলুকে অন্তত আড়াইশোটা কালীপুজো হয়। সকলেই বাজনা বাজিয়ে আগে মায়ের পুজো দিতে আসেন। একসময় কেউ কারও বাড়িতে শক্তিপুজো করতেন না। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তারপর আস্তে আস্তে ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনে পুজোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু দেবী বর্গভীমাকে পুজো না দিয়ে কেউ তাদের পুজো শুরু করেন না। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। মায়ের মন্দিরের পাশে যে কুণ্ড আছে তা কখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায় না। অনেকবার ওই কুণ্ডের জল পুরো তুলে ফেলার পর দেখা গেছে, কোনও এক জায়গা থেকে বুদবুদের আকারে জল বেরিয়ে আসছে। অথচ কাছাকাছি কোনও জলাশয় নেই। তবে এই কুণ্ডের জল খুবই অপরিষ্কার। আমরাও সেইভাবে তার সংস্কার করতে পারছি না। আমিই দেখেছি, কুণ্ডের জলে জোয়ারভাটা হত। সেইসময় ওই জলেই মায়ের স্নান, অন্নভোগের ব্যবস্থা হত। কিন্তু এখন সেই অবস্থা নেই। এখন পুরসভার জোগান দেওয়া জলে দেবীর ভোগ হয়।

তমলুকে সেভাবে কোনও যাত্রীনিবাস গড়ে ওঠেনি। স্থানীয়ভাবে একটা ধর্মশালা (তাম্রলিপ্ত ধর্মশালা) আছে। কিন্তু সেটাও যথাযথভাবে ব্যবহার হয় না। মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মশালা তৈরির মতো জায়গা নেই। তবে পেছন দিকে যে জায়গা আছে, সেখানে কিছু করতে হলে অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হবে। ছোট জায়গা, সামনে গাড়ি রাখার খুবই অসুবিধা রয়েছে। সমগ্র তমলুকেই গাড়ি রাখার কোনও সুবন্দোবস্ত নেই। তবে যদি রাতে একসঙ্গে অনেক যাত্রী পুজো দিতে আসেন, মন্দির প্রাঙ্গণে তাদের থাকতে দেওয়া হয়। একজন-দু'জনের জন্য সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

দেবী বর্গভীমা তমলুকের হিন্দুদের কাছে যেমন ঘরের মা, মুসলমান-পাঞ্জাবিরাও তাঁকে

মা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মায়ের প্রসাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই। কত মুসলমান যে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করেন, তা গুণে শেষ করা যাবে না। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা, ছোট থেকে পরীক্ষা দেবার আগে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে পুজো দিয়ে যায়, এ দৃশ্য অহরহ দেখা যায়। এইভাবেই মা সকলকে নিয়ে রয়েছেন তমলুকে।

কিছুদিন আগে একদিন দেখলাম, হিন্দুবাড়ির একটা ছোট্ট ছেলে নাটমন্দিরে বসে কাঁদছে। জানা গেল, বাবা মা তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। সেই বাচ্চা ছেলেটিকে নিয়ে কী করব ভাবছি, তখন আমাদেরই পরিচিত রাজু নামে মুসলমান ছেলে বলল, ছেলেটিকে আমায় দেবে, আমি একে মানুষ করব। রাজু কিন্তু ওই ছেলেটিকে নিজের ছেলের মতো করেই বড় করছে। তারা কিন্তু ছেলেটি যে হিন্দু সেকথা ভাবেনি। মায়ের কাছে থেকে ছেলেটিকে পেয়েছে, এটাই বড় কথা। জেনে রাখুন কোনোদিন যদি দেখা যায় তমলুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িকতার আগুন থেকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।

বর্গভীমার মন্দির সম্পর্কে নানান তথ্য

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সদর তমলুকে এই মন্দির অবস্থিত। মৌজার নাম পার্বতীপুর। ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪১-এর নিমতৌড়ি এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে সিক্স (৬) কোলাঘাট থেকে দূরত্ব পাঁচ কিমি। রেলওয়ে স্টেশন : তমলুক এবং শহিদ মাতঙ্গিনী। স্টেশন থেকে মন্দির এক কিমি। হলদিয়া এবং মেচেদা থেকে মন্দিরের দূরত্ব যথাক্রমে ৪৬ ও ১২১ কিমি। কলকাতা থেকে গাড়িতে আশি কিমি। মন্দিরের পাশে রূপনারায়ণ নদী। হাওড়া থেকে সোজা তমলুকে যাওয়া যায়।

মন্দিরের ঠিকানা

মৌজা : পার্বতীপুর, পোঃ : ও থানা : তমলুক, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৩৬।

প্রয়াগে দেবী ললিতা

পীঠনির্ণয় অনুযায়ী বিংশতিতম শাক্তপীঠ রয়েছে এলাহাবাদের প্রয়াগে। সেখানে বলা আছে,

'অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ।'

এই তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা যায় মা সতীর হাতের আঙুল পড়েছিল প্রয়াগে। এখানে দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। এই শাক্তপীঠের বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্র বলেছেন,

'প্রয়াগেতে দু'হাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরবের দশ, মহাবিদ্যা দশ।।'

প্রয়াগের নাম উঠলেই এসে যায়, কুম্ভমেলার কথা। এটি অবশ্যই একটি মহাশাক্তপীঠ। শিবচরিতে বলা হয়েছে, এখানে দেবীর নাম 'ললিতা' এবং ভৈরবের নাম 'বেণীমাধব'। স্থানীয় নদীর ঘাটের উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রয়েছে ললিতাদেবীর মন্দির। স্থানীয় মানুষেরা মা'কে আলোপী দেবী নামে সম্বোধন করেন।

যিনি ললিতা তিনিই আবার ত্রিপুরা। দেবীর রহস্য উন্মোচনে দু'টি বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়। 'ললিতোপাখ্যানম্' ও 'ত্রিপুরারহস্যম'। পৌরাণিক যুগে ভণ্ডাসুর নামে জনৈক দৈত্য শিবের আরাধনা শুরু করে। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অভয় বর দেন। এই বর পাওয়ার পর ভণ্ডাসুর হয়ে ওঠে ভয়ংকর। সে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয় দেবতাদের। সেই অসুর বিশ্রুককে পৃথিবীর, বিষঙ্গকে পাতালের দায়িত্ব দিয়ে, নিজে স্বর্গের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে এরপর ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবীর রূপের কথা শুনে তৎপর হয়ে ওঠে ভণ্ডাসুর। এছাড়া স্বর্গের রাজা হিসেবে দেবতাদের ভারবাহী ভৃত্যে পরিণত করেন। একসময় ভণ্ডাসুর শুনতে পায়, ইন্দ্রের স্ত্রী কৈলাসে দেবী গৌরীর শরণাপন্ন হয়েছেন। শোনামাত্রই ভণ্ডাসুর সেখানে গিয়ে শচীকে প্রার্থনা করে। অসুরের স্পর্ধার কথা শুনে মহামায়া তাঁকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হন। সেই মুহূর্তে ব্রহ্মা এসে মহামায়াকে দেবাদিদেবের বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন দেবী সাময়িকভাবে ভণ্ডাসুরকে অব্যাহতি দেন। ছাড়া পাওয়ার পর আরও অত্যাচারী হয়ে ওঠে ভণ্ডাসুর। তখন বৃহস্পতি দেবতাদের বললেন, তন্ত্রানুসারে মহামায়ার উদ্দেশ্যে মহাযাগ অনুষ্ঠান করতে। সেই সুবাদে দেবতারা নিজেদের দেহের মাংস কেটে মহামায়ার উদ্দেশ্যে হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন। তা সত্ত্বেও দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তখন দেবতারা ঠিক করলেন, তারা সবাই

নিজেদের দেহ আহুতি দেবেন হোমাগ্নিতে। সেই সময় দেখা গেল, হোমের আগুনের মধ্যে থেকে ভোরের সূর্যের প্রভাবের মতো তেজস্বিতা নিয়ে আবির্ভূতা হলেন দেবী ললিতা। বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সমন্বিত শক্তি। রক্তবস্ত্র পরিহিতা ও সর্বাভরণ ভূষিতা। তাঁর চারহাতে পাশ, অঙ্কুশ, ইক্ষু-কোদাও এবং পঞ্চবাণ শোভা পাচ্ছিল। দেবী ললিতার উপস্থিতিতে দেবতারা তাঁদের হারানো মনোবল ফিরে পেলেন এবং ভণ্ডাসুরের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন,

অহমেব বিনির্জত্য ভণ্ডং দৈত্যকুলেশ্বরম্।
অচিবাওব দাস্যামি ত্রৈলোকং সচরাচরম্।
নির্ভয়া মুদিতাঃ সন্তু সর্বে দেবগণাস্তথা।।

অর্থাৎ, হে ইন্দ্র, আমি অচিরেই দৈত্যরাজ ভণ্ডাসুরকে পরাজিত করে তোমাকে ত্রিলোকের অধিপতি করব। হে দেবগণ! তোমরাও নিঃশঙ্ক হও।

তারপর দেবী ললিতা শ্রীচক্রাত্মক রথে আরোহণ করে ভণ্ডাসুরকে মারার জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁর শক্তি ছিল, বালাম্বা, মন্ত্রিণী ও বারাহী। তাঁরা সবাই মিলে দৈত্যসেনাদের হত্যা করলেন আর দেবী প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরে মহাকামেশ্বর নামক দিব্যাস্ত্র দিয়ে ভণ্ডাসুরকে নিধন করে ত্রিভুবনে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। ললিতা দেবীর মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। ভেতরে একটি পাথরের তৈরি বেদি আছে। মাঝখানে রয়েছে চার হাত পরিমাণ গর্ত, যার মধ্যে রয়েছে দেবীর পীঠ। গর্তের মধ্যে একটি দোলা ঝোলানো হয়েছে। এটিই হচ্ছে দেবীর আসন। এই দেবীর কাছে বসে ব্রাহ্মণেরা দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি ও মন্ত্রপাঠ করেন।

১৫৮৩ সালে এলাহাবাদ শহরের নামকরণ করেন সম্রাট আকবর। আরবি ভাষায় এই শহরের উচ্চারণ করা হয় ইলাহাবাদ নামকরণের মূল সূত্র হল আকবর প্রণীত ধর্ম দিন-ই-ইলাহি'র অবলম্বনে। 'আবাদ' একটি পার্সি শব্দ, যার অর্থ হল, কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করা।

'প্রয়াগ' একটি হিন্দু শব্দ যার অর্থ 'ত্যাগের জায়গা'। প্রচলিত বিশ্বাস, এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর ব্রহ্মা এখানে তাঁর প্রথম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এখানেই রয়েছে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় দ্বাপরে মোক্ষ'র গোপন তথ্য এবং ললিতা দেবীর আবাসস্থল প্রয়াগে শান্তির প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে ব্যাখ্যা করেন। লোক বিশ্বাস, যে জায়গায় সতীর আঙুল পড়েছিল সেই জায়গাটির একদা নাম ছিল মীরাপুর। দেবীর মন্দির ছাড়াও রয়েছে বেণীমাধব, অক্ষয় বট। রয়েছে পাতালপুরীর মন্দির।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘাট থেকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রিকশা পাওয়া যায়। এখানে হোটেল, বিভিন্ন যাত্রীনিবাস এবং ভারত সেবাশ্রমে থাকার জায়গা রয়েছে।

জ্বালামুখী

হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকার তিরিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম জ্বালাজীর মন্দির। পীঠ নির্ণয়ের মতে দেবীর জিভ পড়েছিল জ্বালামুখীতে। পীঠস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, জ্বালামুখ্যাং তথা জিহ্বা (মহাজিহ্বাং) দেব উন্মত্তভৈরবতঃ অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী (দেবী) ...।।

তারই ব্যাখ্যায় বাঙালি কবি লিখেছেন,

'জ্বালামুখে জিহ্বা তাতে অগ্নি অনুভব।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব।'

দেবীর নাম 'অম্বিকা', ভৈরবের নাম 'উন্মত্ত'। দেবীকে অনেক ভক্ত ডাকেন 'সিদ্ধিদা' নামে। আবার কেউ বা বলেন, জ্বালাদেবী বা লন্ঠনওয়ালী মাঈ। মন্দিরের উচ্চতা সমুদ্রসমতল থেকে দু'হাজার ফুট উঁচু। তবে আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীর মাধ্যমে এই মন্দির সম্পর্ক ষোড়শ শতাব্দীর হিন্দুদের কাছ থেকে অন্য ধরনের কাহিনী শোনা যায়। যেমন, (১) মহামায়ার মুণ্ড এবং কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়েছিল উত্তর কাশ্মীরে (২) কিছু অংশ পড়েছিল দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরের কাছে তুলজা বা তুরজা ভবানীতে (৩) কিছু অংশ পড়েছিল পূর্ব ভারতের কামরূপে ও (৪) বাকি অংশ পড়েছিল নগরকোটের কাছে—জালন্ধরী নামে ভক্তেরা পুজো করেন দেবীকে। অনেক দূর থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসেন পুণ্যের আশায়। শোনা যায়, এখানে নাকি অতিপুণ্যের আশায় ভক্তেরা তাদের নিজেদের জিভ কেটে দেবীকে অর্পণ করেন। কারও কারও নাকি তখনই জিভ গজিয়ে যায়, কারও কারও গজায় দু-এক দিন পরে। তবে এ সবই শোনা কথা।

রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে পাহাড়ের ওপর উঠতে হয়। সমতল থেকে উচ্চতা ১৭৩৭ মিটার। সামনে চাতাল, পশ্চিম দিকে মায়ের মন্দির। পাহাড়ের মাঝে মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। মহারাজ রণজিৎ সিং সোনা দিয়ে মন্দিরের চূড়া বাঁধিয়ে দেন। প্রবেশ দরজার দু'পাশে রয়েছে বাঘের মূর্তি। তবে মন্দিরের দেবীর কোনও প্রাকৃত মূর্তি নেই। সেখানে পাথরের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে অগ্নিশিখা। এখানে একই সঙ্গে ন'টি মুখ দিয়ে দেবীর জিভ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। তাই দেবীকে ডাকা হয় ন'টি ভিন্ন ভিন্ন নামে, মহাকালি, উনপূর্ণা, চণ্ডী হিংলাজ, বিন্ধ্যবাসিনী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, অম্বিকা এবং অজ্ঞিদেবী। কোনও প্রদীপ জ্বালানোর তেল অথবা সাহায্য ছাড়াই এই অনির্বাণ শিখা জ্বলছে।

সুদূর অতীতে হিমালয় অঞ্চলে রাক্ষসরা রাজত্ব করত এবং দেবতাদের নানানভাবে বিরক্ত করত। একসময় ভগবান বিষ্ণুর নেতৃত্বে দেবতারা ওই রাক্ষসদের ধ্বংস করার শপথ নেন। তখন ওই পাহাড়ে নিরন্তর জ্বলতে থাকা আগুনের মধ্যে এক তরুণীর জন্ম হয়। আবির্ভূত হন মা আদ্যাশক্তি। এই ন'টি আগুনের শিখার মধ্যে একটি শিখাকে বিশেষভাবে পুজো করা হয়।

মন্দিরের মাঝখানে একটি কুণ্ড আছে। তার উত্তরদিকে চারটি শিখা রয়েছে, মাঝখানে আছে দু'টি শিখা। একটি শিখা খুবই শক্তিশালী। অন্য দু'টি শিখা বা জ্যোতি কখনও প্রকট, কখনও বা অপ্রকট থাকে। কুণ্ডের মধ্যেই ভক্তেরা পুজো ও হোম করে। এই জ্যোতি বা শিখা থেকে আগুন জ্বালিয়ে নেয়। রীতি হল, হোমকুণ্ডে পুজো দেবার পরে নির্দিষ্ট শিখার পুজো করতে হয়। হোমকুণ্ডের পাশেই মায়ের চরণচিহ্ন হিসেবে পাথরের গায়ে দু'টি পদচিহ্ন দেখানো হয়। মন্দিরের ওপরে আছে দু'টি তপ্তকুণ্ড—ব্রহ্মকুণ্ড ও গোমুখী। এখানকার জল স্পর্শ করতে হয়। পাহাড়ের ওপরে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে ভৈরবের মন্দির।

মন্দিরের উত্তরদিকের দেয়ালের মাঝখানে যে জ্যোতি (শিখা) আছে সেটিই নাকি আদি। তাই সেখানের দেয়ালে গহ্বর করে রুপোর সিংহাসন বসানো আছে। এই জায়গাটিকে বলা হয় দেবীর প্রধান গদি। জ্বালাজী দেবীর পুজো ও পুষ্পাঞ্জলি এই সিংহাসনের সামনে অর্পণ করা হয়। এর পশ্চিমে দেবীর ভাণ্ডারের সাজাই কলসি থাকে। এই গদির পশ্চিম-উত্তর কোণে যে প্রবল জ্যোতি আছে তার নাম হিঙ্গরাজ। এই শিখার মধ্যে দুধ, প্যাঁড়া—যা কিছুই দেওয়া হয় তাই মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পূর্বদিকে আর একটি জ্যোতি শিখা আছে। তার নাম অন্নপূর্ণা। এখানেও যা কিছু পুজো দেওয়া হয় মুহূর্তের মধ্যে তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকে যেখানে হনুমানের মূর্তি দেয়ালের মধ্যে আছে সেখানে রয়েছে একটি গুপ্ত জ্যোতি। রাতে এই জ্যোতির উত্তাপ এতটাই বেড়ে যায় যে তার দিকে এগোনো যায় না। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দিনের বেলায় তাপ তেমন থাকে না। উত্তরদিকে রয়েছে গোরক্ষনাথের গদি। এর কাছে দু'টি শিখা রয়েছে। কাছেই একটি কুয়ো আছে। কুয়োর জলে আগুনের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। কুয়োর জলে হাত দিয়ে আলোড়িত করে দেবীর জ্যোতি থেকে দীপ জ্বালিয়ে ওই জলের কাছে নিয়ে গেলে আগুনের শিখা প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভয়ানক শব্দের সৃষ্টি হয়। এর স্বপক্ষে অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা তাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভূমিকম্প হবার পরে নাকি কয়েক বছর সাতটি অগ্নিশিখা জ্বলেনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য আবার শিখাগুলি জ্বলতে থাকে। নারকেল, প্যাঁড়া, ছোলা, মুড়ি দিয়ে দেবীর ভোগ দেওয়া হয়।

এক সময় মোগল সম্রাট আকবর এই আগুনের শিখা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তখন তিনি দেবীর কাছে মানসিকভাবে আত্মনিবেদন

করে তামার ওপর সোনার ছাতা তৈরি করিয়ে দেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং ১৮০৯ সালে এই মন্দির পরিদর্শন করেন। তাঁর ছেলে খরক সিং এক জোড়া রূপোর দরজা মন্দিরের জন্য তৈরি করিয়ে দেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং মন্দিরের ছাদ তৈরি করানোর বন্দোবস্ত করেন। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, একসময় এই মন্দিরে নৃত্য পরিবেশন করার জন্য সুন্দরী নৃত্যশিল্পীরা উপস্থিত থাকত। রাজাদের রাজত্বের সময় মন্দিরের কাজকর্মর তত্ত্বাবধান করতেন নাদুয়ানের রাজা। তিনিই পুরোহিতদের নিয়োগ করতেন। দেশের স্বাধীনতার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। এখন সরকারের পক্ষে থেকে এই মন্দিরের পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। মন্দিরে ভক্তদের দান করা টাকার একাংশ খরচ করা হয় যাত্রী পরিষেবার উন্নতি বিধানে। সারাদিনে এই মন্দিরে পাঁচবার আরতি হয়। সূর্যোদয়ের আগে প্রথম আরতি হয়, যা মঙ্গলারতি নামে পরিচিত। দ্বিতীয় আরতি হয় সূর্যোদয়ের সামনে, যাকে 'পঞ্চপূজন' বলা হয়ে থাকে। মধ্যাহ্নে একবার দেবীর আরতি করা হয়। একে বলা হয়, 'ভোগ কী আরতি'। এরপর সন্ধ্যা সাতটার সময় যা শুধুমাত্র আরতি হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া রাত দশটার সময় আয়োজন করা হয় 'শয়ান কী আরতি'। দিনের এই আরতি আক্ষরিক অর্থে অভিনব। এইসময় নানান ধরনের ফুল এবং গয়না দিয়ে দেবীর শয্যাকে সাজানো হয়। দু'ভাগে এই আরতিকে উপস্থাপিত করা হয়। একই সঙ্গে পড়া হয় শ্রীশঙ্করাচার্য সৃষ্ট 'সন্ধ্যারায়া লহরি'। দেবীর উদ্দেশে ভোগ হিসেবে ঘন দুধের রাবড়ি, মিছরি, মরশুমি ফল, দুধ প্রভৃতি নিবেদন করা হয়।

মন্দিরের আধ মাইল ওপরে উন্মত্ত ভৈরবের মন্দির রয়েছে। কারও কারও মতে, উন্মত্তেশ্বর ভৈরব পাহাড়ের মধ্যে গুহায় অপ্রকট অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। বিষাক্ত সাপেরা নাকি তাঁকে সেখানে ঘিরে আছে। গুহাটিও খুবই অন্ধকার। তাই দেবী ও ভৈরবের নির্দেশে নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গকেই পুজো করা হয়।

জ্বালামুখী মন্দিরের গঠনশৈলী স্থাপত্যবিদদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে দেবীর কোনও প্রাকৃত মূর্তি নেই। মন্দিরের চূড়াটি গম্বুজ আকারের। কথিত আছে, কাঙরার রাজা ভূমিচাঁদ কাতোচ সর্বপ্রথম স্বপ্নে দেবীর অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশ পেয়েছিলেন। তারপর সেই জায়গাটি খুঁজে বের করে তিনি সেখানে মন্দির তৈরি করান। মন্দিরের সামনে একটি ছোট নাটমন্দির যেখানে নেপালের রাজার দেওয়া অসংখ্য পেতলের ঘণ্টা ঝোলানো আছে। মা জ্বালাজী সম্পর্কে আর একটি প্রবাদ শোনা যায়। দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্রাহ্মণকে দেবী স্বপ্ন দিয়ে কাঙরার পাহাড়ে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা খুঁজে বের করতে বলেন। সেই দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণই নাকি ওই জায়গায় দেবীর লীলা আবিষ্কার করে সেখানে মন্দির তৈরি করান। দেবীর সম্পর্কে আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। একবার গুরু গোরক্ষনাথ জ্বালামুখী মন্দির দর্শন করতে আসেন। দেবী তাঁকে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু দেবী তাকে রান্না করা খাবার খেতে বললেও তিনি, যারা এখানে আসেন তাদের খাবারের কোনও নিয়মনীতি মানেন

না, এ অজুহাতে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দেবীর বারংবার অনুরোধে গোরক্ষনাথজি চাল-ডাল দিয়ে সেখানে খিচুড়ি রান্না করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে তার আগে তিনি ভিক্ষে করে চাল-ডাল সংগ্রহ করে আনবেন বলে দেবীকে জানান। তিনি দেবীকে অনুরোধ করেন জল গরম করে রাখতে যাতে তিনি ভিক্ষান্ন নিয়ে ফিরলেই সময় নষ্ট না করে সেখানে রান্না করতে পারেন। কিন্তু গুরু গোরক্ষনাথ সেখানে ফিরে এলেন না। অপেক্ষা করতে করতে একসময় দেবী তাঁর শিষ্য নাগার্জনকে গোরক্ষনাথজির খোঁজ করতে পাঠালেন। খোঁজ করতে করতে ভীম দেখলেন রোহিনী এবং তাপ্তি নদীর সংযোগস্থলে গোরক্ষনাথ অবস্থান করছেন। কালক্রমে এই জায়গাটিই গোরক্ষপুর নামে পরিচিত হয়। ভীম দেখলেন গুরু গোরক্ষনাথের ভিক্ষার ঝুলি তখনও পূর্ণ হয়নি।

কীভাবে যাবেন?

পাঠানকোট থেকে যোগীন্দর নগরের ট্রেনে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে নামতে হবে। সেখানে বাসে বা শেয়ার ট্যাক্সিতে মন্দিরের কাছে যাওয়া যায়। অথবা ধরমশালা থেকে জ্বালামুখী বাসে যাওয়া যায়। পথের দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে হিমগিরি বা জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে পাঠানকোট পৌঁছে বাস ধরমশালা যেতে হবে। সেখান থেকে জ্বালামুখী যেতে হবে। মন্দির থেকে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনের নাম জ্বালাজী রোড। মন্দির থেকে দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য পরিবহনের বাস এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। জ্বালামুখী মন্দির থেকে সবচেয়ে কাছে বিমানবন্দরের নাম হিমাচল প্রদেশের জঙ্গল। দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। দিল্লি থেকে বিমানপথের দূরত্ব ৪৮০ কিলোমিটার।

নবরাত্রি এবং শিবরাত্রির সময়ে এখানে বিশাল মেলা বসে। যাত্রীদের থাকার জন্য এখানে ধর্মশালা আছে। এছাড়াও পূর্তবিভাগ, ন্যাচারাল অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কমিশনের বিশ্রাম ভবন ও কয়েকটি হোটেল আছে।

মানস সরোবরে মা দাক্ষায়ণী

পীঠনির্ণয়ের উল্লেখ আছে, একান্নপীঠের নবম পীঠ আছে মানস সরোবরের তীরে। সেখানে বলা হয়েছে,

'মানসে দক্ষ হস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরবস্তস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।'

অর্থাৎ মানস সরোবরের তীরে যে দেবীর অধিষ্ঠান তাঁর নাম দাক্ষায়ণী ও ভৈরবের নাম অমর। এখানে পড়েছে দেবীর দক্ষিণ হাত। এ প্রসঙ্গে জনৈক বাঙালি কবি লিখেছেন,

'আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মান সরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে।।'

এখানে অবশ্য কবি দেবীর দক্ষিণ হাত না বলে, বলেছেন, 'অর্দ্ধ ডানি হাত'। অন্য একটি লেখায় এই পীঠের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'মালবে দক্ষহস্তং'। পীঠনির্ণয়ের আর একটি পাণ্ডুলিপিতে 'মানস' না বলে 'মালব' নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে 'দাক্ষায়ণী হরিঃ'। 'নামষ্টোত্তরশতম'-এ বলা হয়েছে, 'মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাম্বরে।' তবে পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। তবে সতীর আর এক নাম যে দাক্ষায়ণী সে বিষয়ে অবশ্য নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ যিনি সতেরোবার পায়ে হেঁটে বৃহত্তম ভারত পরিক্রমা করেছেন তিনি মানস সরোবরে সতীপীঠের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর ডায়েরিতে লেখা আছে, এই মানস হল তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর। দেবীর বাম হাতের অর্ধেক এখানে পড়েছে।

ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিন্ধু ও কর্ণালীর উৎস—এই চারটি নদীর উৎস হল মানস সরোবর। একসময় শোনা যেত, গঙ্গার উদ্ভবও না কি মানস সরোবর। পরবর্তী সময়ে সেই তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়।

১৭১৫ সালের ৯ নভেম্বর তার্তার রাজমহিষী প্রিন্সেস কাসালস গিয়েছিলেন কৈলাস-মানস সরোবরে। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন দু'জন ধর্মপ্রচারক পি ডেসিডেসিয়াস এবং এমানুয়াল ফ্রেইয়ার। ডেসিডেসিয়াসের লেখা একটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয় দু'শ বছর পরে।

একান্নপীঠের মধ্যে বেশ কয়েকটি পীঠ রয়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডের বাইরে। তারই

মধ্যে অন্যতম মানস সরোবর। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে মানস সরোবরের উৎপত্তি ও নামকরণের কারণ বর্ণনা করেন আদিকাণ্ড, চতুর্বিংশ সর্গে। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হচ্ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমের কাছে জলরাশির তুমুল শব্দের কারণ কী, শ্রীরামচন্দ্রের এ-প্রশ্নে বিশ্বামিত্র বলেন,

"কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্।।
ব্রহ্মণা নরশার্দুলা তেনেদং মানসং সরঃ।
তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগৃহতে।।
সরঃপ্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যাব্রহ্মসরশ্চ্যুতা।
তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে"।।

হে নরশার্দুল রাম! পুরাকালে ব্রহ্মা কৈলাস পর্বতে মনের দ্বারা এক সরোবর নির্মাণ করান। ব্রহ্মার মানস-উদ্ভূত, তাই নাম হয়েছে মানস সরোবর। প্রাচীন জৈন ধর্ম গ্রন্থে যে পদ্মহ্রদের উল্লেখ আছে, সেটিই নাকি এই মানস সরোবর। বিহারের ভাগলপুর জেলার বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। তন্ত্র ও ধর্মের অবক্ষয় থেকে তিব্বতকে বাঁচাতে ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সে দেশের রাজার আমন্ত্রণে তিব্বত রওয়ানা হন। তিব্বতে পৌঁছানোর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ বছর। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে লাসার দশ কিলোমিটার পশ্চিমে নেবাংয়ে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সুইডেনের স্‌ডেন হেডিন ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়া ভ্রমণে আসেন। তিনি মানস সরোবরের বিভিন্ন দিকে গভীরতা মাপেন। সর্বোচ্চ পরিমাপ ছিল ২৬৮.৪ ফুট। হেডিন লিখেছেন, 'Never has a church service, a wedding march, hymn of victory, or a funeral made a mote powerful impression on me... Wonderful, attractive, enchanting lake theme of story and legend, playground of storms and changes of colour, apple of the eye Gods and men, goal of weary, yearning pilgrims, holiest of the lakes, art thou, Tso-Mavong, lake of all lakes.' মানস সরোবরের আয়তন ৩২৯ বর্গকিলোমিটার। তিব্বতীরা এই সরোবরকে 'Tso Mapham' বা 'Tso Mavang' নামে ডাকেন। পরিধি ৮৭ কিলোমিটার। মানস সরোবরের চারদিক ঘুরতে হলে প্রায় ৯৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করতে কমপক্ষে চার দিন সময় লাগে।

মানস সরোবরের চারদিকে আটটি গুম্ফা ছিল। পশ্চিম তীরে গোসুল। উত্তর-পশ্চিম কোণে চিউ বা ছিউ গুম্ফা। উত্তরদিকে রয়েছে চেরকিপ, লাংপোনা ও পনরি। পুবদিকে সেরালুং, দক্ষিণদিকে এঁরগো ও থুগোলহো। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিব্বত আক্রমণের এবং ১৯৬৭ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় চিনারা বেশ কয়েকটি গুম্ফা ভেঙে দেয়।

ফিরে আসি সতীপীঠ বর্ণনায়। মানস সরোবরের তীরে এক খণ্ড শিলায় অবস্থান করছেন দেবী দাক্ষায়ণী। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'তন্ত্রকথায়' লিখেছেন, মানস সরোবরের

দেবী হলেন ভীষণাকৃতি দশভুজা। অবশ্য 'পুণ্যতীর্থ ভারত' বইয়ের লেখক জনৈক সন্ন্যাসী, মানস সরোবর ও কৈলাস ভ্রমণ করে কোনও সতীপীঠের সন্ধান পাননি।

ভূ-পর্যটক সমীর রায় অনেকবার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে গিয়েছেন মানস-কৈলাসে। তিনি জানিয়েছেন, মানস সরোবরের ধারে ছিউ নামে বৌদ্ধদের একটি গুম্ফা আছে। একটি টিলার ওপর গুম্ফাটি অবস্থিত। সেই টিলার মাঝামাঝি গুহার মতো জায়গায় দাক্ষায়ণী আছেন, কিন্তু তাঁর কোনও পুজো করা হয় না। সেখানে কোনও হিন্দু পুরোহিত নেই। দাক্ষায়ণী'র গুহার লোহার দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। লামারা সন্ধ্যাবেলা সেখানে একটি প্রদীপ জ্বেলে দেন। যে সব হিন্দু ভক্ত মানস সরোবরে যান তাদের অনেকেই জানেন-ই না যে ছিউ গুম্ফায় দাক্ষায়ণী আছেন। যাঁরা জানেন তারা লামাদের অনুরোধ করলে দরজা খুলে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মানস সরোবর থেকে পাথর ছোঁড়া দূরত্বে এই গুম্ফার অবস্থান। কোনও প্রাকৃত মূর্তি সেখানে নেই। তবে সেখানে একটি শিলাখণ্ড আছে। মানস সরোবরে স্নান করার জন্য যাঁরা ছিউ গুম্ফার পাশ দিয়ে যান তারা অনায়াসে এখানে থাকতে পারেন। এখানে পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। সমীরবাবু আরও জানান, আমি সঙ্গীসাথীদের ৫০-৬০ বার মানসসরোবরে গেছি, তার মধ্যে ৪০ বার আমরা ওই গুম্ফায় থেকেছি। উল্লেখ্য, লামারাও দেবী দাক্ষায়ণী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাঁরা শুধু জানেন, অনেকদিন ধরে কোনও হিন্দুদেবী সেখানে রয়েছেন। শোনা যায়, পুরাকালে কোনও পুরোহিত দেবীর পুজো করতেন। তবে লামারা ঘরটি নষ্ট করেননি এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁরা সেখানে একটি প্রদীপ জ্বেলে দেন। ইয়াকের চর্বির সাহায্যে ওই প্রদীপ জ্বলে। সমগ্র জায়গাটি জনমানবশূন্য। হাতে গোনা কয়েকজন লামা সেখানে থাকেন। গুম্ফার রেস্ট হাউসে কয়েকজন কেয়ারটেকার আছেন। আশেপাশে তেমন কোনও গ্রামও নেই।

এটি মানস সরোবরের উত্তর দিক। গাড়ি করে সরাসরি এখানে চলে আসা যায়। কৈলাস পর্বতের দূরত্ব এখান থেকে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার। তবে পর্যটকেরা লামাদের অনুরোধ করলে তাদের বঞ্চিত করা হয় না দেবীগুহা দেখানোর ব্যাপারে। কোনও উৎসব এখানে হয় না বা এখান থেকে দেবীর কোনও প্রসাদও পাওয়া যায় না। যদিও জায়গাটি ১৫০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত তা সত্ত্বেও গরমের দিনে এখানে তেমন ঠাণ্ডা নেই। বলা বাহুল্য, শীতের সময় যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে। যখন মাও-সে-তুং-এর স্ত্রীর নির্দেশে সৈন্যবাহিনী প্রায় কুড়ি হাজার গুম্ফা ভেঙে দিয়েছিলেন, ছিউ গুম্ফার কুড়ি শতাংশ ভাঙা পড়েছিল। যেহেতু দেবী দাক্ষায়ণী শিলাখণ্ডে একটি গুহার মধ্যে রয়েছেন সেজন্য ধ্বংসকারীরা বোধহয় তা বুঝতে পারেনি।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, মানস সরোবরের কাছে এখন বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। ছিউ গুম্ফায় শিক্ষার্থী ছাড়াও তাদের প্রশিক্ষক থাকেন। নেপাল-চীন থেকে এখানে পৌঁছাতে সময় লাগে চারদিন। দূরত্ব এর হাজার কিলোমিটার। অতীতে রাস্তায় যেখানে আমরা রাত্রিবাস

করতাম সেখানে বিদ্যুৎ বা টেলিফোন ছিল না। এখন এই সুবিধা পাওয়া যায়। টেলিফোন বুথ হয়ে গেছে। আই এস ডি করার সুবিধাও পাওয়া যায়। শুধু মরুভূমি পার হওয়ার সময় পারিয়াং নামে একটি গ্রাম আছে। সেই জায়গায় এখনও তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। মানস সরোবরে যাওয়ার পথে এখানেই শেষ বারের মতো রাত্রিবাস করতে হয়। কৈলাস পর্বতের নীচে দারচেন নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে টেলিফোনসহ বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত আছে, এমনকী মোবাইল ফোনেও সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়। পথে কোথাও পর্যটকদের বিপদে পড়তে হয় না। রাস্তার সর্বত্র সেনাবাহিনী পাহারা দেয়। যদিও তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের আড়ালে থেকে লুকিয়ে পাহারা দেয়। কয়েক বছর আগে শঙ্করাচার্য শিবলিঙ্গ মানস সরোবরের ধারে প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন। দু'মাসের মধ্যে চিনা সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা সেটিকে ভেঙে ফেলে দেয়। মস্ত বড় এই লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল, যারা এখানে এসে পুজো দিতে চাইবেন তারা এর সামনে প্রার্থনা করতে পারবেন। কিন্তু চিনা সরকারের এই ব্যাপারটি পছন্দ না হওয়ায় সেটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা মনে করেন, পুরো বিষয়টিই কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী

পীঠনির্ণয়ে বলা আছে, একান্ন পীঠের চতুর্থটি আছে কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরব।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীত বরপ্রদা।।

অর্থাৎ সতীর কণ্ঠ পড়েছে কাশ্মীরে। সেখানে দেবী হচ্ছেন মহামায়া, ভৈরব হলেন ত্রিসন্ধ্যেশ্বর। অবশ্য শিব চরিত মতে, এটি হল ত্রয়োদশ পীঠ। পীঠের অবস্থান ঠিক কোথায়, এই নিয়ে দীর্ঘদিন নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, শ্রীনগর থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে 'তুল্লা মুল্লা'-য় দেবী ও ভৈরবের অবস্থান। মন্দিরের নাম ক্ষীর ভবানী। তবে এ সম্পর্কে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, দেবীর কণ্ঠ পড়েছে অমরনাথে। বজ্রতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, রুদ্রবামন, কুলাইবতন্ত্র প্রাণতোষিণী বা বাচস্পত্য পীঠে এই সতীপীঠের কোনও উল্লেখ নেই। তবে জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে দেবী ভাগবতে, শঙ্করাচার্যের অষ্টাদশ পীঠের বর্ণনায় কাশ্মীরের এই পীঠের উল্লেখ আছে। কুব্জিকাতন্ত্রে দেবীর সারদার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সিদ্ধপীঠ হিসেবে। রাজতরঙ্গিনীতেও এই জায়গার উল্লেখ করা হয়েছে সিদ্ধপীঠ হিসেবে। রাজতরঙ্গিনীতে এই জায়গার উল্লেখ আছে। অলবেরুনীও ক্ষীর ভবানী কথা উল্লেখ করেছেন।

আবুল ফজল জানতেন, এ-ধনের চারটি সতীপীঠের কথা। তিনি লিখেছেন, মহামায়াকে বলা হয় শিবের পত্নী। যদিও শাক্ত পণ্ডিতদের মতে, তাঁকে মহাদেবের শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। স্বামীর প্রতি অপমান সহ্য করতে না পারার জন্য সতী দেহত্যাগ করেন এবং আপন দেহ কর্তন করেন খণ্ডে খণ্ডে। তাঁর দেহের চারটি খণ্ড ছড়িয়ে পড়ে দেশের চারটি জায়গায়। মাথা ও অন্যান্য কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়েছে কামরাজের কাছে উত্তর কাশ্মীরের পাহাড়ে। লোকপ্রবাদ, দেবীর অঙ্গের এই অংশগুলিকেই বলা হয় শারদা। ক্ষীর ভবানীর ঐতিহাসিক নাম হল, ভূক্ষীরবার্টিকা। জানা যায়, একসময় এখানে তন্ত্র, শৈব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল। ক্ষীর ভবানীর অপর নাম, রাগানিয়া দেবী। রুদ্রযামল তন্ত্রে, রাগানিয়া কবচের উল্লেখ আছে।

দেবী ক্ষীর ভবানীর উদ্ভবের সঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। ত্রেতাযুগে ক্ষীর ভবানী বা রাগানিয়া দেবী ছিলেন লঙ্কায় রাবণের কাছে। হনুমান, রাবণের অন্দরমহল থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন কাশ্মীরে। মুসলমান রাজত্বের সময় এই মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর সাড়ে তিনশো বছর আগে কৃষ্ণপণ্ডিত তপিলু নামে জনৈক কাশ্মীরী

ব্রাহ্মণ এই তীর্থ উদ্ধার করেন। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে কাশ্মীরের বুদ্ধনাথ দার এখানকার কুণ্ডের পাঁক পরিষ্কার করান। সেই সময় পাঁকের ভেতর একটি মন্দির ও কয়েকটি মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১২ সালে কাশ্মীরের রাজা প্রতাপ সিংহ তাঁর আমলে সেখানে একটি মন্দির ও পাথরের দেবীমূর্তি তৈরি করান। পরবর্তীকালে মহারাজা হরি সিং এই মন্দিরের সংস্কার করান।

দেবীর ধ্যানমন্ত্র হল,

শঙ্খ ত্রিশূলচাপ করাং ত্রিনেত্রাং
ত্বিগমেতরাং সকলয়া বিকসৎ কিরীটাং।
সিংহস্থিতাং অসুরসিদ্ধতনুতাঃ চ দুর্গাং
দুর্বানিভাং দূরীত দুঃখহরিং নমামি।।

প্রতি বছর 'মে' মাসের জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীর দিনে, যেদিন দেবীর ঝরনার জলের রঙের পরিবর্তন হয় বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সেদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে সমবেত হন এবং কুণ্ডের জলে দুধ ও ক্ষীর দিয়ে পুজো করেন। কারও কারও মতে, যখনই কোনও বিপদ আসে ঝরনার জলের রং কালো হয়ে যায়। মতান্তরে, ওইদিন আশ্চর্যজনকভাবে ঝরনার জল কালো রঙে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এছাড়াও নব রাত্রির নবম দিনে এখানে অসংখ্যা ভক্তসমাগম হয়। দশম দিনে তাঁরা অংশগ্রহণ করেন দশেরা উৎসবে।

সহানীয় পাণ্ডাদের (পুরোহিত) কাছে শোনা যায়, আর এক বিচিত্র কাহিনী। অনেকদিন আগে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছে জনৈকা মহিলা কিছু খেতে চান। তখন তারা তাঁকে গোরুর দুধ থেকে ক্ষীর তৈরি করে খেতে দেন। তাদের বিশ্বাস, তিনিই শিবপত্নী দুর্গা। আমলকি গাছের ছায়ায় একটি দ্বীপের মতো জায়গায় দেবীর অধিষ্ঠান। মন্দিরের চূড়া সোনা দিয়ে মোড়া। সামনেই রয়েছে সেই কুণ্ড।

মন্দিরে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান অনেক মুসলমান ধর্মপ্রাণ মানুষও। তাদের উর্দু ছাড়া অন্য কোনও ভাষা জানা নেই। এরকম একজন মানুষের নাম গুলাম মহম্মদ। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এখানেই থাকেন। বছরে একবার নিজের বাড়িতে যান দিন কয়েকের জন্য। এই মন্দিরের আশেপাশে প্রসাদ, ছবি, ফুলমালা ও পুজোর নানান সামগ্রী যারা বিক্রি করেন তাদের অধিকাংশই মুসলমান। সম্পূর্ণভাবে এই মন্দিরের ওপর নির্ভর করেই তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন।

পৌরাণিক মতে, বনবাসের সময় শ্রীরামচন্দ্র এই দেবীর পুজো করতেন। বনবাসপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে তিনি হনুমানকে, দেবীকে কাশ্মীরে নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। অন্য এক মতে, দেবী ক্ষীর ভবানী রাগনাথ গারু নামে জনৈক কাশ্মীরী পণ্ডিতকে স্বপ্নে এখানে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।

শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এখানে দেবীর বিশেষ পুজো হয়। ওই দিন ভক্তেরা

সারাদিন উপোষ করে দেবীর কাছে তাদের প্রার্থনা জানান। মহাযজ্ঞের পরে বিশেষ পুজো শেষ হয়।

লঙ্কায় যখন দেবী থাকতেন তখন তাঁর নাম ছিল শ্যামা। রাগানিয়া দেবী দুর্গা হলেও আরেক মতে তিনি বৈষ্ণবী। কারও কারও মতে, এই দেবী হলেন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতা। দেবীর আর একটি নাম হল 'ত্রিপুরা'। নবরত্নের সময় পঞ্চদেশী মন্ত্র পাঠ করে দেবীর কাছে যা প্রার্থনা করা হয়, তিনি তা পূরণ করেন বলে ভক্তদের বিশ্বাস। তিনশো ষাটটি জলধারা এই দেবীকুণ্ডে মিলিত হয়েছে। 'তুল্লা-মুল্লা' জায়গাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রাজতরঙ্গিনীতে, যখন জয়া পেধা'র রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে নীলামত পুরানায় এই জায়গার অবস্থান। শোনা যায়, হাজার বছর আগে এই জায়গাটি পুরোপুরি জলে ডুবে যায়। কৃষ্ণাপণ্ডিত নামে জনৈক ভক্ত এই জায়গাটিকে পরে আবার চিহ্নিত করেন। জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীর দিন রাতে দেবী স্বপ্ন দিয়ে তাঁকে বলেন, জলের ভেরত থেকে বের করে লোকচক্ষুর সামনে আনতে।

দারা শুকোর উপদেষ্টা মহর্ষি শ্যামসুন্দর কাউল, যিনি একজন শাক্ত মার্গী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এই জায়গায় গিয়ে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। তিনি দেখেন, তার পাতে রাখা বাটিভরতি মাংস নিমেষে পরিবর্তিত হয়ে গেল সবজিতে। আওরঙ্গজেবের সময়ে কৃষ্ণ কর নামে জনৈক ভক্ত এই কুণ্ডের পাশে তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ক্ষীর ভবানীতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সামনে প্রজ্জ্বলিত হোমের আগুন। বসে আছে যুগ নায়ক। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভেসে গেল সব সংকল্প, সব কর্মের স্পৃহা, স্বদেশপ্রেম। হরি ওঁ নয়, এবার শুধু মা-মা। আমি যন্ত্র-তিনি যন্ত্রী; মা-মা, তিনিই সব। তিনি কর্তা, আমি কে? তাঁর অজ্ঞান সন্তান মাত্র।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। কিছুদিন আগেই স্বামীজী ফিরে এসেছেন আমেরিকা, ইউরোপ পরিক্রমা করে। একসময় এসে পৌঁছালেন কাশ্মীরে। সঙ্গে ছিলেন ধীরা মা, জয়া এবং ভগিনী নিবেদিতা ও কয়েকজন বিদেশি অতিথি। ওই বছর আগস্ট মাসে অমরনাথ দর্শনের পর আসেন ক্ষীর ভবানীতে। দেবী দর্শনের পরে তিনি লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবি 'Kali The Mother'। পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতে লেখা এই কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাশ্মীর পরিক্রমায় সময় অনেক সাথী হলেও ক্ষীর ভবানীতে তিনি একাই গিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি' বইতে লিখেছেন, 'একজন তরুণ ব্রাহ্ম ডাক্তার ওই গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিই কেবল জানিতেন, স্বামীজি কোথায় আছেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও খোঁজখবর লইতে পারিতেন। স্বামীজির প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রশংসার অতীত। পরদিন প্রতিদিনের মতো ডাক্তারবাবু স্বামীজির নিকট গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া কোনো কথা না বলিয়া ফিরিয়া

আসেন। তারপর দিন ৩০ সেপ্টেম্বর স্বামীজি ক্ষীর ভবানী নামক কুণ্ড দর্শনে যাত্রা করেন, বলিয়া যান কেহ যেন তাঁহার অনুসরণ না করেন। সেইদিন হইতে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।' সেই সময় তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের শিশুকন্যাকে দেবী দুর্গারূপে পুজো করেছিলেন। একদিন ধ্যানমগ্ন স্বামীজির মনে আসে, পুরাকালে যবনেরা এসে যখন এই মন্দির ধ্বংস করে তখন স্থানীয় মানুষেরা কিছু করল না কেন?

তিনি ভাবতে থাকেন, হায়রে! আমি যদি তখন থাকতাম, তবে কখনই চুপ করে ওই ধ্বংস দেখতাম না। কিছুতেই না।

হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন দেবীর দৈববাণী। স্বয়ং মা ক্ষীর ভবানী বললেন, আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করেছে। আমার ইচ্ছা, আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করব। ইচ্ছা করলে আমি কি এখানে এখনই সাততলা সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই করবি! তুই কী করতে পারিস? আমি তোকে রক্ষা করব, না তুই আমাকে রক্ষা করবি?

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, তা ভেতরেই হোক আর বাহিরেরই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মতো এইরূপ অশরীরী কথা শুনিস, তাহলে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্য সত্যই শোনা যায়, ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে তেমনি। স্বামীজির এই অনুভূতির সাহায্যেও মা ক্ষীর ভবানীর মন্দির বর্তমানে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে অন্যতম পীঠ হিসেবে।

শ্রীক্ষেত্রে প্রভু'র সঙ্গে পূজিতা হন দেবী বিমলা

পীঠনির্ণয়ে বলা আছে, দশম পীঠ হল উৎকলে, বিরজা ক্ষেত্রে। সেখান বলা হয়েছে,

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্চতে।
বিমলা মা মহাদেবী, জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ।।

উৎকলে পড়েছিল সতীর নাভি। দেবী এখানে বিমলা এবং ভৈরব হচ্ছেন জগন্নাথ। কিন্তু একথায় সায় দেন নি মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি। তিনি লিখেছেন ভিন্নভাবে,

উৎকলে পড়িল নাভি, মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী।।

পীঠ নির্ণয়ের অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে,

বিরজা চোৎকলেখ্যাতা নাভির্মে মম ভৈরব।

বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায় এ-বিষয়ে লিখেছেন,

বিজয়া চোৎকলেখ্যাতা না ভির্মে বয় ভৈরর।

অথবা

বিজয়া মা মহাদেবী জয় নামা তু ভৈরব।

কথিত আছে, মন্দির তৈরি হওয়ার অনেকদিন পরেও প্রভুজগন্নাথের অধিষ্ঠান হয়নি। অবশেষে একদিন প্রভু জগন্নাথ দেখলেন, বিমলা মা মন্দিরে অবস্থান করছেন। তখন উপায়ন্তর না থাকায় একটিমাত্র শর্তে প্রভু মন্দির ছাড়লেন। তা হল, প্রতিদিন তাঁকে এবং বলরামকে নৈবেদ্য দেওয়ার পর তা দিতে হবে বিমলা মা'কেও।

কিন্তু সম্প্রতি পুরীর মন্দিরের প্রথম সারির পাণ্ডাদের সঙ্গে কথা বলার পর বেরিয়ে এসেছে ভিন্ন মত। তাঁদের মতে, এখানে পড়েছে দেবীর চরণ। তাই এই জায়গার নাম হয়েছে শ্রীক্ষেত্র। প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের পিছনেই রয়েছে দেবী বিমলা'র মন্দির; যেখানে তিনি পূজিতা হন দুর্গারূপে।

পীঠনির্ণয়কারী অনেক গ্রন্থে জগন্নাথদেবকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভৈরব হিসাবে। একদিকে তিনি বিষ্ণু অন্যদিকে তিনিই শিব। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরীর মন্দির প্রাঙ্গণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৫১ পীঠের মধ্যে।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্র নাকি জগন্নাথদেবের বিলাসক্ষেত্র। তিনধাম পরিক্রম করে এখানে তিনি বিলাসে মগ্ন থাকেন। জনশ্রুতি আছে, সুদূর অতীতে শ্রীপ্রভু শবরদের দ্বারা পূজিত হতেন। জগন্নাথের অপর নাম নীলমাধব। পূজক শবর বিশ্বাবসু নীলমাধবকে নীল পর্বতের এক কন্দরে পুজো করতেন। সুসভ্য আর্যজাতির কাছে শ্রীপ্রভুর কোনও সংবাদই জানা ছিল না। সূর্যবংশীয় মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই সময়ে জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নীলমাধবের প্রকাশ ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট আভাস দেন। রাজার আদেশে অনেক ব্রাহ্মণ নীলমাধবের মূর্তি খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন দিকে যাত্রা করার পর, কেউ কৃতকার্য না হলেও, একসময় পুরোহিত বিদ্যাপতি প্রভু'র দর্শন পান। বিদ্যাপতি অনেক কষ্টে শবরপল্লীতে উপস্থিত হয়ে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শবরপ্রধান বিশ্বাবসুর মেয়ে ললিতা, বিদ্যাপতির রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রণয় প্রার্থিনী হন। বিদ্যাপতিও ললিতার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ। তখন বিশ্বাবসু ও অন্যান্য শবরেরা তাদের প্রণয়ের বিষয়টি অনুমোদন করেন। বিয়ের পর বিদ্যাপতি খুব স্বাভাবিকভাবেই অনন্যোপায় হয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করেন।

প্রতিদিন বিদ্যাপতি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, বিশ্বাবসু নীলমাধবের পুজো শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরে আসেন, তখন তার শরীর থেকে চন্দনের গন্ধ বেরোয়। কিন্তু বিদ্যাপতির শত অনুরোধেও বিশ্বাবসু তাকে শ্রীমূর্তি দর্শন করাতে রাজি হন না। শেষে ললিতার অনুরোধে একদিন বিশ্বাবসু, বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে শ্রীমূর্তি দর্শন করানোর উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাত্রা করেন। বিদ্যাপতি কৌশলে সরষে ছড়াতে ছড়াতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান। পরবর্তী সময়ে এই সরষে থেকে যে গাছ হয় তার সাহায্যে প্রভুর সন্ধান পান। প্রভু জগন্নাথের মূর্তি দর্শন করার সময়ে বিশ্বাবসু নীলমাধবের নৈবেদ্যর জন্য কাছের জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করতে যান। জনশ্রুতির ভিত্তিতে জানা যায়, কোনও এক সুদূর অতীতে জগন্নাথদেবের নৈবেদ্য হিসাবে অর্পণ করা হত ফলমূল। আরও শোনা যায়, বিদ্যাপতি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন স্বয়ং নীলমাধব নিজের হাতে শবরদের বনফুল গ্রহণ করছেন। পুজো শেষ হয়ে যাবার পরে নীলমাধব বিশ্বাবসুকে বলেন, হে ভক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবসু, এ পর্যন্ত আমি জনসাধারণের অগোচরে তোমার দেওয়া বনের ফলমূল গ্রহণ করেছি। সম্প্রতি শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন আমার পুজো করার জন্য বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত। তাই আমি তার কাছে থেকে রাজোপচারে পুজো গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করছি। অনেক উত্থান-পতনের পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দারু ব্রহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করার জন্য অনেক দক্ষ শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কেউ-ই সেই দারুব্রহ্মকে স্পর্শই করতে পারেন নি। শেষে জনৈক বৃদ্ধ শিল্পী একুশ দিনের মধ্যে মূর্তি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন বলে জানালেন। তবে তাঁর একটি শর্ত ছিল। তা হল, ওই একুশ দিন মন্দিরের

দরজা বন্ধ থাকবে ও কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই আদেশ পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

দু-সপ্তাহ পরে মন্দিরের ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে বৃদ্ধ শিল্পী সম্ভবত প্রাণত্যাগ করেছেন, এই চিন্তা করে রাজা দরজা খুলে দেখলেন দারুব্রহ্মগুলি তিনটি শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট হয়েছে, কিন্তু তাদের হাত বা পা প্রকট হয়নি। অন্যদিকে সেই বৃদ্ধেরও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন আত্মহত্যা করার জন্য কুশ-শয্যা গ্রহণ করার পর প্রভু জগন্নাথ রাজাকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, আমি পতিতপাবনরূপে পুরুষোত্তম নামে নীলাচলে অবস্থান করব। আমার হাত-পা দেখা না গেলেও আমি অনুরাগী ভক্তদের সেবা, পুজো গ্রহণ করব। রাজা তখন ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন, যে সূত্রধর ওই মূর্তিগুলি প্রকট করেছেন তাঁর বংশধরেরা যুগ যুগ ধরে মূর্তি ও রথ নির্মাণ করবেন। সেই সময়ে প্রভু জগন্নাথদেবের আকাশবাণী হল। প্রভু বললেন, যে ভক্তশ্রেষ্ঠ বিশ্বাবসু আমাকে নীলমাধবরূপে পুজো করেছে তার বংশধরেরা দইতা সেবক নামে পরিচিত হয়ে শ্রীমন্দিরে আমার সেবা করবে ও বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ-সন্তানেরা আমার ভোগরান্নার কাজে নিযুক্ত থাকবে। তারা সূপকার নামে পরিচিত হবে।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের এই আদেশ শিরোধার্য করে ঘোষণা করলেন, প্রত্যেকদিন মাত্র এক প্রহর মন্দির বন্ধ থাকবে। সেই সময় থেকে আজও প্রত্যেকদিন মন্দির খোলার বিষয়টি এক বিশেষ পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সূর্যোদয়ের অনেক আগে মহামন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণকারী, প্রতিহারিদের সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন জয়-বিজয় দ্বারের (মন্দিরের প্রধান দরজা) সীল ঠিক আছে কিনা, সীল ভেঙে মন্দিরে প্রবেশ করে পবিত্র স্থানটিকে কেউ অপবিত্র করেছে কিনা। সীল ঠিক থাকলে দরজা খোলা হয়। ঠিক একইভাবে গর্ভগৃহের দরজাও খোলা হয়। পরিচারকেরা ধুয়ে মুছে গর্ভমন্দির পরিষ্কার করেন। তারপর শুরু হয় মঙ্গলারতি।

শরৎকালে দুর্গাপুজোর তিনদিন অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীর দিন পুরীর শ্রীক্ষেত্রে ষোড়শোপচারে বিমলা মাকে দুর্গারূপে পুজো করা হয়। প্রভু জগন্নাথদেব যখন ঘুমিয়ে পড়েন, তখন ওই তিনদিন মন্দিরের দক্ষিণ দিকের একটি দরজা দিয়ে ছাগশিশুকে নিয়ে আসা হয় এবং পর পর তিনদিন দেবী বিমলার মন্দিরের সামনে তাদের বলি দেওয়া হয় এবং আমিষ ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ওই দিনগুলিতে থাকে দুর্গাপুজোর বিশেষ আয়োজন। তবে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে চুন জল দিয়ে ওই বলি ও পুজোর জায়গাটি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। তাই দেবী বিমলা ভৈরবী শাক্ত মতে পুজো করা হয়ে থাকে। এইভাবে পুরীতে বৈষ্ণব ও শক্তি মতের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে বছরের অন্য দিনগুলিতে সম্পূর্ণ বৈষ্ণব মতে দেবী বিমলা'র পুজো হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,

দেবী বিমলা'র পুজো ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষ বিশেষ মানুষকে দেওয়া আছে। এমনকী দুর্গাপুজোয় তিনদিন তাঁর পুজোর জন্য বিশেষজনের উপর দায়িত্ব রয়েছে। জানা গেছে, প্রসাদ তখনই মহাপ্রসাদ হিসাবে চিহ্নিত হয় যখন প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও বিমলা মা তা গ্রহণ করে থাকেন। তাই প্রতিদিন নৈবেদ্য প্রভু জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করার পর নিবেদিত হয় দেবী বিমলার উদ্দেশ্যে। শুধু নৈবেদ্যই নয়, প্রতিদিন ভোগের পরে জগন্নাথ দেবকে যে ফুল ও মালা অর্পণ করা হয়, তা প্রভুকে পরানোর পর পরানো হয় দেবী বিমলাকে।

সিলেটে মহালক্ষ্মী ভৈরবী

সপ্তবিংশতি শাক্তপীঠ আছে শ্রীশৈলে। পাঠ নির্ণয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়,

'শ্রী শৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরব সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ।।

সেখানে পড়েছে সতীর গ্রীবা। দেবীর নাম 'মহালক্ষী', ভৈরবের নাম 'সম্বরানন্দ'। অবশ্য পীঠনির্ণয়ের আর একটি পাণ্ডুলিপিতে আছে 'মহালক্ষী'-র পরিবর্তে আছে 'মহামায়ার' উল্লেখ।

রায়গুণাকর কবি ভারত চন্দ্র রায় শ্রীশৈলের বর্ণনার এক বিশেষ দিক নির্দেশ করেছেন। তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গলে আছে,

'শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষী দেবী
সর্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাঁহা সেবি।।'

শিবচরিতের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে আছে, শ্রীহট্টে পড়েছে সতীর গ্রীবা। দেবীর নাম 'মহালক্ষী'। ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'। এক্ষেত্রে অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে পুরোপরি মিল রয়েছে। আশা করা যায়, পীঠ নির্ণয়ে 'সম্বরানন্দ' আর 'সর্বানন্দ'—একই দেবতাকে বলা হয়েছে। শ্রীহট্ট, নামটির আর কোনও জায়গার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টকে চলিত ভাষায় বলা হয়, সিলেট। ব্রিটিশ আমলে এটি ছিল অসমের মধ্যে। দেশবিভাগের সময় ছিল পূর্বপাকিস্তানে। এখন রয়েছে বাংলাদেশে।

এই পীঠস্থানটি শ্রীহট্ট শহরে বা তার কাছাকাছি কোনও জায়গায় আছে বলে শোনা যেত। কিন্তু সঠিক স্থানটি অনেকদিন অজ্ঞাত ছিল। অনেকের মতে, দরগা মহল্লায় এই সতীপীঠ পরবর্তীসময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁদের ধারণা ছিল, দুর্গাবাড়িতে এই পীঠের অবস্থান। এক সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, শ্রীহট্ট (সিলেট) শহর থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটি করের (মতান্তরে গোট্টটিকর) জৈনপুরে রয়েছে এই মহাপীঠ।

সরকারি ইতিহাস গ্রন্থে এই ভৈরবী স্থানকে মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা লেখা হয়েছে,

গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে, সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী
দেবীতত্র মহালক্ষী সর্বানন্দশ্চ ভৈরব।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তন্ত্রাচার্য প্রচারিত পীঠমালায় বলা হয়েছে, গ্রীবাদেশ শ্রীশৈলে পড়েছে। শ্রীশৈল হল শ্রীহট্টের নামান্তর। সেখানে অবশ্য ভৈরব সর্বানন্দকে, সম্বরানন্দ নামে উল্লেখ

করা হয়েছে। মন্দিরের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বঙ্গাব্দ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বৈদ্য বংশীয় দেবীপ্রসাদ দাশ জৈনপুরগ্রামে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেন। কাজ করতে করতে জনৈক শ্রমিক একটি বড় পাথরের গায়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করলে সেটি দু'টুকরো হয়ে যায় ও সেখান থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। তখন এক বালিকা সেখানে আবির্ভূতা হয়ে ওই শ্রমিকের গালে টোকা মারেন। লোকটি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়। সেই দিন রাতে শ্রমিক নিয়োগকারী দেবীপ্রসাদকে দেবী স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমি ভৈরবী, এখানে আছি, তোমার লোক আমার অঙ্গে আঘাত করেছে। তোমার কুশল যদি চাও তাহলে এখানে নিত্যসেবা পূজার ব্যবস্থা কর। ধনীর সন্তান দেবীপ্রসাদ অবিলম্বে মায়ের নিত্যসেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। তবে তাঁর ইচ্ছে ছিল, একলক্ষ ইট দিয়ে মন্দির তৈরি করাবেন। কিন্তু দেবীর তাতে সায় ছিল না। রাতে আবার তিনি স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমি ইটের তৈরি মন্দিরে থাকব না। তখন রামপ্রসাদ মুন্সী বাঁশ দিয়ে মহালক্ষ্মী ভৈরবীর ১৭ নম্বর গ্রীবাপীঠ মন্দিরটি তৈরি করান। দেবীপ্রসাদ ইট দিয়ে মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর তৈরি করে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কাছেই একটি শিব মন্দির তৈরি করান।

দেবীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর রমেশ দাশ একটি উইলের মাধ্যমে মন্দির ও তৎসলগ্ন একশো শতক জায়গা মন্দিরের কাজের ব্যবহারের জন্য দান করে যান। ওই উইলে নির্দেশ আছে, বংশানুক্রমিকভাবে এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার পাবে পুরুষ বংশধরেরা। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করছেন রিন্টু দাস। তাঁর পূর্বসূরীরা হলেন, রবীন্দ্র দাস, রমেশ দাস, রামপ্রসাদ মুন্সি। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রতিদিন একজন পুরোহিতের মাধ্যমে মায়ের পুজো হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর তিনদিন ধরে অশোকা পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

অনেকদিন আগে শ্রীহট্টে পূর্ণানন্দ নামে এক মহাত্মা মাঝেমধ্যে থাকতেন। তখন তাঁর নাম ছিল—ব্রহ্মানন্দপুরী। জীবিতকালে তিনি কখনও কামাখ্যায়, কখনও বানিয়াবঙ্গে আবার কখনও গোটাটিকরে এসে সাধনা করতেন। তিনি শ্রীহট্টে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন ও ১২৮১ সালে প্রয়াত হন।

একদিন ব্রহ্মানন্দপুরী রাতে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভৈরবীর (দেবী মহালক্ষ্মী) মন্দিরের ঈশান কোণের দিকে গিয়ে শিবটিলা পাহাড়ে উঠে বলেন, এই স্থান অতি পবিত্র, এই জঙ্গলে আবৃত জায়গায় অনাদি লিঙ্গ শিব আছেন। এই ভৈরবী হলেন মহাপীঠ এবং এই শিব তাঁর ভৈরব। এ বিষয়ে তোমাদের যেন সন্দেহ না থাকে। এই ঘটনার পরে ১২৮৬ সালের মাঘ মাসে গোটাটিকরবাসী পণ্ডিত বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ একদিন রাতে স্বপ্নে দেখেন, ব্রহ্মানন্দপুরী তাঁকে ও তাঁর দুই ছাত্রকে বলছেন, চল, শিবটিলায় গিয়ে তোমাকে শিব দেখাই। তারপর তাঁরা সকলে সন্ন্যাসীর সঙ্গে শিবটিলায় গিয়ে শিখরস্থিত

স্তূপ খুঁড়ে শিব দেখতে পান।

এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। এমন সময় তাঁর দুই ছাত্র আখালিয়াবাসী কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য ও জানাইয়াবাসী কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হন। ওঁরা দু'জনেই বলেন, তারাও একই স্বপ্ন দেখেছেন। তখন তারা তিনজনে শিবটিলায় যান। সবাই মিলে স্তূপ খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে পাওয়া গেল একখণ্ড পাথর। পরে আরও মাটি সরানোর পরে দেখা গেল, শিবের উপরিভাগ দেখা যাচ্ছে। তারপর আরও গাছ ও মাটি সরানো হলে বেরিয়ে পড়ল শিবের গৌরীপট্ট। এই শিব-ই হলেন ভৈরব সর্বানন্দ। এ প্রসঙ্গে কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, যেদিন মাটি কাটিয়া শিব বাহির করিয়াছিলাম, সেই দিনের কথা এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনে অঙ্কিত আছে। উপস্থিত জনগণ সকলেই দেখিয়াছে, প্রায় দেড়হাত মাটির নীচে গৌরীপীঠের সঙ্গমস্থলে একখানা প্রদীপের মুদি ও তিন চারিখানা মৃন্ময়পাত্র পাইয়াছিলাম, ইহা কি পূর্বপূজার প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না? (পরিদর্শক, ২০ অগাস্ট, ১৯০৩)

অসম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে (Vol II : Sylhet, chapter III, p 86), 'About a mile and a half of South Sylhet town, where Sati's neck is said to have fallen where her body was dimembered by Vishnu. This pith, as the places consecrated by the fragments of Sati's severad body are called, has only recently been rediscoverd. Sati's neck is represented by a piece of flat rock, similar to that found on most of the tiles round Sylhet. Her bhairab of guardian left to protect by Siva takes the usual form of a small upright pillar of rock shaped like phullus. There is no temple over these remains and handls anything neighbourhood of Sylhet town.'

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থানীয় মানুষদের উৎসাহে এখানে শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমী উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' থেকে জানা যায়, শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়গোবিন্দ হাটকেশ্বর পুজো করতেন, মিনারের টিলা বা তার পার্শ্ববর্তী কোনও টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিল। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের আক্রমণের সময় গ্রীবাপীঠকে গোপন করে রাখা হয় এবং হাটকেশ্বরকে জয়নীয়ার জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকদিন সেখানে থাকার পর চূড়াখাইড় পরগণায় তাঁকে আনা হয়। গ্রীবাপীঠ আবার প্রকট হয় দেবীপ্রসাদ দাসের মাধ্যমে। তারপর আবিষ্কার করা হয় সর্বানন্দ লিঙ্গ মূর্তি।

দেবীর ধ্যান মন্ত্র

ওঁ উদ্যদ্‌ভানু সহস্র কান্তি মরুণ
ক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্ত পয়োধরাং জপবটীং

বিদ্যমভীতিং বরম্।।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্র
বিলসদ্বক্রারবিন্দ শ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধ হিমাংশুরত্ন
মুকটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্।।

উদীয়মান সহস্র সূর্যের মতো যাঁর দেহকান্তি, যিনি রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র পরিহিতা, নৃমুণ্ডমালিনী, যাঁর স্তনযুগল রক্তবর্ণে রঞ্জিত, যিনি করকমল চতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করেছেন, যাঁরা মুখমণ্ডল ত্রিনেত্র শোভিত এবং পদ্মের মতো শ্রীসম্পন্ন এবং যাঁর রত্নমুকুটে চন্দ্র নিবদ্ধ, সেই মৃদুমন্দ হাস্যা দেবীকে বন্দনা করি।

মহালক্ষী ভৈরবী মন্দিরে অন্যান্য পুজোর মধ্যে কালিপুজো, সরস্বতী পুজো ও বিশয়ী পুজো নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পুজোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয় মন্দিরের নিজস্ব জায়গায়। ভাড়ার ঘর থেকে ও স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের সার্বিক দান ও কমিটির সদস্যদের অনুদান ও স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের অনুদানের মাধ্যমে। সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বরইকান্দি ইউনিয়নের জৈনপুর গ্রামে অবস্থিত এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে।

কমিটির উল্লেখযোগ্য পদে যারা রয়েছেন তারা হলেন, সভাপতি অ্যাডভোকেট গৌতম দাস। সহসভাপতি জয়ন্ত চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদক আশীষ দেব সহকারী সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেব, কোষাধক্ষ্য নারায়ণ চক্রবর্তী। অবশিষ্ট ৬ জন, কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই কমিটি ৩ বছর মেয়াদী এবং ৩ বছর পরপর এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কমিটি পুনর্গঠন করেন। মন্দির সংলগ্ন প্রায় ৪০ শতক জায়গা নানাভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধীনে চলে যাওয়ায় ইংরেজি ১৯৬৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মন্দির পরিচালনা কমিটির সঙ্গে প্রভাবশালী মহলের মামলা চলছে। যা এখনও আদালতের বিচারাধীন।

জালন্ধরে দেবী ত্রিপুরমালিনী

পীঠনির্ণয় অনুসারে একান্নপীঠের ষষ্ঠ পীঠ হল জালন্ধর। সেখানে বলা হয়েছে,

... স্তনং জালন্ধরে মম।

ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী।।

অর্থাৎ জালন্ধরে দেবীর বাম স্তন পড়েছে। দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী এবং ভৈরব হলেন ভীষণ।

অন্নামঙ্গলে বাংলায় অনুবাদ করলে যার মর্মার্থ দাঁড়ায়,

'জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ।।'

পীঠস্থানের পাশে আছে স্বামী শঙ্করাপুরীর আস্তানা। পীঠতন্ত্রে জালন্ধর পীঠের উল্লেখ থাকলেও অনেকদিন এই পুণ্যস্থান লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। তখন পুরো জায়গাটি ঘন জঙ্গলে আবৃত থাকত। পরবর্তী সময়ে পুরো জায়গাটি পরিষ্কার করে পীঠস্থানে মন্দির তৈরি করা হয়। শাস্ত্রমতে দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী কিন্তু মন্দির হল বিন্ধ্যেশ্বরীর।

'নামষ্টোত্তরশতম'-এ বলা হয়েছে,

'জালন্ধরে বিশ্বমুখী, তারা কিষ্কিন্ধ্যপর্বতে।

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে,

'জালন্ধরে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম।'

'পূর্ণতীর্থ ভারত' নামে এক ভ্রমণকাহিনীর লেখক জনৈক স্বামীজীর লেখায় আছে, 'কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম জলন্ধরেও আছে একটি পীঠস্থান।'

পদ্মপুরাণে আছে, সাগরের ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে জলন্ধর নামে এক দৈত্যের জন্ম হয়। তার জন্মের সময় কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী। কেঁপে উঠেছিল পাতালও। এর ফলে ধ্যানভঙ্গ হয় ব্রহ্মার। বিপদের আশঙ্কায় ব্রহ্মা সাগরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, সাগর, তুমি এমন করে গর্জন করছ কেন? উত্তর দিলেন সাগর, 'প্রভু, এ আমার গর্জন নয়, আমার ছেলের গর্জন'। সাগরের ছেলেকে দেখে চমকে উঠলেন ব্রহ্মা। সাগরের ছেলেও ব্রহ্মাকে দেখে তাঁর দাড়ি ধরে টানতে শুরু করে। যন্ত্রণায় অস্থির হলেও ব্রহ্মা কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলেন না। একসময় সাগর ব্রহ্মাকে মুক্ত করে দেন। তখন শিশুর পরাক্রম দেখে ব্রহ্মা তার নাম রাখেন জলন্ধর। বললেন, ভবিষ্যতে এ-শিশু ত্রিলোকের অধিপতি হবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পরাক্রমও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য একদিন সাগরকে বললেন, তুমি মহাত্মাদের সাধনভূমি থেকে

দূরে সরে গিয়ে তোমার ছেলেকে অন্য কোনও রাজ্যে স্থাপন কর। শুক্রাচার্যের উপদেশমতো সাগর তার ছেলেকে যে রাজ্যে স্থাপন করনে তার নাম জলন্ধর।

দীর্ঘদিন তপস্যা করে জলন্ধর লাভ করেছিলেন এক অনন্য বর। তা হল, যতদিন তার স্ত্রী সতীসাধ্বী থাকবে ততদিন তাকে কেউ বধ করতে পারবে না। কিন্তু একদিন ভগবান বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে তার স্ত্রী বৃন্দাকে বঞ্চনা করলেন। সেই সুবাদে শিবের কাছে পরাজিত হলেন জলন্ধর। কিন্তু শিব যতবারই তার মুণ্ডু কেটে ফেলেন ততবারই তা জোড়া লেগে যায়। অবশেষে কোনও উপায় না দেখে শিব তার মাথা কেটে মাটিতে পুঁতে দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে দেন।

জলন্ধরকে কেন্দ্র করে অন্য একটি কাহিনীও শোনা যায়। সেখানে উল্লেখ আছে, জলন্ধর নামে এক রাক্ষস ছিল যার অত্যাচারে ত্রিভুবন কেঁপে উঠত। অত্যাচারের মাত্রা যখন চরমে পৌঁছায় তখন স্বয়ং ঈশ্বর বামনের রূপ ধরে তাকে হত্যা করেন। মরার সময় সেই রাক্ষস উবু হয়ে পড়েছিল। তার পীঠের ওপরেই গড়ে ওঠে এক রাজ্য যার নাম জালন্ধর। লোকবিশ্বাস, এখানেই পড়েছে সতীর বাম স্তন। অন্নদামঙ্গলে বাংলার কবি বলেছেন, 'পড়িলা এক স্তন'। কিন্তু পীঠ নির্ণয়ে আছে, 'জালন্ধরে স্তনং মম'। অন্যদিকে কালিকাপুরাণে আছে, 'স্তনযুগং'। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, জলন্ধরে দেবীর নাম বিশ্বমুখী। কালিকাপুরাণের এক জায়গায় জলন্ধরকে বলা হয়েছে জলশৈল। রুদ্রযামলে জালন্ধর সম্পর্কে উল্লেখ আছে, মূলাধারে কামরূপং যদি জালন্ধরং তথা। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে আছে,

'কামরূপং চ মলয়ং ততঃ কৌলগিরিং তথা।
কুলান্তকং চ চৌহারং জলন্ধরমতঃ পরম।'

প্রাণতোষিণীতন্ত্র ও বাচস্পত্যপীঠেও জালন্ধরের বর্ণনা পাওয়া যায়,

'হিঙ্গুলা চ মহাপীং তথা জালন্ধর পুতঃ।'

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীতে আছে,

'শ্রীপীঠস্য তথোঙ্কারং জালন্ধরমতঃ পরম্'

বেশিরভাগ শাস্ত্র গ্রন্থেই জালন্ধরের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপথে কয়েকটি মাতৃতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে গৌরীশিখরস্থিত 'স্তনকুণ্ডের' যে তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে, 'অনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত গৌরীশিখরে আরোহণ করে স্তনকুণ্ডে যাবে। সেখানে স্নান ও পিতৃ এবং দেবতাদের অর্চনা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও ইন্দ্রলোক লাভ হয়' (বনপর্ব ৮৪/১৫১-৩)।

অষ্টাদশ পীঠ বর্ণনা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য জালন্ধরে নাম উল্লেখ করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কালিকাপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অমিয়কুমার মজুমদার রচিত 'সতীপীঠ পরিক্রমা' বইতে জালন্ধরের দেবীপীঠ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তা হল, 'জালন্ধর প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম। কাংড়া

জেলার জ্বালামুখীর কাছে এই তীর্থ। আধুনিক জালন্ধর শহরের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। এখানে দেবীর স্তন পড়েছিল। এখানকার দেবীর নাম বিশ্বমুখী বা ত্রিপুরনাশিনী বা ত্রিপুরমালিনী। মতান্তরে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রজেশ্বরী। এঁকে বিদ্যারাজ্ঞীও বলা হয়। আবার কেউ কেউ বিদ্যাশ্বরীও বলেন। অনেকে দেবীকে চণ্ডী বলে সম্বোধন করেন। জালন্ধরের কাছাকাছি কোনও কোনও জায়গার মাটি থেকে আগুন বেরোতে দেখা যায়। সেখানে ভিড় করেন তীর্থযাত্রীরা। মনের ইচ্ছে পূরণ হবার আকাঙ্ক্ষায় আগুনের মধ্যে তারা নানান জিনিস ছুঁড়ে দেন। সেই আগুনের ওপর তৈরি হয়েছে গম্বুজাকৃতি মন্দির।

জালন্ধরের অবস্থান

দিল্লি থেকে দূরত্ব ৩৭৫ কিলোমিটার, চণ্ডীগড় থেকে ১৫০ এবং অমৃতসর থেকে ৮০ কিলোমিটার। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই শহরে পাঞ্জাবের রাজধানী ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে এর নাম ছিল জুলন্ধর।

আবহাওয়া : এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রতি বছর কোনও কোনও দিন ৪৮ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে কোনও কোনও দিন তাপমাত্র ২/৩ ডিগ্রিতেও নেমে যায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭০ সেন্টিমিটার। ভারতের অন্যতম পুরোনো ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে জলন্ধরে। ১৮৪৮ সালে এর নির্মাণ শুরু হয়। কাছেই পাকিস্তান সীমান্ত থাকায় বর্তমানে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

জালন্ধরে সতীপীঠের কাছেই গড়ে উঠেছে মা ছিন্নমস্তিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। কুইল্লা মহল্লায় তাদের দপ্তর রয়েছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : দিল্লি থেকে ট্রেন এবং সড়কপথে যাওয়া যায়। দিল্লি থেকে অমৃতসর ভায়া জলন্ধরে ট্রেনে যাওয়ার জন্য অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা যুক্ত শতাব্দী এক্সপ্রেসের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও এখানে যাওয়ার জন্য অন্য ট্রেনও রয়েছে। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর রয়েছে অমৃতসরে যা রাজা সান্সি নামে পরিচিত। মূল শহর থেকে এর দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। নামতে হবে জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। সেখানে থেকে কাছেই রয়েছে দেবী তলাও। প্রথমে আছে কালভৈরবের মন্দির। তারপরে রয়েছে মহাবীরের মন্দির।

থাকার ব্যবস্থা : এখানে থাকার জন্য রয়েছে দ্য রিজেন্ট পার্ক হোটেল, স্কাইলার্ক হোটেল, ডলফিন, হোটেল প্লাজা, ম্যাজেস্টিক গ্র্যান্ড, লিলি রিসর্টস, প্রেসিডেন্ট হোটেল, হোটেল রক্সি, কমল প্যালেস, মায়া হোটেলস প্রমুখ। এছাড়া মাঝারি মানের বেশ কয়েকটি হোটেলও আছে। এখানে আসার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল ডিসেম্বর মাস। এই সময় দেবীর সামনে সংগীত পরিবেশন করেন দেশের খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীরা।

এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান হল, তুলসী মন্দির, শিব মন্দির, সোদাল মন্দির, অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির এবং পাঁচ মন্দির।

নেপালে দেবী গুহ্যেশ্বরী

নেপাল এই মুহূর্তে হিন্দুরাষ্ট্রের তকমা হারালেও সেখানকারার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অনেক হিন্দু মন্দির। পাশাপাশি চোখে পড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানান নিদর্শন। এছাড়াও নেপালের কোনও কোনও দেবস্থানে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরকমই একটি মন্দির রয়েছেন মা গুহ্যেশ্বরী। কথিত আছে, এটি একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম। পীঠনির্ণয়ের বর্ণনাক্রমে শাক্তপীঠের অষ্টম পীঠ আছে নেপালে। এই বর্ণনানুযায়ী এখানে পড়েছিল সতীর জানু। সেখানে উল্লেখ আছে,

'... নেপালে জানু মে শিব।
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা।।'

বাংলার কবির ভাষায়,

'নেপালে পড়িল জঙ্ঘা কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহাৎসব।।"

যেখানেই দেবী অবস্থান করেন তার কাছেই থাকেন মহেশ্বর। বাগমতী নদীর ধারে রয়েছে বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির। ভক্তেরা প্রথমে দর্শন করেন পশুপতিনাথ, সেখান থেকে গোরক্ষনাথ এবং নদীর অন্য পারে গিয়ে কিছুটা পথ পেরোনোর পর দেখা যাবে গুহ্যেশ্বরী মন্দির, দু'কিলোমিটার দূরে বোধনাথ (আসল উচ্চারণ হল বৌধনাথ) মন্দির। কথিত আছে, ভগবান শিব নেপালে থাকেন মূলত ছুটি কাটানোর জন্য। মন্দিরের গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা হয়, সেটি কমপক্ষে ১৫০০ বছরের পুরোনো। পুঁথি অনুযায়ী জানা যায়, ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে শিব মন্দির ছিল। দেবতামূর্তির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মহেশ্বর এখানে চতুর্মুখ নিয়ে অবস্থান করছেন। তাই বলা হয়, তিনি পশুদেরও রাজা। মূর্তির দিকে তাকালেই লক্ষ্য করা যায়, তাঁর শান্ত, সমাহিত ভাব, অন্যান্যক্ষেত্রে যা সম্পূর্ণ বিপরীত। আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় হল, পশুপতিনাথ মন্দিরে কোনও পশুবলি দেওয়া হয় না। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানের এই মন্দিরটি তৈরি করান রাজা ভূপালেন্দ্র মাল্লা। একসময় রাজা যাক্সা মাল্লা দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের এনে তাদের হাতে পশুপতিনাথের পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এখানকার পুরোহিতদের পরণে থাকে কমলা রঙের পোশাক।

পীঠনির্ণয়ে পীঠের জন্য কোনও স্থান নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি। শিবচরিতে বলা

হয়েছে, নেপালে পড়েছিল দক্ষিণজঙ্ঘা, দেবীর নাম মহামায়া বা নবদুর্গা। বাগমতী নদীর তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে গোরক্ষনাথ, পরে গুহ্যেশ্বরী মন্দির যাওয়া যায়। স্থানীয় এবং অনেক পণ্ডিতদের মতে, এখানে দেবীর যোনি পড়েছিল, যা একটি কলসে রাখা আছে। ১৭ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি তৈরি করান রাজা প্রতাপ মাল্লা। শোনা যায়, উত্তর বিহারের তিরহুত থেকে নেপালের রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে জনৈক ব্রাহ্মণ বলেন, 'হে রাজা, নেপালে শক্তিপীঠ আছে। আমার মনে হয়, এই বনের মধ্যে কোথাও দেবী গুপ্তভাবে রয়েছেন। আপনি আমায় সেই দেবীমূর্তি উদ্ধারে সাহায্য করুন।' এর আগে রাজা প্রতাপ মাল্লা ওই ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর কথায় রাজা জঙ্গল পরিষ্কার করার আদেশ দেন। ব্রাহ্মণের চিহ্নিত জায়গাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সৃষ্টি হয় একটি ছোটখাটো পুকুরের। সেখান থেকেই পাওয়া যায় দেবী গুহ্যেশ্বরীর শিলামূর্তি। ওই জায়গায় রাজা মন্দির তৈরি করান যার চারপাশে স্থাপন করা হয় সিংহমূর্তি।

রাজার প্রতাপমল্ল যেহেতু তন্ত্র মতে বিশ্বাসী ছিলেন তাই এই পীঠস্থানে মূলত তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। দেবী গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের মাথায় শোভা পায় পিতলের তৈরি চারটি সাপের মূর্তি। দেখে মনে হয়, ওই সাপগুলি যেন তন্ত্রসাধকের বেদীকে ধারণ করে আছে। মন্দিরের মধ্যে নানান কারুকার্যময় বারান্দা আছে, যার বেষ্টনীর সামান্য নীচে রয়েছে একটি চারকোণা চাতাল। চাতালের মাঝখানে রয়েছে বাঁধানো পীঠস্থান। সেখানে রয়েছে একটি ছোট গর্ত। জলে পূর্ণ। ওই গর্তের ওপর একটি ঢাকনা দেওয়া থাকে। সোনার সেই ঢাকনা তুলে দেবীর দেহাংশ স্পর্শ করতে হয়।

দেবীর ভাগবতে বলা হয়েছে,

'গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যত প্রতিষ্ঠিতম্।'

এই তথ্য অনুযায়ী ধরে নেওয়া যেতেই পারে, নেপালে পড়েছে সতীর জানুদেশ। তিনি মহামায়া, তিনিই দেবী গুহ্যেশ্বরী।

প্রসঙ্গত, নেপালে এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিটি বিহালে (বিহারে) পুরোপুরি উলঙ্গ বালিকাকে মা কালী বা দেবী দুর্গা হিসেবে পুজো করা হয়। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই কুমারীকে নির্বাচন করা যায়। নবরাত্রির শেষদিনে নানান ধরনের পরীক্ষা নেওয়ার পর তাকে নির্বাচন করা হয়। তাই নেপালের মুখ্য দেবতা হিসেবে পশুপতিনাথকে পুজো করা হলেও সেখানে যে শক্তির বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও কোনও বিদগ্ধ পণ্ডিতদের মতে, দেবী গুহ্যেশ্বরী বৌদ্ধ ধর্মের জনৈক শক্তিশালী বজ্র যোগিনীর প্রতিমূর্তি, যা আর এক মতে, চারজন তান্ত্রিক দেবতার সম্মিলিত রূপ।

লঙ্কায় পড়েছিল দেবীর পায়ের নূপুর

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে, লঙ্কায় পড়েছিল দেবী সতীর পায়ের নূপুর। এখানে দেবীর নাম 'ইন্দ্রাক্ষী', ভৈরব 'রাক্ষসেশ্বর'। সেখানে উল্লেখ আছে,

'লঙ্কায়াং নূপুরশ্চৈর ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তব ইন্দ্রেণোপাসিতা পুরা॥'

দেবরাজ ইন্দ্র দেবীকে পুজো করেছিলেন বলে তাঁকে বলা হয় ইন্দ্রাক্ষী। পীঠনির্ণয়ের মূল পাণ্ডুলিপিতে লঙ্কা সতীপীঠ হিসেবে চিহ্নিত ছিল না, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরে। ভৈরবের নাম দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের দেবতা। একইসঙ্গে সীতাকে উদ্ধার করার আগে লঙ্কার অপরপারে সমুদ্রকে বাগে আনার জন্য শ্রীরামচন্দ্র করেছিলেন দেবী দুর্গার অকালবোধন। একইসঙ্গে পুরাণে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, লঙ্কাকে রক্ষা করতেন স্বয়ং দেবী কালিকা। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, লঙ্কাও একান্নপীঠের অন্যতম।

একটি পঞ্জিকায় বলা হয়েছে, সমুদ্রতীরে রয়েছে এই পীঠস্থান।

শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ গুহা ডাম্বুলা থেকে সিংহলীদের শেষ রাজধানী ক্যান্ডি শহরের পথে 'মাতালে' নামে একটি জনপদ আছে। এখানেই আছে গৌরী আম্মার বিশাল প্রাচীন মন্দির। গঠনশৈলী দক্ষিণী আদলের। এখানে চারটি অপরূপ কারুকাজ করা কাঠের রথ আছে। বিভিন্ন সময় দেবী এই রথে চড়ে পরিক্রমায় বের হন। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, এটি একান্নপীঠের অন্যতম এবং এখানেই পড়েছিল দেবীর পায়ের নূপুর।



বাংলাদেশের বগুড়ায় অপর্ণা মা

করতোয়াতটে গুল ফং বামে বামেশ ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তএ ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা।।

অর্থাৎ পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে দেবীর গুল্‌ফ পড়েছিল। দেবীর নাম অপর্ণা, দেবতা হলেন বামেশ ভৈরব। অপর্ণা মাকে অনেকে ভবানী মা নামেও ডাকেন। একটি ভিন্ন মত হল, এখানে দেবীর 'কর্ণ' পড়েছিল। পীঠ নির্ণয় তন্ত্রে বলা হয়েছে,

'করতোয়া তটে কর্ণো বামে বামন ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবঃ।।'

ওই মতে, এখানে ভৈরবের নাম বামন। অতি পবিত্র নদী করতোয়ার পুরাণে উল্লেখ আছে। দেবাদিদেব মহাদেবের হাত থেকে কিছু পবিত্র জল পৃথিবীতে পড়লে তা নদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

এখানে পড়েছিল দেবীর 'কর্ণ' মতান্তরে 'গুলফ'

এখানে পড়েছিল সতীর দেহখণ্ড

মহাদেবের কর থেকে এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে বলে স্বয়ং ব্রহ্মা এই নদীর নাম রাখেন করতোয়া। স্কন্দপুরাণে এই নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'হে করতোয়া নদ, তুমি সরিৎশ্রেষ্ঠা বলে বিশ্রুতা। তোমার তুল্য রূপবতী নদী আর নেই। যেহেতু তুমি তরুণী হয়েও রজোবিহীনা, অতএব তুমি ধন্যা ও পুণ্যা'। অবিভক্ত বাংলার উত্তরাংশের কেন্দ্রস্থল ছিল রাজশাহী। পাবনা জেলার উত্তরে এবং বগুড়া জেলার দক্ষিণে প্রায় একশো বর্গ মাইল জুড়ে ছিল এক বিরাট জঙ্গল। এই জঙ্গলের প্রাচীন নাম ছিল গুলফাপুরী। এই জায়গাতেই ছিল দেবী অপর্ণার পীঠ। এই বিরাট জঙ্গলের অবস্থান ছিল করতোয়া নদীর পশ্চি ম তটে। ভবতোয়া নামে আর একটি নদী, মঙ্গলের উত্তরদিকে করতোয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে জঙ্গলের পশ্চিম দিয়ে বয়ে যেত। এই দুটি নদীর মাঝে এই জঙ্গল প্রাচীন কালে দ্বীপের মতো ছিল। এখন জঙ্গলের একের তিন অংশে মানুষজন বসবাস করেন।

অনেকে দেবী মাকে ভবানী নামেও সম্বোধন করে থাকেন। প্রতিমার বিশেষত্ব কিছু নেই। সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা থাকে। শুধু সোনার মুখটি দেখা যায়। বর্তমানে জায়গাটির

স্থানীয় নাম ভবানীপুর। দুঃখের বিষয়, এই অঞ্চলের যাবতীয় সমৃদ্ধি ১২৯২ বঙ্গাব্দ এবং ১৩০৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে ধবংস হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে দেবী এখানে বিরাজ করতেন, 'যোড় বাঙ্গালায়', সেখানে এখন তৈরি হয়েছে আধুনিক মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমদিকে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়া পুরোনো ইটের বাড়িতে ভৈরব বামেশ আছেন। শাস্ত্রে আছে, ভৈরব থাকবেন দেবীর বাঁ দিকে। কিন্তু এখানে তা নেই। ভবানীপুরের নৈঋত কোণে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে করতোয়া ও ভবতোয়া নদীর সঙ্গমস্থানে অপর্ণা মায়ের অধিষ্ঠান ছিল। প্রায় ছ'শো তিয়াত্তর-চুয়াত্তর বছর আগে রাজনৈতিক টাল মাটালের জন্য জনৈক সাধক দেবীকে এখানে এনে গহন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে মোহন মিশ্র নামে জনৈক মহাসাধক অপর্ণা মা'কে পুনরায় প্রকাশ করেন। আজও গুলফা (গুন্টা) গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে অনেক প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। চোখে পড়ে অনেক বড় বড় দিঘির চিহ্ন। বগুড়া শহরের উত্তরে করতোয়া নদীর তীরকে বলা হয়, পৌন্ড্রবর্ধন। একসময় এই নদী ছিল খুবই স্রোতসিনী। কিন্তু আজ স্থবিরা। নদীর তীরে বগুড়া শহরের চার ক্রোশ দূরে শিলাদ্বীপ আছে। এখানে নারায়ণীযোগে স্নান করলে ত্রিকোটি কূল উদ্ধার হয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দ্বাপরের শেষ শক্তি উপাসক পৌন্ড্রপতি বাসুদেবের সময় এই গুলফাপুরীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। একসময় করতোয়া নদীর তীরে কমলাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন লক্ষণ সেনের বংশধর অচ্যুত সেন। রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। স্বভাবতই তিনি ছিলেন সন্তানের জন্য ব্যাকুল। এই সময় সেখানে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। ওই সময় জনৈক দেবীসাধক দেবীকে লুকিয়ে রাখেন সকলের অগোচরে। তারপর তারা চলেন কামাখ্যার দিকে। সেই ভয়ংকর যুদ্ধের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন যোগপুরুষ মোহন মিশ্র। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমান সম্রাটের সেনাপতি বক্তিয়ার খিল্‌জি, সেন-বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের কাছে থেকে অবিভক্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গার অধিকার নেন। নিয়মমতো কর দিয়ে সেন-বংশের রাজারা প্রায় একশো বছর রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে করতোয়া প্রদেশের শেষ রাজা ছিলেন অচ্যুত সেন। সেই সময় গুলফা পুরীতে জনৈক মহাপুরুষ মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। তাঁকে সবাই বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রাজা প্রায়শই যেতেন তাঁর কাছে। একদিন তিনি ওই মহাপুরুষকে তাঁর মনোকষ্টের কথা জানান। সব কথা শুনে তিনি বলেন, একবছর যদি শুদ্ধাচারে থাকতে পার, তাহলে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। রাজা ও রানী অক্ষরে অক্ষরে যোগীপুরুষের কথা শুনলেন। একসময় তাদের একটি কন্যা-সন্তান হল। মহাযোগী বলে গিয়েছিলেন, ছেলে হলে নাম রাখবে জগন্নাথ আর মেয়ে হলে ভদ্রাবতী। তাই মেয়ের নাম রাখা হল ভদ্রাবতী। ততদিনে অবশ্য যোগীপুরুষ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল ভদ্রাবতী। রাজা তাঁকে বড় করতে লাগলেন ছেলের মতো করে। অপরূপা রূপের অধিকারী রাজকন্যা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত

হয়ে ওঠেন। একসময় রাজকন্যার দশ বছর বয়স হল। শোনা যায়, রাজকন্যার জন্মের সময় গণৎকারেরা তার কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন, কন্যার দশ বছর থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি সময়টা ভালো নয়। এই সময় তার বিয়ে দিলে সামগ্রিকভাবে দেশের সর্বনাশ হবে। তারা আরও জানালেন, এই সময়ের মধ্যে যদি রাজকন্যা স্বামী সহবাসিনী হন, তাহলে তার পতির বিনাস অবশ্যম্ভাবী। নির্মূল হয়ে যেতে পারে তার পিতৃকুল। স্বভাবতই গণৎকারদের ভবিষ্যদ্বাণী বিষাদের বার্তা পৌঁছে যায় সমগ্র রাজবাড়িতে। এদিকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার রূপ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজার পরলোকগত সচিবের দৌহিত্র মা-বাবা হারা বিজয়বাহু ছিলেন তাঁর স্বজাতীয়। তখন বিজয়বাহুর বয়স ছিল পঁচিশ। ব্যক্তিগত জীবনে সে অত্যন্ত অসংযত জীবনযাপন করত। শিক্ষাদীক্ষায় ছিল বিশেষ দুর্বল। একসময় সে কামনা করে ভদ্রাবতীকে। রাজা ও দেশের মানুষ বিজয়বাহুকে এ-বিষয়ে তিরস্কার করে সতর্ক করে দিলেন। তবে শারীরিকভাবে সে ছিল খুবই রূপবান। রাজ্যের মানুষদের এ-হেন ব্যবহারে আত্রেয়ী নদীর তীরে বসবাসকারী জনৈক ব্রাহ্মণের দুশ্চরিত্রা সুন্দরী ষোড়শী স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিমদিকে এগিয়ে গিয়ে গৌড়ে আশ্রয় নিল। সেখানে গিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সে কামাল খাঁ নামে পরিচিত হয়। কয়েকদিন পরে সে তৎকালীন গৌড়ের রাজা ফিরোজ শাহের ছেলে বাহাদুর শাহকে বলেন, 'অচ্যুত সেনের কন্যা অপূর্ব সুন্দরী, তাঁকে বিবাহ কর'। বাদশাও তার কথা মতো অচ্যুত সেনকে তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এই বাহাদুর শাহও খুবই দুশ্চরিত্র ছিল। তখন বিজয়বাহু আর একটি চাল চাললো। সে তাঁর রক্ষিতা সর্বাণীর মাধ্যমে বাহাদুর শাহকে বশীভূত করে প্রবলভাবে তাঁকে ভদ্রাবতীকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে।

গৌড়ের বাদশাহের চিঠি পেয়ে হতবাক হয়ে যান রাজা অচ্যুত সেন। হঠাৎ-ই সেই যোগীপুরুষ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজাকে বললেন, আপনি রটিয়ে দিন রাজকন্যা অত্যন্ত অসুস্থ। তারপর কয়েকদিন পরে প্রচার করে দিন, রাজকন্যার মৃত্যু হয়েছে। অন্য এক বালিকার মৃতদেহ দাহ করে দূতের মনে বিশ্বাস তৈরি করুন। সেইমতো সব কাজ করা হল। সবশুনে ঘটনা পরম্পরা জেনে তা মেনে নিলেন বাহাদুর শাহ। কিন্তু বিজয়বাহু ওরফে কামাল খাঁ সেই তথ্য মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ সবই মিথ্যা কথা।

বিপদ থেকে আপাত উদ্ধার পাওয়ার পর রাজা যোগীপুরুষের কাছে মেয়ের, কোনও সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। যোগীপুরুষ বললেন, আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত কন্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অশুভ সময়। এই সময় কন্যা যদি স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে তার স্বামীর মৃত্যু এবং বাপের বাড়ির সকলের অবধারিত বিনাশ হবে।

যোগীপুরুষ প্রস্তাব দেন, কোনও সুলক্ষণ যুক্ত শিশুর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিন। এর ফলে কন্যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হবে না। এইসঙ্গে রাজকুমারী ও তার খুদে স্বামীকে গোপনে অন্য কোনও প্রাসাদে রেখে দিন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল, এরকম সুলক্ষণযুক্ত শিশু স্বামীর সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে। যোগীপুরুষ বললেন, তার ব্যবস্থাও আছে। আমি আপনার রাজ্যে আসার আগে বারাণসীতে ছিলাম। সেখানে কান্যকুব্জ দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ধারা নগরীর সূর্যবংশীয় রাজার শিশুপুত্র বসবাস করছে। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত রাজা, রানী ও তাঁদের গুরুদেবের সঙ্গে ওই ব্রাহ্মণ বাড়িতে আশ্রয় নেন। রাজার মৃত্যু হলে রানীমা তাঁর দু'বছরের শিশুপুত্রকে রেখে সহমরণে যান। সেই রাজপুত্র সুনীলপ্রতাপ, ব্রাহ্মণের এক শিশুপুত্রের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়ায়। ওই রাজপুত্রের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে। তবে রাজপুত্রের মন ভালো রাখতে ব্রাহ্মণ-পুত্রকেও একই সঙ্গে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

রাজা যোগীপুরুষের এই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে মেনে নিলেন। একসময় শিশুদুটিকে নিয়ে আসা হল। কয়েকদিনের মধ্যে গুলফাপুরীতে গোপনে দু'বছরের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল চোদ্দো বছরের রাজকন্যার। কেটে গেল দু'টি বছর।

এদিকে বিজয়বাহু রাজকন্যা জীবিত আছে, এ-বিষয়ে মানসিকভাবে নিশ্চিত হয়ে একাগ্রচিত্তে ভাবতে থাকে কীভাবে রাজ্যের সর্বনাশ করবে। একসময় যোগীপুরুষ চলে গেছেন। অন্য রাজ্যে চলে গেছেন সেই খবর পেয়ে বিজয়বাহু সন্ন্যাসীর বেশ ধরে উপস্থিত হল গুলফাপুরীতে। সন্ন্যাসী কারও সঙ্গে কথা বলেন না। রাত বাড়লেই বিজয়বাহু বেরিয়ে পড়ে রাজকন্যার খোঁজে। একদিন সূর্যোদয়ের সামান্যক্ষণ পরে অত্যন্ত গোপনে কমলরাজ অন্তপুরে স্নান করছিলেন রাজকন্যা ভদ্রাবতী। একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে বিজয়বাহু গৌড়ে গিয়ে বাহাদুর শাহকে খবরটা দিয়ে তাকে কমলপুর আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত করে তুলল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাহাদুর শাহ কমলপুর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হল। একসময় বাহাদুর শাহ, দূতের মাধ্যমে অচ্যুত সেনকে, ভদ্রাবতীকে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন, না দিলে পরিণতিতে যুদ্ধ যে অনিবার্য তাও জানাতে ভুললেন না। এদিকে এই খবরে রাজ্যের মানুষ জানতে পারল, ভদ্রাবতী তখনও অবধি জীবিত রয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে রাজার সমস্যার কথা যোগবলে জানতে পারলেন যোগীপুরুষ। মানসিকভাবে বল পেলেন রাজা। ওঁরা জানতে পারলেন, সমস্ত এই ঘটনার মূলে রয়েছে বিজয়বাহু। যোগীপুরুষের আশীর্বাদে যুদ্ধে হেরে গেল বাহাদুর শাহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজয়বাহু ওরফে কামাল খাঁ নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। তার রক্ষিতা সর্বাণীকে অনাথ মহিলা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিল রাজা অচ্যুত সেনের কাছে। রাজা তাকে স্থান দিলেন রাজপ্রাসাদে। বিজয়বাহুর এক বন্ধু পণ্ডিতমশাই সেজে রাজদরবারে পাঠশালা খুলল। সেখানেই পড়তে যেত রাজকন্যার ছোট্ট স্বামী সুনীলপ্রতাপ ও তার বন্ধু।

একদিন বিজয়বাহুর সেই গুরুমশাই সাজা বন্ধু জোর করে খাবার খাওয়ানোর নাম করে বিষ খাইয়ে দিল সুনীলপ্রতাপকে। বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারালো রাজার জামাই। শোকে ভেঙে পড়লেন রাজকন্যা ভদ্রাবতী। কিন্তু যোগীপুরুষদের কৃপায় অপর্ণা মা'র চরণামৃত

খেয়ে প্রাণ ফিরে পেল সুনীলপ্রতাপ। এরপর বিজয়বাহু স্বৈরিণী সর্বাণীকে পরিচারিকা সাজিয়ে পাঠাল রাজ জামাতার কাছে। এদিকে যোগীপুরুষের গণনায় কুপ্রভাব তখন কাটতে আর বছর দুয়েক বাকি।

অন্যদিকে গৌড়ে তৈরি হল আর এক নাটক। সেখানকার রাজা ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর বিজয়বাহু ওরফে কামাল খাঁ-র প্ররোচনায় বাহাদুর শাহ সিংহাসনচ্যুত করল তার বড় ভাইকে। আবার বাহাদুর শাহ আক্রমণ করল কমলপুর। কিন্তু আগেই এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিলেন কমলপুরের সেনাপতি প্রতাপচন্দ্র। সেবারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন রাজ জামাতা সুনীলপ্রতাপ ও তাঁর ব্রাহ্মণবন্ধু মোহন মিশ্র। তাঁদের বীরত্বে আবার পরাজিত হল গৌড়ের রাজা বাহাদুর শাহ।

তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে বিজয়বাহু মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল। সে শুনেছিল যোগীপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী। অশুভ সময়ের মধ্যে ভদ্রাবতী যদি সংযম না রাখতে পারে তাহলে রাজ্যের সর্বনাশ সম্ভব হবে। সর্বাণীকে বলা হল, ভদ্রাবতী ও অন্যান্যদের অসাক্ষাতে কুমার সুনীলপ্রতাপকে মোহিত করতে। এক বছর ধরে এ-ধরনের প্রচেষ্টায় সফল হল সর্বাণী। পরিচারিকার কাছে আদি রসাত্মক কাহিনী শুনে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটল সুনীলপ্রতাপের। একদিন যখন রাজকন্যা স্বামীকে বাতাস করে ঘুম পাড়িয়ে অন্য কক্ষে যাবার জন্য প্রস্তুত, তখন রাজ জামাতা তার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হলেন। ভদ্রাবতীও তখন ভুলে গেলেন তার ব্রত, তথা যোগীপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। একমাস ধরে রাজকন্যা সহবাস করলেন তার স্বামীর সঙ্গে।

রাজা তখন যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। রোগশয্যায় দিন কাটাচ্ছেন সেনাপতি প্রতাপচন্দ্র। যোগীপুরুষ যোগবলে বুঝতে পারলেন, রাজ্যের ধবংসের সময় আসন্ন। চরের কাছে সব খবর পেয়ে বিজয়বাহু তখন আবার কমলপুর আক্রমণে উদ্যত হল। বন্দী হলেন রাজা অচ্যুত সেন। বিজয়বাহুর হাতে নিহত হলেন সুনীলপ্রতাপ। স্বামী ও বাবার মৃতদেহ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন ভদ্রাবতী। তার আগে যোগীপুরুষের আশীর্বাদে ও অপর্ণা মা-র পদধূলিধন্য তরবারি নিয়ে তিনি (ভদ্রাবতী) যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সুনীলপ্রতাপের বন্ধু মোহন মিশ্র ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরে এলেন রাজধানীতে। কমলপুরে তখন ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। সারি দিয়ে চিতার আগুন জ্বলছে করতোয়া নদীর তীরে। খবর এল কামাল খাঁ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। মোহন মিশ্র তাঁর গুরুদেব যোগীপুরুষকে বললেন, আদেশ দিন পাপীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। এ-কাজ করতে গিয়ে যদি প্রাণ চলে যায় তাও আমার কাছে শ্রেয় বলে মনে হবে। কারণ, প্রাণ গেলে মনে করব অন্নদাতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যুত্তরে গুরুদেব বললেন, তুমি বালক, তবুও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছ। কিন্তু মনে রেখো, বিধির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। রাজা ও রাজ জামাতা জীবিত নেই। অধিকাংশ সৈন্যরাই মারা গেছে। মহিলারা স্বেচ্ছায় সহমরণে চলে যাচ্ছেন। আর তিনদিনের মধ্যে এই বিশাল নগরী ধবংস হয়ে

যাবে। সীতার যেমন রাবণ ও তাঁর বংশের ধ্বংসের জন্য জন্ম হয়েছিল, কমলপুর ধ্বংসের জন্য জন্ম হয়েছে ভদ্রাবতীর। এটাই বিধির লিখন। কে সেই বিধান খণ্ডাবে!

শুরু হল মহাযুদ্ধ। প্রতিপক্ষের আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল কমলপুর। যোগীপুরুষ দু'জন ব্রাহ্মণের সহায়তায় দেবীর পাষাণ অঙ্গ গুলফাপুরী থেকে নিয়ে গিয়ে গহন অরণ্যের মাঝে মাটির নীচে পুঁতে রাখলেন। কমলপুর ধ্বংস হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন রাজ জামাতা সুনীলপ্রতাপের বাল্যবন্ধু মোহন মিশ্র। তিনি বললেন, গুরুদেব আমাকে গুলফাপুরীর থেকে কামরূপে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি বললেন, মোহন, আমাকে এবার এই দেহ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি এখানে থাকতে পার। তা না হলে বঙ্গদেশে গিয়ে করতোয়া নদীর তীরে মহাপীঠ ক্ষেত্রে অপর্ণা মায়ের মূর্তির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করবে। একদিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে আমি এখানে চলে এলাম।

মোহন মিশ্রের নির্দেশে, ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁর গুরুদেব সতী অঙ্গকে পুঁতে রেখেছিলেন তা জানতে, তার কাছাকাছি জায়গায় দু'জন ব্রাহ্মণ তপস্যা শুরু করেন। এই দুই ব্রাহ্মণের নাম মথুরেশ চক্রবর্তী ও মনোহর চক্রবর্তী। মথুরেশ চক্রবর্তী থাকতেন পূর্বদিকে, গোবিন্দপুর গ্রামে এবং মনোহর চক্রবর্তী থাকতেন দেবী পুরীর পশ্চিমদিকের একটি বটগাছের তলায়।

একদিন ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। জনৈক শাঁখারী করতোয়া নদীর পথ ধরে ব্যবসার জন্য দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় একটি সাত-আট বছরের সুন্দরী মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি নিয়ে যাচ্ছো? শাঁখারী বললেন, শাঁখা বিক্রি করতে যাচ্ছি। সেই ছোট্ট মেয়েটি জানতে চাইল, শাঁখা দিয়ে কি হয়? উত্তর দিলেন শাঁখারী, মেয়েরা হাতে শাঁখা পরেন।

বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তাহলে তুমি আমাকে একজোড়া শাঁখা পরিয়ে দাও। শাঁখারী জিজ্ঞেস করল, তোমার শাঁখার দাম দেবে কে?

বালিকা বলল, ওই গাছতলায় আমার বুড়ো বাবা তপস্যা করছেন। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনার মেয়ে শাঁখা নিয়েছে, দামটা দিয়ে দিন। মালার থলিতে পয়সা আছে, সেখান থেকে দিতে বলবে। শাঁখারী আর কোনও দ্বিধা না করে বালিকার দু'হাতে শাঁখা পরিয়ে দিল। তারপর ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে ডাকাডাকিতে মনোহর চক্রবর্তীর ধ্যান ভেঙে গেল। বললেন, কি বলছ তুমি? এবার ব্রাহ্মণের আরও অবাক হওয়ার পালা। শাঁখারী বললেন, আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে। তার দাম ছ'আনা। পয়সাটা আমায় দিয়ে দিন। আশ্চর্য হয়ে যান ব্রাহ্মণ মনোহর চক্রবর্তী। তারপর বললেন, কোথায় আমার মেয়েকে শাঁখা পরালে?

শাঁখারী বললেন, ওই করতোয়ার পাড়ে, এখনও সে সেখানে বসে খেলা করছে।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করলেন, কত বড় মেয়ে?

উত্তর দিলেন শাঁখারী, সাত-আট বছরের হবে। পরমাসুন্দরী। তার হাতে শাঁখা দুটো খুব ভাল মানিয়েছে। আপনার মেয়ে বলেছে, আপনার মালার থলিতে পয়সা রাখা আছে।

ব্রাহ্মণের তো আবার হতবাক হওয়ার পালা। দেখলেন, সত্যিই মালার থলিতে পয়সা রাখা আছে। তখন তিনি শাঁখারীকে বললেন, চল, মেয়ের হাতে শাঁখা দেখে দাম দেব।

দু'জনে এসে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। শুধু ধুলোয় খেলার চিহ্ন আঁকা রয়েছে। ব্রাহ্মণ সব বুঝতে পারলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন, যদি মা'কে মানসচক্ষে দেখতে পাওয়া যায়। আছড়ে পড়লেন সেই ধুলোর ওপরে। কাঁদতে লাগলেন শাঁখারীও।

অনেকক্ষণ ধরে করতোয়া নদীর জলের ওপর দেখা গেল শাঁখা পরা একটি ছোট্ট হাত। সত্যি হল সাধকের স্বপ্ন।

ভবানীপুরে যেখানে মা তাঁর শাঁখা পরা হাত দেখিয়েছিলেন, সেই জায়গা এখন মজে গেছে। মজা ডোবায় পরিণত ওই জায়গাটি পরে পুকুরে পরিণত করা হয়। পুকুরের নাম দেওয়া হয় শাঁখাই। সেই মহাভাগ্যবান শাঁখারী ও তাঁর বংশধরেরা পাবনা জেলার অধীন নিমাইচরাতে বাস করতেন। তাঁর বংশধরেরা মা'কে নিয়মিতভাবে এক জোড়া শাঁখা দিতেন। পরে বংশ লোপ পাওয়ায় সেই প্রথা লোপ পেয়েছে।

আর এক ব্রাহ্মণ মথুরেশ চক্রবর্তী মায়ের দর্শন পাওয়ার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তাঁর দু'টি গরু ছিল। শুধুমাত্র তাদের দুধ খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন। একজন রাখাল গরু দু'টিকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য মাঠে নিয়ে যেতেন। প্রতিদিন তারা পাঁচ সের করে দুধ দিত। একসময় দুধের পরিমাণ কমে আসতে লাগল। একদিন তারা আর দুধ দিল না। বিপদে পড়লেন ব্রাহ্মণ। সন্দেহ করতে লাগলেন রাখালকে। রাখাল তো স্পষ্টই বলে দিল, আমি দুধ খাই না, বিক্রিও করি না। একদিন রাখাল দেখল, একটি গরু গহন বনের মধ্যে ছোট্ট বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুধ ঢেলে দিচ্ছে। পরে আরও কোণে গিয়ে একই কাজ করল। পরের দিন ব্রাহ্মণ ও রাখাল একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। মথুরেশ ও মনোহর, সমস্ত ঘটনা জানালেন তাদের গুরুদেব মোহন মিশ্রকে। মোহন মিশ্র তাঁদের আশীর্বাদ করে বললেন, অনেক জন্মের পুণ্যফলে এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা এ-কাজে সফল হতে পেরেছ।

মথুরেশের গরু যেখানে দুধ ঢেলেছিল সেখানে গর্ত খুঁড়ে পাওয়া গেল অপর্ণা মা'র পাষাণাকার দেহখণ্ড। শিলাখণ্ডটি তুলে বেলগাছের তলায় রাখা হল। গরুটি দ্বিতীয়বার সেখানে দুধ ঢালছিল সেখানে সামান্য খোঁড়ার পরে দেখা গেল শিবলিঙ্গের মাথা। মোহন মিশ্র বললেন, গুরুদেবের কাছে শুনেছি, বামেশ ভৈরব এখানে গুপ্তভাবে অবস্থিত। বোধহয় ইনিই হলেন ভৈরব বামেশ। শিবলিঙ্গকে আর ওঠানো হল না। বেলগাছের কাছে একটি কুটির তৈরি করে মা'কে স্থাপন করা হল। গুরুদেবের আদেশে মা'কে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হল। একই সঙ্গে মোহন মিশ্র, তাঁর দুই ব্রাহ্মণ শিষ্যকে মায়ের পূজা পদ্ধতি শিখিয়ে

তা গোপন রাখতে বললেন।

বর্তমানে দেবী অপর্ণা ভবানী নামে পূজিতা হন। মায়ের সর্বাঙ্গে কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে। শুধুমাত্র সোনার মুখটি দেখা যায়। আজও ওই দুই ব্রাহ্মণ পরিবারের উত্তরসূরিরাই মায়ের পুজো করেন। মনোহর ও মথুরেশ চক্রবর্তী মায়ের জন্য কুটির তৈরি করিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে পাঠান সেনাপতি রহমৎ খাঁ বেলগাছের কাঠ দিয়ে একটি 'ষোড় বাঙ্গালা' তৈরি করান। তার সঙ্গেও রয়েছে দেবীর এক অলৌকিক কাহিনী।

একসময় গৌড়ের পাঠান নরপতি বর্বর শা'র মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন হাবসীদের সমূলে নিধন করে প্রভুবধের প্রতিশোধ নেন। তিনি কোচবিহার আক্রমণ করে আগেকার রাজবংশ ধ্বংস করেন। পরে নিজের ছেলে ও সেনাপতি রহমৎ খাঁকে সেখানে রেখে গৌড়ে ফিরে আসেন।

কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা অনেক কোচ সৈন্য নিয়ে গৌড়ের রাজপুত্র ও সেনাপতিকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাজপুত্র ও সেনাপতি পরাজিত হয়ে পালাতে থাকেন। গৌড়ে আশ্রয় নেন রাজকুমার। কিন্তু সেনাপতি নৌকা করতোয়া নদীর চড়ায় আটকে যায়। সেনাপতি রহমৎ খাঁ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও নৌকা ভাসাতে সমর্থ হলেন না। এমনসময় তাঁরা জানতে পারলেন, সামনে বনের মধ্যে হিন্দুদের এক দেবী আছেন, যাঁর কাছে যে যা মানত করে তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়। তখন সেনাপতি রহমৎ খাঁ মায়ের কুটিরের সামনে এসে প্রার্থনা জানান। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। তখন মথুরেশ ও মনোহর চক্রবর্তী, পেঙ্গলেশ্বরে বসবাসরত তাঁদের গুরুর কাছে গিয়ে সব জানালেন। গুরুদেব মোহন মিশ্র তাঁর শিষ্যদের এক বিশেষ ক্রিয়ার নির্দেশ দিলেন। গুরুদেবের আদেশে কাজ করা মাত্র প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। সেনাপতির নৌকা আবার জলে ভাসল। বিপদমুক্তির কিছুদিন পরে সেনাপতি রহমৎ খাঁ মায়ের মন্দির সংলগ্ন সব জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে 'ষোড় বাঙ্গলা' তৈরি করিয়ে দেন। কিন্তু ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে সেটি ধ্বংস হয়ে যায়।

ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলা। একদিন যে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ ওই পুরী ধ্বংস করেছিল, আবার সেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনই মায়ের মন্দির তৈরি করে দেন।

মনোহর চক্রবর্তী অপর্ণাদেবীর পুরীর পশ্চিমদিকে প্রায় এক মাইল দূরে খিঁয়ানী গ্রামে বাসভবন তৈরি করে পরিবার-পরিজনসহ বাস করতেন। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল অপর্ণা মায়ের প্রাত্যহিক স্নান-পুজোর ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে মথুরেশ চক্রবর্তী তাঁর আগের জায়গা গোবিন্দপুরে বাসগৃহ তৈরি করে সপরিবারে সেখানে থাকতে শুরু করেন। তিনিও মহামায়ার স্নান, ভোগ রান্না ও বলিদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বলিদান করতেন বলে তাঁর বংশ 'তলাপাত্র' উপাধি পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মনোহর ও মধুরেশ চক্রবর্তীর কাজে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে সমালোচনার ঝড় ওঠে। একঘরে হয়ে যান তাঁরা।

আশ্চর্যের বিষয়, গুরুদেব মোহন মিশ্রকেও পেঙ্গলেশ্বর ধামে গ্রামের ও আশেপাশের

কিছু দুষ্টলোক ভীষণ উৎপাত শুরু করল। একসময় তিনি বিরক্ত হয়ে কৃপাখালি নদীতীরের বনের মধ্যে এটি পাকুড় গাছের তলায় আশ্রয় নেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পাষাণময় কালাচাঁদ। এই পাকুড় গাছ থেকেই ক্রমে গ্রামের নাম হয়েছিল পাকুড়িয়া। একদিন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় মোহন মিশ্র স্বপ্নে দেখলেন দেবী বলছেন, ‘মোহন এ ঘোর কলিকালে তুমি যে মন্ত্রের উপাসক হয়েছ, তাতে দার পরিগ্রহ করে শক্তির সাহায্য গ্রহণ করলে আমার সাক্ষাৎ পাবে, না হলে তোমার এই সাধ অপূর্ণই থেকে যাবে।’ স্বপ্নেই উত্তর দিলেন মোহন মিশ্র, ‘মা আমি এখন তো অতি বৃদ্ধ হয়েছি। তায় বিদেশি, অজ্ঞাতকুলশীল। এখানে কে আমায় ব্রাহ্মণকন্যা সম্প্রদান করবে?’ উত্তর দিলেন দেবী, ‘তুমি চিন্তা করোনা। কাল সকালে তুমি কিছু দূরে উদিশা গ্রামে চলে যাও। আমার নির্দেশে ওই গ্রামের কুমুদানন্দ চক্রবর্তী তোমাকে তার রূপগুণবতী কন্যা সম্প্রদান করবে।’ পরেরদিন মোহন মিশ্র ওই গ্রামে গেলেন। যথারীতি অপর্ণা মায়ের আদেশে ভক্ত কুমুদানন্দ তাঁর কন্যা ভবানীকে, মোহন মিশ্রের হাতে সম্প্রদান করলেন। এই ঘটনায় গ্রামের সকলে কুমুদানন্দকে সমাজচ্যুত করলেন। ঘটনাপরম্পরায় বিচলিত হয়ে মোহন মিশ্র তাঁর শ্বশুরের স্বার্থে মহারাজা কংসনারায়ণের শরণাপন্ন হন।

রাজা কংসনারায়াণের রাজত্ব ছিল রাজশাহী জেলার বারাহী নদীতীরে। তাহিরপুর নগরেই তিনি ভূমাধিকারী হলেও করদ রাজাদের মত ছিলেন। কিছু দিন ধরে গুরুদেব মোহন মিশ্র পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তাহিরপুর আসেন। সেখানে পা রাখার পরেই শুনলেন, রাজধানীতে হাহাকার লেগেছে। অনেককে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলেন, রাজা কংসনারায়ণের একমাত্র যুবক ছেলে হঠাৎ মারা গেছেন। শোনা গেল, ওই মৃত যুবকের সৎকারের আয়োজন চলছে। তখনও মোহন মিশ্রের স্নান-আহ্নিক হয় নি। হঠাৎ তাঁর মনের মধ্যে রাজকুমারের মৃতদেহ দেখার বাসনা জেগে উঠল। তিনি জনৈক কর্মচারীকে মৃতদেহের কাছে তাঁকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কেউ তার সেই কথায় কান দিল না। শেষ পর্যন্ত রাজাকে কেউ সেই প্রস্তাবের কথা জানালে কংসনারায়ণ বললেন, আপত্তি কি! নিয়ে এসো তাঁকে।

পশ্চিমদেশী সন্ন্যাসীবেশী ব্রাহ্মণ মৃতদেহ স্পর্শ করে বললেন, আপনাদের রাজকুমারের মৃত্যু হয়নি। দৈব দুর্বিপাকে মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছেন। মহাস্বস্ত্যয়নে ওর চৈতন্য আবার ফিরে আসবে।

তাঁর কথায় রাজা সম্মত হয়ে সন্ন্যাসীর যা যা প্রয়োজন তাই সরবরাহ করার আদেশ দিলেন। রাজকুমারের মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হল। সেখানেই গভীর রাতে যোগীবর জনৈক পুরোহিতকে দিয়ে মহাপুজোর আয়োজন করলেন। ধ্যানমগ্ন মহাঋষি বুঝতে পারছিলেন, কিছুতেই পুরোহিতের পক্ষে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। বারবার বাধা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পুরোহিত। বললেন, মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে একথা প্রমাণ করুন। সন্ন্যাসী ত্রিশূল দিয়ে প্রতিমার গায়ে আঘাত করতে কিছুটা মাটি ঝরে পড়ল।

পুরোহিত তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসীকে পুজোর আসন ছেড়ে দিলেন।

এরপর আসনে বসলেন স্বয়ং মোহন মিশ্র। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ধ্যানে বসলেন। অনেকক্ষণ পরে পুরোহিত ঠাট্টা করে বললেন, এবার বুঝি প্রাণ এসেছে। তখন সন্ন্যাসী একটি বেলপাতার শির প্রতিমার পায়ে আঘাত করামাত্র সেখান থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। ওই ঘটনা দেখে পুরোহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সেখানে উপস্থিত দু'একজন ছুটে গিয়ে রাজাকে এই অভূতপূর্ব সংবাদ দিলেন। রাজা কংসনারায়ণ ছুটে এলেন তাঁর কাছে। মায়ের চরণের রক্তস্নাত জায়গাটি রক্তচন্দন দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন সন্ন্যাসী। এক প্রহর সময় পুজো চলার পর সম্পন্ন হল বলিদান। একসময় মৃত হিসাবে ঘোষিত রাজকুমার ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন।

সবাই বলতে শুরু করলেন, এই সন্ন্যাসী মানুষ নন, দেবতা। রাজকুমারকে বাঁচানোর জন্য স্বর্গ থেকে এসেছেন। সারা রাজ্য আনন্দে মেতে উঠল। পরেরদিন সকালে মোহন মিশ্র রাজাকে নিজের পরিচয় জানালেন। নিজের শ্বশুরের অবস্থাও তাঁকে জানালেন। রাজা কংসনারায়ণ বললেন, দেব, এ অতি তুচ্ছ কাজ। আজই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বিকেলে রাজা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজনকে নিয়ে এক সভার আয়োজন করে উপস্থিত সকলের সামনে বললেন, যে মহাত্মার অদ্ভুত ক্ষমতাবলে গতকাল আমার পুত্র জীবন ফিরে পেয়েছে, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কামরূপ যাত্রা করেছিলেন। সম্প্রতি মহামায়ার আদেশে উড়িশা গ্রামের কুমুদানন্দ চক্রবর্তীর মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে। অজ্ঞাত কুলশীলকে মেয়ে দেবার জন্য কুমুদানন্দকে একঘরে করা হয়েছে। এখন পরিচয় পাওয়ার পর পরিষ্কার হয়ে গেছে, কুমুদানন্দ যোগীবরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করে কোনও অন্যায় করেন নি। তাই আমি সানন্দে ঘোষণা করছি, আজ থেকে কুমুদানন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর কন্যা-জামাতা স্বচ্ছন্দে এখানে বসবাস করতে পারবেন। এতে যার অমত থাকবে তাকে সমাজচ্যুত করা হবে।

সকলেই রাজা কংসনারায়ণের সঙ্গে একমত হলেন। রাজা যোগীবরকে প্রচুর ধন, রত্ন, জায়গা দিতে চাইলেন। সন্ন্যাসী বললেন, আমার এসব কোনকিছুরই প্রয়োজন নেই। সেইসময় থেকেই মোহন মিশ্র, গুণধর ঠাকুর নাম ও রাজা কংসনারায়ণের বংশ, গোত্র, গাঁই গ্রহণ করলেন। রাজা ছিলেন সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, শাণ্ডিল্য গোত্রজ, নান্নসী গাঁই। সেইদিন থেকে ধারা নগরীর রাজগুরুর বংশধর মোহন মিশ্র রাজা কংসনারায়ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্রজ, নন্দনবাসী গাঁই নামে সমাজে পরিচিত হন। রাজা কংসনারায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। নির্দোষী কুলীনদের নিয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আট পটীতে বিভক্ত ছিল। আট পটীর মধ্যে যোগীবরের শিষ্য মনোহর ও মথুরেশ চক্রবর্তীর আশ্রয়দাতা কুলীনগণ ভবানীপুরী পটী নামে বিখ্যাত হন।

মোহন মিশ্র তথা গুণচন্দ্র ঠাকুর পাকুড়িয়াতে সস্ত্রীক বাস করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর তিনটি পুত্র হয়। প্রথমটির নাম রত্নগর্ভ, দ্বিতীয়টির নাম রাঘব বা শ্রীগর্ভ, কনিষ্ঠের নাম

কাশীনাথ। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে মোহন মিশ্র শরীর ত্যাগ করেন। যে পাঠান সেনাপতি যোড়বাঙ্গলা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি রত্নগর্ভকে গৌড়ে নিয়ে পার্সীভাষায় শিক্ষিত করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় রত্নগর্ভ নবাব সরকারের কাজ করতে থাকেন। মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন।

এক সময় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় অবস্থা বিপাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে রাজশাহীর দিকে এগোতে থাকেন। রত্নগর্ভ মজুমদার তখন তাণ্ডা নগরীতে ছিলেন। রত্নগর্ভ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন প্রয়াত সেনাপতি রহমৎ খাঁ'র ছেলে সেখ হিম্মত খাঁ'কে। হিম্মত খাঁ এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন। ততদিনে কালাপাহাড় ধ্বংস করে দিয়েছেন পেঙ্গলেশ্বরধাম। কিন্তু সেদিন একজন মুসলমান সেনাপতির তৎপরতায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল মহামায়ার ধাম।

সপ্তদশ শতকে তখন দিল্লির সিংহাসনে রয়েছেন আকবর। ওই সময় টোডরমল্ল ও মানসিংহ বাংলাদেশে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব নেন। রাজশাহী জেলার সাঁতৈল গ্রামে রামকৃষ্ণ রায় নামে জনৈক স্থিতধী মানুষ সেইসময় আটটি পরগণার অধিপতি হন। দিল্লির বাদশা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। অপর্ণা মায়ের পুরী তৈরি করার জন্য তিনি সম্রাট আকবরের কাছে থেকে যে সনদ পান, সেখানে 'ভবানী থান' বলে উল্লেখ থাকায়, দেবী অপর্ণা নামে এবং তাঁর পুরী ভবানীপুর নামে চিহ্নিত হয়। ১২৯২ সালের প্রারম্ভে প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। রাজা রামকৃষ্ণ নতুন মন্দিরে অপর্ণা মা-কে এনে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু অপর্ণামা রাজা রামকৃষ্ণকে রাতে স্বপ্নে বলেন, নক্সার বাঙ্গালাতে শুধু নক্সা দেখে, আমাকে দেখে না। আমাকে আগের মন্দিরে রেখে আয়।' দেবীর আদেশে রামকৃষ্ণ অপর্ণা মাকে আবার পুরনো যোড়বাঙ্গালায় রেখে আসেন। রাজার আদেশে ভবানীপুরীর পূবদিকে, রাজমহিষী সর্বাণীর নামে একটি বড় পুকুর কাটা হয়। আজ তা পাঁঠা ধোওয়া পুকুর নামে পরিচিত। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুতে বাদশাহ হন জাহাঙ্গীর। তখন বাংলার সুবেদার হন ইসলাম খাঁ। তিনি অপর্ণা মা'র মন্দিরের যোড়বাঙ্গালার নির্মাণকারী রহমৎ খাঁর পৌত্র এবং হিম্মৎ খাঁ'র পুত্র।

রত্নগর্ভের ভাই রাঘব ঠাকুর ছিলেন উচ্চ কোটির সাধক। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় আশ্চর্য হন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায় এবং রঘুনন্দন রায়। রামজীবন রায়ের দত্তক পুত্র রাজা রামকান্ত প্রথমে বৈষ্ণব গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগ্রহী হলে তার ওপর দৈব অভিসম্পাত নেমে আসে। রামকান্ত শেষপর্যন্ত কুমার বিশ্বানন্দ ঠাকুরের কৃপায় রোগমুক্ত হন। এই রামকান্তের স্ত্রী-ই হলেন রাণী ভবানী। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই প্রায় একবছর সময় এই মন্দিরে কাটান। রামকান্তের গুরু কালু তর্কবাগীশ অপর্ণা মায়ের বিশেষ অনুগ্রীহিত ছিলেন। সাঁ তৈলের রাণী সত্যবতী মণিমুক্তাখচিত একটি সোনার ছত্র দেবী অপর্ণা মায়ের মাথায় রাখার জন্য দিয়েছিলেন। একদিন জনৈক দরিত্র ব্রাহ্মণ মন্দিরের মধ্যে গিয়ে সোনার ছত্রটি কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে বাইরে চলে গেলেন। রাতে কালু

তর্কবাগীশকে 'মা' স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'কালু, আমার সোনার ছাতাটা এক গরীব ব্রাহ্মণকে দিয়েছি। ছাতাটা আমার খুব প্রিয়। ব্রাহ্মণ বেশি দূরে যেতে পারেনি। পথে ঘুরপাক খাচ্ছে। তুমি উপযুক্ত অর্থ দিয়ে ওটি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' বগুড়া ও শেরপুরের মধ্যে একটি জায়গা থেকে ব্রাহ্মণকে ধরে, নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে ছত্রটি ফেরৎ আনা হয়।

রাণী ভবানী ভবানীপুরের বড় ধরনের বারোদুয়ারি মন্দির তৈরি করিয়ে ভবানীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা রামকৃষ্ণ ভবানীধামে কয়েক বছর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে ভবানী পুরীর চারদিকে পরিখা ছিল। আজও তাঁর চিহ্ন আছে। বর্ষায় জল জমে। একটি পাকা মন্দিরে মা অধিষ্ঠিতা আছেন। 'মা' চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। তিনি মোক্ষদাত্রী। তাঁরই ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত হয়। তিনিই স্বয়ং ভগবতী। তিনিই পরম ব্রহ্ম।

ভবানীপুর মন্দির সংস্কার, উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটির গঠনতন্ত্র

ধারা ঃ ১

নামকরণ ঃ এই কমিটির নাম হবে ঃ ভবানীপুর মন্দির সংকার, উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি।

ধারা ঃ ২

ঠিকানা ঃ বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা সদরে পৌর এলাকায় সংগঠনের প্রধান কার্য্যালয় অথাৎ কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া ভবানীপুরসহ প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের শাখা কার্য্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে (কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

ধারা ঃ ৩

কর্মক্ষেত্র ঃ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী এই সংগঠনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত থাকবে।

ধারা ঃ ৪

মনোগ্রাম ঃ দেবী মহামায়ার শাঁখা পরিহিত হস্তযুগল জলের মধ্যে থেকে উধর্বমুখী দৃশ্যমান হবে।

ধারা ঃ ৫

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ (ক) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের শ্রীশ্রী মা ভবানী মন্দির এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্দিরগুলো সংরক্ষণ, সংস্কার, উন্নয়ন ও সুষ্ঠ পরিচালনা।

(খ) মন্দিরের অনুকূলে বিভিন্ন সময়ে দানকৃত সম্পত্তি (স্থাবর-অস্থাবর) উদ্ধার করা এবং গ্রহণ করা। মন্দিরে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা।

(গ) নাটোরের ছোট তরফ এস্টেট সহ অন্যান্য জমিদার, রাজন্যবর্গ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দানকৃত ভূ-সম্পত্তি এবং সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও

পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ঘ) ঐতিহাসিক এই পীঠস্থানে দেশ বিদেশ থেকে আগত পুণ্যার্থী, পর্যটক এবং সর্ব সাধারণের আগমন, নির্গমন, পরিদর্শন, পূজা-অর্চনা, অর্ঘ্যদান ইত্যাদির ব্যবস্থা, তাদের আহার, বিশ্রাম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অত্র মন্দিরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানাদি যেমন ঃ মাঘী পূর্ণিমা, রাম নবমী, দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা (শ্যামা পূজা), শিবচতুর্দশীসহ অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সম্পাদন করা।

(চ) মন্দিরের নিত্য পুজোর আয়োজন সম্পাদন করা, ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) সরকার কর্তৃক ভবানীপুর মন্দিরের অনুকূলে প্রদেয় এনুইটি বৃহত্তর কার্য্যে এই কমিটির পরিচালনা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) ঐতিহাসিক এই পীঠস্থানের দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রসারের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নকল্পে দেশি বিদেশি সাহায্য অনুদান ইত্যাদি গ্রহণ করা।

(ঝ) ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

(ঞ) অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ধারা ঃ ৬

সদস্য পদ ঃ (ক) বাংলাদেশের নাগরিক সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারবেন।

(খ) সদস্যের ধরন ঃ (১) সাধারণ সদস্য (২) আজীবন সদস্য (৩) সম্মানীত/ উপদেষ্টা সদস্য। (গ) সদস্য পদের পদ্ধতি ও যোগ্যতা ঃ

১. (ক) সদস্য পদ পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে সদস্য পদ দেওয়া যেতে পারে। সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফিজ ও চাঁদা দিতে হবে। সদস্য পদ প্রদানের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সদস্যগণ ভোটাধিকার প্রাপ্ত হবে।

১.(খ) সংগঠনের কোন বেতন ভোগী কর্মচারী সদস্যপদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২. আজীবন সদস্য ঃ কমিটির অনুকূলে সর্বনিম্ন নগদ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করে আজীবন সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এই অঙ্ক হ্রাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩. সম্মানিত সদস্য ঃ দেশের যে কোন বিশিষ্ট নাগরিককে পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মানিত সদস্য পদ দেওয়া যেতে পারে। তবে সম্মানিত সদস্য পদের কোন ভোটাধিকার

থাকবে না।

৪. সদস্য পদের অবসান ও বাতিল ঃ (ক) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে (খ) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় তার সদস্য পদ প্রত্যাহারের আবেদন জানালে (গ) সংগঠনের স্বার্থবিরোধী বা ভাবমূর্তির পরিপন্থি কোনও কাজ করলে, নৈতিক স্খলনজনিত অভিযোগ আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হলে, কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। কার্যনির্বাহী সদস্য পর পর তিনটি নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ খারিজ হয়ে যাবে।

ধারা ঃ ৭

সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) নির্বাহী পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ

সাধারণ পরিষদ ঃ সংগঠনের সকল বৈধ সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সংগঠনের সার্বভৌম ও গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ হিসাবে গঠনতন্ত্র অনুমোদন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন সহ গঠনতন্ত্রে বর্ণিত দায়-দায়িত্ব পালনে যাবতীয় ক্ষমতা এই পরিষদ প্রয়োগ করবে।

প্রতি বছরে একবার সুবিধামত সময়ে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাহী পরিষদ ঃ

নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৫১ (একান্ন) জন। কমিটির পদসমূহ নিম্নরূপঃ

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	৫জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
যুগ্ম সম্পাদক	১জন
সহ-সাধারণ সম্পাদক	৩জন
কোষাধ্যক্ষ	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	২জন
দফতর সম্পাদক	১জন
সহ-দফতর সম্পাদক	২জন
অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সহ-অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক	২জন
প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক	১জন
সহ-প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক	২জন
আইন বিষয়ক সম্পাদক	১জন

সহ-আইন বিষয় সম্পাদক	২জন
নির্বাহী সদস্য	২৪জন
	মোট ৫১জন

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

প্রধান উপদেষ্টা	১ জন
উপদেষ্টা	৩০ জন
	৩১ জন

ধারা ঃ ৮

নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ঃ নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। মেয়াদ পূর্তির তিনমাস আগে সাধারণ সভায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। দৈব দুর্বিপাক কিংবা অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি অন্তবর্তী দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটি শুধুমাত্র দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা করবেন। কোনও নীতিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

ধারা ঃ ৯

নির্বাহী পরিষদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

সভাপতি ঃ ৩. তিনি সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

৪. তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৫. তিনি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের কাজ পরিচালনার জন্য অগ্রিম ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। পরে নির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

৬. বিতর্কিতমূলক কোন বিষয়ে তিনি একটি কাস্টিং ভোট প্রদানের মাধ্যমে চূড়ান্ত নিস্পত্তি করতে পারবেন।

৭. সভাপতি যে কোনও ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে পারবেন।

৮. গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন বিতর্কে সভাপতির ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সহ সভাপতি ঃ

সংগঠনের কার্যক্রমে সহ-সভাপতিগণ সভাপতিকে সাহায্য করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রম অনুসারে সহ-সভাপতিগণ অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধারণ সম্পাদক ঃ

৩. তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংগঠনের সকল সভা আহ্বান করবেন।

৪. তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সংগঠনের যে কোনও ব্যাপারে সরকারী বা বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. তিনি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পুনর্বহাল/বরখাস্ত/প্রশাসনিক পদক্ষেপ ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারবেন।

৬. তিনি পদাধিকার বলে সংগঠনের যে কোনও কাজে সভাপতি/ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

৭. তিনি সংগঠনের যাবতীয় রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং সকল সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. তিনি জরুরী অবস্থায় যে কোনও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। তবে তা নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

৯. তিনি সকল প্রকার বিল ভাউচার অনুমোদন করবেন। পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল প্রকার খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

১০. সংগঠনের অর্থ/সম্পত্তি গচ্ছিত রাখা ও তার যথাযথ হিসাব রাখবেন।

১১. তিনি বাৎসরিক বাজেট ও কার্যবিবরণী তৈরি করবেন।

১২. তিনি সংগঠনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য অগ্রিম ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় সেই ব্যয় অনুমোদন করে নিতে হবে।

যুগ্ম সম্পাদক ঃ

১. সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ

১. সহ সাধারণ সম্পাদকগণ সংগঠনের যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

২. যুগ্ম সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ সাধারণ সম্পাদকগণ ক্রমানুসারে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ ঃ

১. আর্থিক কর্মকাণ্ডের হিসাব সংরক্ষণে সাধারণ সম্পাদকগণ সহযোগিতা করবেন এবং আর্থিক সংক্রান্ত নথিপত্র ও ভাউচারাদি সংরক্ষণ করবেন।

২. প্রাপ্ত নগদ টাকা/চেক/ দ্রব্যাদি গ্রহণের সময় রশিদ প্রদান করবেন। প্রাপ্ত অর্থ

প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্ক হিসাবে জমা করবেন।

৩. বার্ষিক বাজেট ও হিসাব বিবরণী তৈরি করতে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

৪. তিনি নগদ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রিম হাতে রাখতে পারবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

১. তিনি সংগঠনের সদস্যদেরকে সংগঠিত করে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা এবং নতুন সদস্য ভর্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন।

২. এছাড়া নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ

১. সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. এছাড়া নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

দফতর সম্পাদক ঃ

১. সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশক্রমে সংগঠনের অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-দফতর সম্পাদক ঃ

১. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমান্বয়ে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক ঃ

১. সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ ক্রমে তিনি যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠান বিষয়ক সহ-সম্পাদক ঃ

১. অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

২. অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ

১. তিনি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ

১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

নির্বাহী সদস্য ঃ

১. প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

২. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ঃ ১০

সভা আহ্বান ঃ (১) নূন্যতম পনের দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সভা এবং সাত দিনের বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

(২) জরুরী সভা ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে সাত দিনের এবং নির্বাহী পরিষদের

ক্ষেত্রে তিন দিনের বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করতে হবে।

(৩) অতি জরুরী সভা ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে তিন দিনের এবং নির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করতে হবে।

ধারা ঃ ১১

মুলতুবি সভা ঃ মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক সেই সভাতেই অথবা পরবর্তীতে নোটিশের মাধ্যমে সভার তারিখ জানিয়ে দেবেন। মুলতুবী সভায় নতুন কোনও বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা ঃ১২

তলবী সভা ঃ সংবিধানগত ভাবে সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে তলবী সভা আহ্বান করা যেতে পারে। নির্বাহী পরিষদের ১/৩ অংশ সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদক বরাবর নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বানে অনুরোধ জানাতে পারেন। এই আবেদন ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বানে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীদের একজন আহ্বায়ক হয়ে নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশের গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৩ ঃ

সভার কোরাম ঃ সকল পরিষদের সভায় ১/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা ১৪ ঃ

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবার পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় একজনকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। নির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন কাজে উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ এবং পরামর্শ গ্রহণ করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে।

ধারা ১৫ ঃ

তহবিল সংরক্ষণ ঃ (১) সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার শেরপুর শহরে অবস্থিত যে কোন তফসিল ব্যাংকে সংগঠনের নামে একটি সেভিংস একাউন্ট খুলতে পারবেন। সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের মধ্যে যে কোনও দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ওই হিসাব পরিচালিত হবে। তবে এদের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর আবশ্যিক। প্রয়োজনে জেলা শহরে একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যেতে পারে।

(২) সাধারণ তহ্বিল ছাড়াও নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে আরও অন্যান্য তহবিল গঠন করতে পারবেন। সমুদয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট ধারা ১৫-র ১ উপধারার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(৩) হিসাব নিকাশ নিরীক্ষার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকে দুজন এবং সাধারণ পরিষদ থেকে তিন জন এই পাঁচজনের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠন করে সংগঠনের হিসাব নিকাশ নিরীক্ষা করতে পারবে এবং নিরীক্ষ প্রতিবেদন সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

ধারা ১৬ ঃ

নির্বাচন বিধি ঃ (১) নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস আগে সাধারণ সভা আহ্বান করতে হবে এবং ওই সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যসমন্বয়ে গঠিত হবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও প্রার্থী এই কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

(২) প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ১৭ ঃ

গঠনতন্ত্র পরিবর্তন বা সংশোধন ঃ (১) গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব কোনও সদস্য লিখিত আকারে সভাপতির কাছে বরাবর দাখিল করবেন। সভাপতি সেই প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। নির্বাহী পরিষদের সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে তা সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। সাধারণ পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সেই প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

ধারা ১৮ ঃ

ভোটার ঃ সদস্য পদের মেয়াদ ৩ (তিন) মাসের কম হলে অথবা নির্বাচন তফশীল ঘোষণার আগের মাস পর্যন্ত সদস্য চাঁদা পরিশোধ না থাকলে কোন সদস্য ভোটার বলে গণ্য হবেন না।

ধারা ১৯ ঃ

সংগঠনের পতাকা ঃ

আয়তক্ষেত্রের পতাকা আয়তন = ১০ ঃ৬

চার রং = লাল, গেরুয়া, নীল ও সাদা।

ধারা ২০ ঃ

নির্বাহী ও উপদেষ্টা পরিষদের শূন্য পদ পূরণ ঃ (১) নির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের কোনও পদ শূন্য হলে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

ধারা ২১ ঃ

অনাস্থা পদ্ধতি ঃ নির্বাহী পরিষদের কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনতে হলে তা সাধারণ পরিষদের ১/৩ অংশের স্বাক্ষরে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতি /সাধারণ

সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ অংশের সিদ্ধান্তে তা কার্যকর হবে।

ধারা ২২ ঃ

সংগঠনের বিলুপ্তি ঃ সংগঠনের বিলুপ্তি সাধন করতে হলে উক্ত কারণে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় ২/৩ অংশ সদস্যের সমর্থন গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ২৩ ঃ

সংগঠনের নাম পরিবর্তন ঃ সংগঠনের নামের কোনও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজনের কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। সংবিধান একটি পবিত্র দলিল ইহা রক্ষার দায় দায়িত্ব সকল সদস্যের।

যশোহরে'র যশোরেশ্বরী

যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ঈশ্বরীপুর। একসময় এখানে প্রাচীন যশোহর রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ রাজেশ্বরী কুলদেবতা যশোরেশ্বরী। কষ্ঠি পাথরে তৈরি লোলজিহ্বা ভীষণা এই কালী মূর্তি। এখন থেকে আটশ বছর আগে রাজা লক্ষ্মণ সেন হিমালয়ের পাদদেশের সব জায়গার জরিপ করান। ওই জরিপ কাজের গণ্ডিতে গঙ্গার দক্ষিণ পাশের অঞ্চলকে নবদ্বীপ এবং বঙ্গীয় সমতট নামে চিহ্নিত করেন। বঙ্গীয় সমতটের পশ্চিমের সর্বদক্ষিণ কোণে একটি এলাকায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে একান্ন পীঠের এক পীঠ। গড়ে ওঠে ঈশ্বরীপুরের কালীমন্দির। কালের বিবর্তনে এই মন্দির কিছু ধ্বংস হয়ে যায়।

আবার ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছুদিন আগে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীন যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার রাজধানী ছিল ঈশ্বরীপুরে। রাজা প্রতাপাদিত্য এ-অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসহ পর্তুগীজ ও মগদের সমন্বয়ে আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী মনোভাবাপন্ন হওয়ার সুবাদে রাজা প্রতাপাদিত্য মুসলিম সৈন্যদের জন্য ট্যাংরা মসজিদ, খ্রীষ্টানদের জন্য গীর্জা তৈরি করান এবং যশোরেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার করান।

বর্তমান যশোহর শহর থেকে অনেক দূরে (প্রায় ৮০-৮৫ মাইল) যশোরেশ্বরীর মন্দিরটি অবস্থিত। সনাতন ধর্মের মতে, পৃথিবীর সৃষ্টির পর সমগ্র সময়কে চারটি যুগে ভাগ করা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। ক্রোধে উন্মত্ত মহাদেবের, সতীদেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার ঘটনাটি ঘটে সত্য যুগে। জনশ্রুতি, সেইসময় দক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তার মেয়ের নাম ছিল সতী, যিনি আমাদের কাছে মহামায়া দুর্গা, কালী প্রভৃতি অসংখ্য নামে পরিচিতা। মহাদেবের সঙ্গে দেবী সতীর বিয়ে হয়। কিন্তু দক্ষ রাজা তাঁর জামাইকে পছন্দ করতেন না। কারণ, তার জামাই সবসময় শ্মশানে থাকতেন, গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে গাঁজা খেয়ে ভূতপ্রেতদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। একবার দেবতাদের সভায় দক্ষ রাজাকে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান, কিন্তু মহাদেব তাকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাননি। এজন্য দক্ষ রাজা বিশেষভাবে অপমানিত বোধ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি যজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর জামাইকে নিমন্ত্রণ জানাননি। নারদের মাধ্যমে এই যজ্ঞের কথা জানতে পেরে সতী সেই যজ্ঞস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর

সতীকে পতি নিন্দা শুনতে হয়। একসময় পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন।

সতীর দেহত্যাগের কথা জানতে পেরে মহাদেব দক্ষযজ্ঞের স্থানে আসেন তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে এবং স্ত্রী সতীকে কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য শুরু করেন এবং দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দেন। তারপর ভগবান বিষ্ণু অন্যান্য ভগবানের অনুরোধে তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে দেন এবং সেগুলি আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় পড়তে থাকে। সেই সুবাদে দেবী সতীর পবিত্র 'করকমল' পড়ে যশোহরের এই অঞ্চলে। এখানে ভৈরবের নাম চণ্ড। ভারতের হাসনাবাদ থেকে ঈশ্বরীপুরের দূরত্ব ২৫ মাইল এবং বর্তমান যশোহর শহর থেকে মাত্র ১২৫ কিলোমিটার।

সম্প্রতি কয়েক বছর আগে মূল মন্দিরটির আবার সংস্কার করা হয়েছে। এখানে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে দেবীর পুজো হয়। মূল মন্দিরের একটি দরজা ও ছটি জানলা আছে। মূল মন্দিরটি সংস্কার করা হলেও, মন্দিরে ঢোকার প্রবেশ পথ এবং একসময়ে সাধুদের যে থাকার জায়গা ছিল সেগুলির অনেকাংশই বর্তমানে প্রায় ধবংস হয়ে গিয়েছে।

850



বাংলাদেশে বরিশালের শিকারপুরে উগ্রতারা

অনেকদিন আগে বাংলাদেশের (পূর্বতন পূর্ব বাংলায়) বর্তমান বরিশালের বেশিরভাগ অঞ্চলই জলনিমগ্ন ছিল। কথিত আছে, এ-দেশের পুকুর পাঁচ-সাত হাতের বেশি খোঁড়া সম্ভব হয় না। কারণ, ওই জায়গাটুকু খুড়লেই সেখানে জল ভর্তি হয়ে যায়। চীনদেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (খ্রীঃ অব্দ ৬৩৬ থেকে ৬৪৬ খ্রীঃ অব্দ) ভারত ভ্রমণে এসে জলপথে বাকলা ও কামরূপ যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তখন গৌড়ের পূর্বভাগ সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকায় তিনি বাকলায় যেতে পারেন নি। তবে তিনি কামরূপে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনেকদিন আগে সুগন্ধা নামে অত্যন্ত খরস্রোতা নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত হ'ত। মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলে সুগন্ধার নাম পাওয়া যায়। তন্ত্র ও পুরাণ মতে সুগন্ধা নদীর তীরে দেবী (সুনন্দা) সতীর 'নাসিকা' পড়েছিল। লোকবিশ্বাস, সেই থেকে নদীটির নাম হয় সুগন্ধা। পীঠমালায় রায়গুণাকর লিখেছেন,

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা!
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দ দেবতা।।

পীঠ নির্ণয়তন্ত্রের বা তন্ত্রচূড়ামণি মতে, এটি তৃতীয় পীঠস্থান। শিবচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে ষষ্ঠ পীঠস্থানে, নাম সুগন্ধা। সেখানে বলা হয়েছে,

'সুগন্ধায়াঞ্চ নাসিকা
দেব স্ত্র্যম্বকনামা চ সুনন্দা তত্র দেবতা।'

কুবিজাতন্ত্রের পীঠবর্ণনায় এই জায়গায় উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার অধীন শিকারপুর গ্রামে দেবীর প্রাচীনমঠসহ পাষাণমূর্তি এবং পোনাবালিয়ার উপকণ্ঠে শ্যামরাইল পল্লীতে পাষাণ শিবলিঙ্গ আছে। সুগন্ধা নদী সম্বন্ধে সেখানে একটি প্রচলিত প্রবাদ শোনা যায়। একবার শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁর শিষ্যের বাসস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় তিনি তাঁর গ্রামের নাম বলেন। তখন যোগীপুরুষ তা চিনতে না পারায় শিষ্য বললেন গ্রামের নাম 'সোন্দার কূল'। তখন শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামী বলেছিলেন, সুগন্ধা কি এই সময়ের মধ্যেই সুপ্ত হয়েছে। একই সঙ্গে স্বামীজী তাঁর শিষ্যকে পোনাবালিয়ার শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের দেবীমূর্তির কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এই এলাকার পূর্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হওয়া মেঘনা নদী বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে। এই নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনী শোনা যায়। নমুচি নামে এক দৈত্য তপোবনে বলীয়ান হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা কোনমতে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারায়, ইন্দ্র নমুচির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। এইভাবে অনেকদিন কেটে যায়। নমুচি ইন্দ্রের সঙ্গে পূর্বশত্রুতা ভুলে গিয়ে তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে ইন্দ্র নমুচির শিরশ্ছেদ করা মাত্র, সেই কাটা মুণ্ডু ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে আসে। ইন্দ্র-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবসহ বিভিন্ন দেবতার শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু কেউ-ই সেই ছিন্ন মুণ্ডের করাল গ্রাস থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সাহসী হলেন না। অবশেষে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবর্ষি নারদের পরামর্শে সরস্বতী নদীতে স্নান করলেন। ছিন্ন মুণ্ডু ও সেই মুহূর্তে সেখানে পড়ে গেল। তখনকার মত সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেও বিশ্বাসঘাতকতার পাপ দেবরাজকে সবসময় দগ্ধ করতে লাগল। শেষে পিতামহ, ব্রহ্মা, ইন্দ্রকে গঙ্গাস্নান করতে বললেন। দেবরাজ গঙ্গোত্রীর কাছে পৌঁছানোমাত্র গঙ্গা সেখান থেকে অন্তর্হিতা হলেন। তখন ইন্দ্র গঙ্গার দর্শন পাবার আশায় তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা দর্শন দিয়ে বললেন, 'হে ইন্দ্র, তুমি মেঘরূপে ধরাতলে গমনপূর্বক সমুদ্রসহ মিলিত হইয়া আমার স্পর্শ লাভ করিলে, এই মিত্রদ্রোহী মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ইন্দ্র দেবীর আদেশে জলরূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে প্রবেশ করিলেন।' শোনা যায়, মেঘনা নদীর তীরে বসবাসকারী কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি তুলটের পাতায় এ ধরনের একটি কাহিনী লিখে রেখেছিলেন। পরে এটি একটি পৌরাণিক গল্পে পরিণত হয়েছে। পোনাবালিয়া গ্রামের উপকণ্ঠে শ্যামরাইলের শিববাড়ি এক প্রসিদ্ধ জায়গা হিসাবে সুদীর্ঘকাল ধরে চিহ্নিত হয়ে আছে। এখানকার শিবলিঙ্গ 'ত্র্যম্বকেশ্বর শিব' নামে প্রসিদ্ধ। একসময় এই জায়গার পাশ দিয়ে সুগন্ধা নদী বয়ে যেত। এই নদীর অপর পারে শিকারপুরে গ্রামে এই শিবের শক্তি উগ্রতারা (সুনন্দা) অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। এই ত্র্যম্বকেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করে একটি প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। একসময়ে ওই জায়গাটি ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। অসংখ্য হিংস্র পশু তখন সেখানে বাস করত। কাছের লোকালয়ে কিছু তথাকথিত নীচু জাতির মানুষ বসবাস করত। রাখালরা দিনের বেলায় গাভীদের জঙ্গলের কাছের জমিতে চরালেও অপরাহ্নে দোহনের সময় দুধ পাওয়া যেত না। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পরে গরুর মালিকেরা ভাবলেন রাখালরাই সব দুধ খেয়ে নেয় অথবা অন্য কোথাও তা বিক্রি করে দেয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদিন দেখা গেল, কয়েকটি গাভী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছে। রাখালেরা তাদের পিছন পিছন গিয়ে দেখলেন, একটি বড় বেলগাছের চারদিকে গাভীগুলি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ও তাদের স্তন থেকে অজস্র ধারায় দুধ সেখানে গিয়ে পড়ছে। রাখালেরা আরও ভালভাবে দেখার পর বুঝতে পারল, কয়েকটি ছোট গাছে ঢাকা বল্মীকের ওপর সেই দুধ গিয়ে পড়ছে। কেন এরকম হচ্ছে, এই কৌতুহলে রাখালেরা

ওই বল্মীকের চারদিকে পড়ে থাকা গাছের পাতা ও শাখাপ্রশাখা সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাখালেরা কিছুদূরে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। হঠাৎ সেই প্রজ্বলিত আগুন থেকে একটি ছোটখাট অপরূপ সুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা নারী বেরিয়ে এসে কাছের শেওলা ঢাকা পুকুরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। রাতে ওই এলাকার ভূস্বামী রামভদ্র রায় স্বপ্নে দেখলেন, শুভ্রকান্তি, জটাজুট ও ত্রিশূলধারী জনৈক যোগীপুরুষ বলছেন যে, তিনি শ্যামরাইলের জঙ্গলে বল্মীকের মধ্যে থাকেন। রাখালেরা ওই জঙ্গলে আগুন জ্বালানোয় জায়গায় জায়গায় তাঁর অঙ্গ ফেটে গেছে। তিনি যেন তাঁকে উদ্ধার করেন।

রামভদ্র রায়ের ঘুম ভেঙে গেল। পরেরদিন সকালে পরিচিত সবাইকে এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে ওই জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর অনুগতেরা সেই বল্মীক খোঁড়ার সময় একসময় শক্ত কোনও বস্তুর ওপর আঘাত করার শব্দ শোনা গেল। তখন সবাই মিলে বাকী মাটি সরানোর পরে দেখা গেল, সেখানে একটি শিবলিঙ্গমূর্তি রয়েছে। এরপর সকলে মিলে ওই লিঙ্গকে সরানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা একচুলও নড়ানো সম্ভব হল না। সেদিন রাতে আবার স্বপ্নাদেশ হল, এই লিঙ্গ পাহাড়ের মত অচল। কোনভাবেই একে সরানো সম্ভব নয়। তাই ওই জায়গাতেই মন্দির তৈরি করে পুজোর ব্যবস্থা করা হোক। তবে শিবলিঙ্গের মাথায় যেন কোনও আবরণ না থাকে।

দেবাদিদেবের আদেশে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে একটি মন্দির তৈরি করা হল। কিন্তু শিবলিঙ্গের মাথায় কোনও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয় নি। পরবর্তী সময়ে শিবপ্রসাদ রায়ের মেয়ে চাঁদমণি দেবী ত্র্যম্বকেশ্বরের জন্য একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করান।

শিকারপুর গ্রামের দেবী মূর্তি সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে। পঞ্চানন চক্রবর্তী নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ রাতে স্বপ্ন দেখলেন, ভগবতী কালিকা দেবী সামনে এসে উপস্থিত হয়ে সুগন্ধা নদীর গর্ভ থেকে তাঁর পাষাণ মূর্তি উদ্ধার ও স্থাপন করে পূজার্চনা করার আদেশ দিচ্ছেন। সকাল হলে নদীর গর্ভে নেমে প্রথমবার কালোপাথরে তৈরি বৃষভারূঢ় মহাদেবের মূর্তি পেলেন। সেই মূর্তি স্থাপন করে তিনি পুজো করতে শুরু করলেন। প্রবাদ আছে, বাকলার তৎকালীন রাজা এই বৃত্তান্ত শুনে মহা সমারোহে দেবীর পুজো করলেন এবং দেবীর সেবার জন্য 'তারাবৃত্তি' নামে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করে ইট দিয়ে তৈরি একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দিলেন। এই মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়। কিছুদিন আগে কিছু দুষ্কৃতি দেবীমূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। সেইসময় থেকে ঘটের ওপর দেবীর পুজো হয়। তবে শিবমূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয় নি। তারও নিত্যপুজো করা হয়। জায়গাটি 'তারাবাড়ি' নামে খ্যাত। বরিশালের সোন্ধ নদীর ধারে দেবী সুনন্দার এই মূর্তি অবস্থিত। মূর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল, দেবী-মূর্তি শবের ওপর দণ্ডায়মানা। তাঁর চার হাতে রয়েছে খেটক, খঙ্গ, নীলপদ্ম এবং খুলি (নরমুণ্ডের কঙ্কাল)। মাথার উপর ছোট আকৃতির কার্তিক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। অনেকের মতে, মূর্তি পরিকল্পনায় বৌদ্ধ মহাযানী ও বজ্রযানী প্রভাব রয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় ভূস্বামী রামভদ্র রায়কে

স্বয়ং ঈশ্বর স্বপ্নাদেশ দিয়ে বল্মীকে ঢাকা থাকা শিবলিঙ্গের প্রকাশ ঘটান। এই ভূস্বামী জমিদারির উন্নতিকল্পে প্রচুর পরিশ্রম করতেন। সেইসময় ওই জায়গার জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। জায়গাটির অধিকাংশই গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। তাই তিনি ও তাঁর ছেলে শ্রীকৃষ্ণ রায় বাঁশবেড়ে, হরিষণা প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের সেখানে নিয়ে এসে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে চৌষট্টিটি তালুকের সৃষ্টি হয়। রামভদ্র রায় ও তাঁর বংশধরেরা ত্র্যম্বকেশ্বর ভৈরবের নিত্য সেবার জন্য যে সব দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন তা আজও বর্তমান আছে।

উজিরপুরের দক্ষিণ দিকে একটি ছোট গ্রাম বারপাইকা। একসময় বারপাইকার পণ্ডিতসমাজের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে এসেছিলেন দার্শনিক পণ্ডিত শুকদেব তর্কালঙ্কার। স্থানীয় ভূস্বামী চৌধুরিরা তাঁকে সেখানে থাকার জন্য বাড়ি ও জমি দেন। সেইসময় তারা স্থানীয় মানুষজনের কুলগুরু হিসাবে পরিচিত হন। আজও সেখানকার গুঠিয়া, রূণসী, নাগপাড়া গ্রামে তাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করেন।

শুকদেব তর্কালঙ্কারের ভাই আনন্দিরাম সম্পর্কে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। প্রথম জীবনে আনন্দিরামকে আত্মীয় স্বজনেরা খুবই অবজ্ঞা করতেন। এমনকি একদিন তাঁর স্ত্রী খাবার থালায় অন্যান্য খাবারের সঙ্গে একমুঠো ছাই রেখে দেন। এতটাই অবজ্ঞা তিনি স্ত্রীর কাছে থেকে পেয়েছিলেন। একদিন ক্ষোভে দুঃখে আনন্দিরাম ঘর ছেড়ে চলে যান। অনেকদিন তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। অবশেষে নবদ্বীপে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলা আনন্দিরামের বাড়ির ভৃত্য দেখলেন জনৈকা সুন্দরী মহিলা ওই বাড়ির সন্ধ্যাপ্রদীপ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দিরাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির ভৃত্য 'যশা' তাঁকে ওই জনৈকা সুন্দরী মহিলার আলো জ্বালানোর ঘটনা বলার কয়েক মুহূর্ত পরে আনন্দিরাম 'মা', 'মা' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ওই অচৈতন্য অবস্থায় আনন্দিরামকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে বলা হয়, 'বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার জ্ঞানের স্ফূরণ হইয়াছে। তোমাদের ঠাকুরের ঘরের মাটির নীচে একখানি তালপাতার গ্রন্থ আছে, তাহা দ্বারাই তোমার সৌভাগ্য উদয় হইবে এবং তোমার বংশের উপর আমার অনুগ্রহ থাকিবে।'

এরপরে আনন্দিরাম ঘরে ফিরে আসেন। কালক্রমে এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি। একসময় তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একসময় বাকলার পীঠস্থান শিকারপুরে সংস্কৃতচর্চার খ্যাতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই জায়গায় অতীতে অনেক সন্ন্যাসীরাও আসতেন। বরিশাল শহর থেকে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে শিকারপুর। এই গ্রামে ভট্টাচার্য, কুণ্ডগ্রামী, গোত্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদিক ও বৈদ্য শ্রেণীর মানুষেরা বসবাস করেন। কয়েকটি সরোবর ছাড়াও এখানে কয়েকটি ভাঙা সমাধি মন্দির, একটি ভাঙা প্রাসাদ, কিছু বাসোপযোগী দালান বিগত শতাব্দীর চিহ্ন বহন করে চলেছে। এখানে বনের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত 'উগ্রতারা মূর্তি' তৈরির কৌশল

খুবই সুন্দর। ইঁটের তৈরি মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠান। বছরের বিভিন্ন সময়, বিশেষত শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে অনেক জনসমাগম হয়। মেলা বসে তিনদিন।

মন্দিরের বর্তমান ট্রাস্ট কমিটির সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল জানিয়েছেন, শিব চতুর্দশীর সময় দেশ-বিদেশ থেকে পূণ্যার্থী বরিশাল জেলার শিকারপুর-তারাবাড়ি নাশিকা পীঠস্থানে সমবেত হন। দুর্গাপুজোর সময়েও বিশেষ পূজার্চনার আয়োজন করা হয়। ওই সময় প্রতিবছর স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সরকারের বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত থাকেন। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে শান্তি যজ্ঞ করা হয়। সেইসময় বাংলাদেশের সীতাকুণ্ড আশ্রমের সন্ন্যাসীসহ অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় আলোচনা হয়। প্রতিবছর বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মন্দিরের ট্রাস্ট কমিটির পক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ধর্মীয় গান ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বছরের প্রতিদিন দুপুরবেলা মায়ের মন্দিরে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি অমাবস্যার দিন সাড়ম্বরে মায়ের পুজো হয়। দোল পূর্ণিমার দিন দোলযাত্রার যাবতীয় আয়োজন করা হয়।

'শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ' নামে সংস্কৃত কাব্যের প্রণেতা কালীকান্ত শিরোমণি, প্রখ্যাত পণ্ডিত রামধন ন্যায়লঙ্কার এবং নিদাৎবিদ রামচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রামের অধিবাসী। শিকারপুরের হাট খুবই জমজমাট। এই গ্রামে যাওয়ার জন্য যেমন বাস চলাচলের রাস্তা আছে তেমনই লঞ্চ ও নৌকাতেও যাওয়া যায়। শিবরাত্রির মেলা ছাড়াও কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো থেকে শ্যামাপুজোর সময় পর্যন্ত এখনও অনেক ধর্মপ্রাণ, কৌতুহলী মানুষ এখানে পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে যান।

একসময় এই জেলাকে বলা হত, 'বাংলার শস্যাগার'। এখানকার বালাম চালের খ্যাতি সর্বত্র ছিল। অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র এখান থেকে নুন সরবরাহ করা হত। মুঘল আমলে একাধিক 'নিমক মহলের' উল্লেখ আছে। সব থেকে বেশি নুন পাওয়া যেত শাহাবাজপুর, মনপুরা, সেলিমাবাদ পরগণা এবং লোহালিয়ায়। এখানে উৎকৃষ্ট মানের তাঁতের কাপড় এবং নৌকা তৈরি হত। এখানকার শীতলপাটিও সুপরিচিত।

চট্টগ্রামে দেবী ভবানী

মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকাশীতে যখন ছিলেন তখন সেখানকার বৈদিক ঋষিরা ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে তাঁকে প্রচণ্ড উপহাস করেন এবং কাশী থেকে চলে যেতে বলেন। ক্ষুব্ধ ব্যাসদেব কাশীর কাছেই অন্যত্র গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন এবং তপোবলে নতুন কাশী সৃষ্টি করার সঙ্কল্প করেন। এদিকে কাশীর মাহাত্ম্য নষ্ট হবে আশঙ্কা করে স্বয়ং অন্নপূর্ণা ব্যাসদেবকে ছলনা করেন। তখন ব্যাসদেব মহাদেবের শরণ নিলে তিনি বলেন, পৃথিবীর অগ্নিকোণে পরম সুন্দর ও অতি গোপনীয় চন্দ্রশেখর তীর্থ আছে। কলিকালে আমি উমার সঙ্গে ওই চন্দ্রশেখর চট্টলে বাস করব। প্রত্যেকে ওই তীর্থকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে মনে করবে। সেখানে পরম জ্ঞানী ব্রহ্মবাদী দেবগণ, ব্রহ্মা এবং সিদ্ধ মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ ভৈরবগণের সঙ্গে অহোরাত্র তপস্যা করে জ্ঞান অর্জন করছেন। এর দক্ষিণে তীর্থরাজ লবণাক্ত সমুদ্রের সঙ্গলাভ করার জন্য ভাগীরথী গঙ্গা স্বয়ং উপস্থিত। হিমালয়ের মত চন্দ্রশেখরও আমার আনন্দদায়ক। এইভাবে নানান উপদেশ দেবার পর মহাদেব দিব্যমূর্তি ধারণ করে ব্যাসদেবকে বললেন, আমি এইরূপে ওই তীর্থে উমার সঙ্গে থাকব। তুমি সেখানে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দেখতে পাবে। ওখানে গিয়ে তপস্যা করলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

তারপর বেদব্যাস চন্দ্রশেখরে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। অনেক দিন পরে তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, তুমি বর গ্রহণ কর। ব্যাসদেব বললেন, প্রভু, আপনি অনেক আগে কাশীতে আমাকে যে রূপে দর্শন দিয়েছিলেন সেই রূপে আপনি এখানে অবস্থান করুন। দেবাদিদেব বললেন, তাই হবে। তা ছাড়া পৃথিবীতে গয়া ইত্যাদি যে সব তীর্থ আছে তাদের সবাইকে এই সমুদ্রের কাছে চন্দ্রশেখর পাহাড়ে স্থাপিত করে সেই সব তীর্থকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থাধিষ্ঠিত হয়ে তুমি ত্রিলোক পরিত্রাণ কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

কথা শেষ করে মহাদেব তাঁর সামনের জমিতে ত্রিশূল নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই জমি জলপূর্ণ কুণ্ডে পরিণত হল। আর সেই কুণ্ডের ভিতর থেকে আগুনের শিখা বেরোতে লাগল। ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হয়ে কুণ্ডের পশ্চিম দিকে পাষাণদেহ ধারণ করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম। ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে

নদীর তীর দিয়ে সামান্য পথ গেলে দেখা যাবে, মেরু পর্বতসঙ্গ নামে এক মহা তীর্থক্ষেত্র। দক্ষযজ্ঞের পর বিষ্ণুচক্রে কর্তিত হয়ে সতীর দক্ষিণ বাহু এখানে পড়েছিল।

বারাহী তন্ত্রে উল্লেখ আছে,

'চট্টলে দক্ষিণো বাহু ভৈরবশ্চন্দ্র শেখরঃ।
তস্যৈব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষ মহেশ্বরঃ।।
রুদ্রলোকং সমাপ্নোতি যস্তত্রারোহয়েন্নবঃ।
বিল্বরূপো মহাদেবো ডমরু প্রতিমাশিলা।।

এখানে ভৈরবের নাম চন্দ্রশেখর। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তলায় বিরুপাক্ষ মহেশ্বর আছেন। কথিত আছে, এখানে উঠতে পারলে মানুষ রুদ্রলোক পায়। ওই জায়গায় বেলগাছের আকারে মহাদেব অধিষ্ঠান করেন বলে মানুষের বিশ্বাস। সেখানে ডমরুর মত আকৃতি বিশিষ্ট অনেক শিলা পড়ে আছে। দেবীর নাম ভবানী। তিনি কালীমূর্তিতে এখানে বিরাজমানা। শবারূঢ়া, মুণ্ডমালাধারিণী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী, চতুর্ভুজ। দেবীর গলায় রয়েছে নাগ যজ্ঞোপবীত, মাথায় অর্ধচন্দ্র, দুটি বাম হাতে রয়েছে খড়্গ ও মুণ্ড এবং অন্য দুটি হাতে রয়েছে বর ও অভয়মুদ্রা। ওই জায়গায় একই সঙ্গে কৃষ্ণ, জগন্নাথ, রাধিকা, সীতা, রামচন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা থাকেন বলে ভক্ত মানুষজন বিশ্বাস করেন।

এখানেই রয়েছে সীতাকুণ্ড। কারও কারও মতে, সতীর দক্ষিণ বাহু এখানে পড়েছিল। তাদের মতে, এই কুণ্ডের নাম 'সতীকুণ্ড'। উচ্চারণের বারংবার ব্যবহারে নামটি 'সীতাকুণ্ড'-এ পরিণত হয়েছে। আবার কারও কারও মতে, কোনও সময় সীতা এখানে এসেছিলেন বলে কুণ্ডের নাম হয়েছে 'সীতাকুণ্ড'। অমলেন্দু বিশ্বাস তাঁর 'চট্টল মহাতীর্থ প্রাচীন ইতিবৃত্ত' বইতে দেবীপুরাণ থেকে উদ্ধৃত করে সীতাকুণ্ড নামের যথার্থতা তুলে ধরেছেন।

বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।
চন্দ্রশেখর মারুহ্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে।।

অর্থাৎ কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখরে অবস্থান করব, চন্দ্রশেখরে কেউ আরোহণ (দর্শন) করলে তার আর পুনর্জন্ম হবে না।

দেবীপুরাণ, শ্রীবারাহীতন্ত্র, তন্ত্রচূড়ামণি, জয়দেব পদ্মাবতী, কবি নবীন চন্দ্র সেনের 'রঙ্গমতী' কাব্য ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায়, এই মাতৃতীর্থের সৃষ্টি হয় সেই প্রাগৈতিহাসিক সময়ে। সেইসময় রামচন্দ্র ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এসেছিলেন মহাদেবের দর্শন পাওয়ার জন্য। সীতাদেবীর সেখানে আসার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল সীতাকুণ্ড। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবীর এখানে আসার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, দেবীপুরাণের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা ঋষি সম্মেলনে সূতমুনির বর্ণনার মাধ্যমে। সেই বর্ণনায় জানা যায়, রামচন্দ্র অজ্ঞাত বনবাসের সময় ঘুরতে ঘুরতে শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে এলে মুনির নির্দেশে পূর্বোক্ত পুরীতে গিয়ে দেখলেন, জনৈক পূজনীয় মুনি ওই তীর্থে অবস্থান করছেন। পরম বিভূতি নিয়ে রামচন্দ্র মুনির কাছে জানতে চাইলেন।

মুনি সীতাদেবীকে দেখিয়ে বললেন, ইনি মহাদেবের আরাধ্যা মুক্তকেশী। এই দেবী আপনার অনুগামিনী হওয়ায় আপনি বিশেষভাবে ভাগ্যশালী। সমুদ্রোত্তর তীরে ভাখ্যতাব্য সমন্বিত জায়গায় এই দেবীর নামাঙ্কিত একটি কুণ্ড আছে যা ত্রিভুবনের সবাইকে পবিত্র করবে। রামচন্দ্র, ইনি যোগনিদ্রা, আপনার চাইতেও এই দেবীর কাজ করবার ক্ষমতা অনেক বেশি। বিধাতা আপনাকে অভিমান প্রদানের জন্য এই দেবীকে পাঠিয়েছেন। এই ক্ষেত্র থেকে অগ্নিকোণে রয়েছে চন্দ্রশেখর পাহাড়। সেখানে ভার্গবদেব আছেন যার নামে একটি কুণ্ড আছে। ওই পাহাড়ের পশ্চিমদিকে রয়েছেন স্বয়ম্ভুনাথ। তার উত্তরে রয়েছে নাভিগঙ্গা, পশ্চিমে ফল্গুনদী, পূর্বে জ্যোতির্ময় ও বাড়বানল।

পরেরদিন সকালে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবী পরমুষ্টি মুনির সঙ্গে চন্দ্রশেখরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সীতাকুণ্ডে পৌঁছেই মুনিকুণ্ডে ঢুকে সূর্যের দিকে মুখ করে ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে কুণ্ডের জলে ডুব দিয়ে শ্যামবর্ণা অষ্টভূজা হলেন। অষ্টভুজার অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ, তিনটি চোখ, শরীর কৃশ এবং দীর্ঘ, ধবজ-চামর বেষ্টিতা। রামচন্দ্র সেখানে কুণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সীতাদেবীকে দেখতে দেখতে ভাবলেন, এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরণ করেছে। পরমেষ্টি মুনি রামচন্দ্রকে বললেন, হাজার-অযুত বছর এই কুণ্ড গুপ্ত ছিল, কলিকালে জীব উদ্ধারার্থে প্রকাশ পাবে। যে কেউ ভক্তিতে এই কুণ্ডজল স্পর্শ বা জলপান করবে, সে কুণ্ডস্নানের ফল পেয়ে পুনর্জন্ম নেবে না। মুনির কাছে কুণ্ডের মহিমা শুনে রামচন্দ্র পাহাড়ের শিখরে উঠে এলেন। সেখানে শিবলিঙ্গ দর্শন করে নুনের সাগরে স্নান করেন। এরপর রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবী যাত্রা করেন গোদাবরীর উদ্দেশ্যে।

দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখেছিলেন ব্যাসদেব। ঐতিহাসিকদের মতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল খ্রীষ্ট পূর্ব ৯৫০ মতান্তরে ৩২০০-তে। ব্যাসদেব পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্যগন্ধার সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, আমি দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রশেখরে সবসময়েই বাস করতাম। সেখানে আমার মাথা জটাভারে বেষ্টিত, তার ওপর রয়েছে বিরাজিত ফণী, মাথায় শব শিরোভূষণ, কপালে অর্ধচন্দ্র। আমার মূর্তির বক্ষঃস্থল ভুজঙ্গবেষ্টিত, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম, এক হাতে ডমরু অন্য হাতে ত্রিশূল, গলায় বিলম্বিত ব্রহ্মসূত্র, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে জঙ্গলে আবৃত সীতাকুণ্ডের কাছে জনৈক রজক বসবাস করত। তার একপাল গাভী ছিল। একসময় লক্ষ্য করা গেল, একটি গাভী পাহাড়ের নীচের দিকে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে আসে গাভীদের দলে। একদিন অনুসরণ করার পর দেখা গেল, গাভীটি পাহাড়ের ওপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত একটি বিরাট শীলার ওপর দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গাভীর স্তন থেকে দুধ পড়ছে এবং ওই দুধে শিলাখণ্ডটি ভিজে যাচ্ছে। ওই রজক একদিন বিস্মিত হয়ে দেখল সেখানে রয়েছে অষ্টভূজা মূর্তির সঙ্গে একটি শিবলিঙ্গ। রজকের আহ্বানে কাছের গ্রাম

থেকে এক ব্রাহ্মণ নিয়মিতভাবে সেখানে পুজো শুরু করে। সেই থেকে ওই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা ওই তীর্থস্থানে পুজো করার অধিকারী হন।

তখন এই অঞ্চলটি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। একসময় এই সংবাদ পৌঁছায় ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্যের কাছে। তিনি ওই স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ রাজধানী আগরতলায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হল না। রাত্রিবেলা দেবাদিদেব ধন্যমানিক্যকে স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমায় স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। আমি স্বতোদ্ভূত। তোমার আগ্রহ থাকলে দেবীকে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা কর! কিন্তু রাত ভোর হবার আগেই তা করতে হবে। দেবীমূর্তিকে রাজধানী আগরতলায় নিয়ে যাবার জন্য সারিবদ্ধভাবে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পথের মধ্যে এক জায়গায় ভোর হয়ে গেল। সেখানে ভোরের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি অচলা হয়ে গেলেন। বাধ্য হয়েই সেখানেই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। জায়গাটির নাম দেওয়া হল উদয়পুর। ত্রিপুরার ইতিহাস অনুযায়ী জানা যায়, উদয়পুরে 'ত্রিপুরেশ্বরী'র বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয় ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে। 'রাজমালা' গ্রন্থ অনুসারে ৬১০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব গৌড়ের রাজা আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভর শূর জলযানে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নাবিকদের ভুলে জলযান ভুল করে নোয়াখালির ভুলুয়ায় পৌঁছে যায়। গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামী অনেকদিন এই তীর্থে বাস করেন। তখন বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন। জয়দেব তীর্থভ্রমণ শেষে লক্ষণ সেনের এই তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন। জয়দেবের 'পদ্মাবতী' বইয়ের বর্ণনায় আছে—

এইরূপে আছে কবি বঙ্গবাসী সনে
চট্টগ্রাম দেখিতে বাস না হইল মনে
রাজার নিকটে তাহা কৈল আবেদন
আদেশ করিলা রাজা করিতে গমন।

অবশেষে চন্দ্রনাথে করিল গমন
নিকটের দেবদেবী করিল দর্শন
ব্যাসকুণ্ড সন্নিকটে আশ্রম করিল
কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বালি আনন্দে রহিল।

শার্দুল ভল্লুক সর্প আদি জন্তুগণ
চারিদিকে বাস করে মৃগ অগণন
বৈরভাব শূন্য চন্দ্রনাথের আজ্ঞায়
মনুষ্য দেখিলে স্থান ছাড়িয়া পালায়।

কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) রঙ্গমতী (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যে সীতাকুণ্ড তীর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। তারই কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল :—

পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড! শোভিছে উত্তরে
কনক চম্পকারণ্য! সজ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারী বাড়বানল মানব বিস্ময়
পশ্চিমে নিরগ্নিকুণ্ড, ব্যাস সরোবর
বহিতেছে নিরন্তন পূর্বে কলে কল
কলকণ্ঠা মন্দাকিনী স্বর প্রবাহিনী।
পূণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড অপ্সরা প্রদেশ
জ্যোতির্ময় মনোহর! পরিপূর্ণ মরি
প্রকৃতির ইন্দ্রজালে, জলেতে অনল
অনল পাষাণে.............................

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে সীতাকুণ্ড মেলা অর্থাৎ চন্দ্রনাথ তীর্থের ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

কম্পানদীর দক্ষিণতীরে এক ক্রোশের মধ্যবর্তী জায়গায় তারা নদীর বাম দিকে সুন্দরী রাজরাজেশ্বরী, পূর্বদিকে ভুবনেশ্বরী, ঈশানে ভৈরবী, উত্তর দিকে ছিন্নমস্তা ও জলস্থিতা ধূমাবতী রয়েছেন। পশ্চিমদিকে আছেন বগলা, নৈঋত কোণে সর্বমঙ্গলা, দক্ষিণ দিকে তিন কোটি শক্তি সহ কমলা আছেন। সেখানে মৃত্যুঞ্জয়, পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক শিবের দর্শন পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের দেবী ভবানী সম্পর্কে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্র শেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী যত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।।

মহাপীঠ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড স্টেশনের কাছে চন্দ্রনাথ পাহাড়। সেখানে ভবানী মন্দিরের কাছেই আছে স্বয়ম্ভু নাথ শিবলিঙ্গ, আর এক পাহাড়ের ওপরে রয়েছে বিরূপাক্ষ শিবলিঙ্গ ও সর্বোচ্চ শিখরে আছেন ভৈরব চন্দ্রশেখর শিবলিঙ্গ। সমুদ্র থেকে শৈলশৃঙ্গ চন্দ্রনাথ প্রায় ১২০০ ফুট উঁচুতে।

ইতিহাস বিশ্রুত সীতাকুণ্ড এখন প্রায় লুপ্ত প্রায়। শুধু পাহাড়ের গুহায় এক নির্ঝরিণীর পাশে মন্দিরটি কোনমতে দাঁড়িয়ে, কুণ্ডটি যে একসময় এখানে ছিল, সে কথাই জানিয়ে দিচ্ছে।

এখানে আছে ব্যাসকুণ্ড। যদিও তা ছোট সরোবরে পরিণত হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান ও তর্পণ করেন। পশ্চিম পাড়ে ব্যাসদেব পাষাণমূর্তি হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। কুণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণে 'বটবৃক্ষ' যুগ যুগ ধরে এখানে রয়েছে। ব্যাসকুণ্ডের পাড়ে দ্বাপর যুগে ভগবান ব্যাসদেব মুনিদের নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কুণ্ডের কাছেই রয়েছে পীঠস্থান ভবানী মন্দির ও কালীবাড়ি।

ব্যাসকুণ্ড থেকে পূর্বদিকে পাহাড়ে কিছুটা উঠলেই ডানদিকে ভূগর্ভ থেকে ওঠা শিবের নেত্রানলরূপী জ্যোতির্ময় নীলশিখা দেখা যায়। দিবারাত্রি এই শিখা জ্বলছে। কাঠ দিলেই জ্বলে ওঠে। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা এখানে ঘি, বেলপাতা দিয়ে হোম করেন। জায়গাটি পুরোপুরি পাথর দিয়ে ঘেরা। নীচে কোনও ফুটো দেখা যায় না। এক জায়গা থেকেই আগুনের শিখা উঠতে থাকে। পাশের শিলাখণ্ডে আগুন শিখার কালোধোঁয়া জমে আছে।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের উত্তরে আছে লবণাক্ত কুণ্ড। এখানে অগ্নিদেব নীল জিভ বাড়িয়ে সর্বদা প্রজ্বলিত থাকেন। সকলের ধারণা, এখানে স্নান করলে মন পবিত্র হয়ে যায়। কারও কারও ধারণা, এখানে স্নান করলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়। লবণাক্তে স্নান তর্পণ করলে সূর্যকুণ্ডে অভিষেক করতে হয়। কাছেই উষ্ণ জলের ব্রহ্মকুণ্ড আছে। এর জল সবসময় উষ্ণগরম থাকে ও সমুদ্রের জলের মতো লবণাক্ত। এর কাছেই বাসিকুণ্ড নামে আর একটি কুণ্ড আছে। লবণাক্ত তীর্থের জল উপছে যে জায়গায় পড়ছে তাকেই বলা হয় বাসিকুণ্ড। তবে লবনাক্ত কুণ্ডের জল বেশি গরম নয়। এখানে তিল তর্পণ করার বিধি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাসিকুণ্ড ও লবণাক্ত কুণ্ড ছাড়া এখানকার সব জলাশয়ের জল মিষ্টি।

লবণাক্ত কুণ্ডের কাছেই সহস্রধারা তীর্থ নামে পূবদিকের পাহাড়ে এক আশ্চর্য জলপ্রপাত আছে। প্রায় দু'শো হাত উঁচু গিরিশৃঙ্গ থেকে ঝরনার জল প্রচণ্ড বেগে নীচে এসে পড়ছে। পাথরে বাধা পেয়ে সহস্রধারায় জল ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ছে। সেজন্য এই জায়গার নাম সহস্রধারা। এখানে তিন দিক থেকে পাহাড়ের স্রোত এখানে একত্রে মিলিত হচ্ছে। অনেকে এই জায়গাকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম নামে অভিহিত করেন। কোনও কোনও সময় এখানে জল পড়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন চিৎকার করে 'হর হর, ব্যোম্ ব্যোম্ মহাদেব' বলে চীৎকার করলেই ওপর থেকে অজস্র জলধারা নেমে আসে।

সীতাকুণ্ড স্টেশনের দক্ষিণের তিন মাইল দূরে বাড়বকুণ্ড স্টেশন। সেখান থেকে মাইল তিনেক পথ উত্তর দিকে গিয়ে আবার পূবদিকে এক মাইল দূরে রয়েছে বাড়বকুণ্ড। সামান্য উঁচুতে একটি মন্দিরের মধ্যে আছে বাড়বানলকুণ্ড। চারকোণা এই কুণ্ডটি দেখতে ডোবার মতো। তবে গভীরতা সম্পর্কে কোনও আন্দাজ করা যায় না। কারও কারও মতে, এই কুণ্ডের সঙ্গে পাতালের যোগ আছে। একটি মোটা লোহার চাদর কুণ্ডের জলের তিন হাত নীচে ঝোলানো আছে। কুণ্ডের পূবদিক থেকে একটি আগুনের শিখা জলের মধ্যেই অনবরত দপ দপ করে জ্বলছে। অথচ কুণ্ডের মধ্যে নেমে স্নান করার সময় আগুনের তাপ কিন্তু গায়ে লাগে না। স্নানরত মানুষদের গায়ের ওপর দিয়েই আগুনের শিখা চলে যায়। এখানে স্নান ছাড়াও তর্পণ, হোম, পুজো ও ভৈরবদর্শন করতে হয়। ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহের জমিদার রাজা যোগেশ কিশোর রায়চৌধুরি সাদা কালো মার্বেল পাথর দিয়ে মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

কাছেই রয়েছে অন্নপূর্ণা মন্দির ও কালভৈরব। পথেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে জ্বালামুখী কালীমূর্তির। এখানে নক্রেশ্বর শিব ধর্মাগ্নিরূপে শোভা পান।

বাড়বানলের দক্ষিণে পাহাড়ের নীচে কর্করী নদীর প্রান্তে আছে কুমারীকুণ্ড। মূর্তির উচ্চতা চার হাত। এর জলের ওপরে আগুনের শিখা একবার জ্বলে ওঠে আবার নিভে যায়।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি স্বচ্ছ জলধারা বয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ একে পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী আখ্যা দিয়েছেন। এই জলেই স্বয়ম্ভুনাথের পুজো, স্নান ও ভোগ রান্না হয়। স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরের পূবদিকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির আছে। এখান থেকে পূবদিকে সামান্য পথ গেলেই দেখা যাবে, মন্মথ নদের তীরে গয়াক্ষেত্র নামে একটি পিতৃতীর্থ রয়েছে। এখানে অনেকেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। ১৯০৬ সালে ময়মনসিংহের সন্তোষের রানী দিনমণি চৌধুরানীর ছেলে হেমেন্দ্রনাথ চৌধুরির তত্ত্বাবধানে এখানে একটি মন্দির তৈরি হয়।

এই গয়াক্ষেত্রের উত্তর দিকে অটধারা বিধৌত ছত্রশীলা পাহাড়ের গুহায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ দেখা যায়। তার ভিতর দিয়েই বয়ে যায় মন্দাকিনীর জলধারা। এই জায়গাটির নাম উন-কোটি শিব। চারদিক গাছপালায় ভরা। তাই গরমকালেও এখানে শীত শীত করে। উনকোটি শিব সমতল থেকে পনেরো কুড়ি হাত ওপরে রয়েছে। অতীতে নীচে থেকে যাত্রীদের অতি কষ্টে এই শিব দর্শন করতে হত। পুজো করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ময়মনসিংহের হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরির বোন বরদা সুন্দরী দেবী এখানে আটটি লোহার সিঁড়ি তৈরি করে দেন। পরে চট্টগ্রামের কোয়েপাড়া গ্রামের অখিল চন্দ্র বিদ্যারত্ন সেখানে বারোটি পাথরের সিঁড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

পাহাড়ের অনেক ওপরে রয়েছে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের নীচে অনেকটা পথ হাঁটার পর পাতালপুরীর সন্ধান পাওয়া যায়। চারদিক গাছপালা দিয়ে ঘেরা। কথিত আছে, এখানে শিব-দুর্গা গভীর আলাপনে রত থাকেন। এখানে কোনও পাখী ডাকে না, কোনও বন্যজন্তু আওয়াজ করে না। সকলের ধারণা, এখানে কেউ আওয়াজ করলে হরগৌরী আলাপনে ব্যাঘাত ঘটানো হবে। এখানে এক আসনে শিলাখণ্ডের ওপর দেবাদিদেব, মা দুর্গাকে নিয়ে বসে আছেন।

এই মন্দিরের দুটি দরজা অতিক্রম করলেই অষ্টমূর্তি সমন্বিত আদি স্বয়ম্ভুনাথের অপূর্ব লিঙ্গটির দর্শন পাওয়া যায়।

বিরূপাক্ষ মন্দির থেকে আরও উঁচুতে রয়েছেন পীঠভৈরব চন্দ্রনাথ। একসময় এখানে পৌঁছানো প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ওপরে ওঠার ভাল পথ ছিল না। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগর। এখানে যুগ যুগ ধরে অনেক সাধক তপস্যা করেছেন। পীঠের অধিপতি দেবী ভবানী হলেন চতুর্ভুজা মা কালী। মন্দিরের মধ্যে বেদীর ওপর তিনি অধিষ্ঠিতা। ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। এছাড়া পৌষ সংক্রান্তি, দোলপূর্ণিমা, শ্রীপঞ্চমী, কার্তিকী পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের সময় অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে আসেন।

শোনা যায়, বুদ্ধদেবের শরীরের অংশ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কোনও জায়গায় পুঁতে রাখা আছে। তারই স্মরণে, চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে বৌদ্ধদের মেলা বসে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি সহস্রধারার। এই শোভার ব্যাখ্যা করেছেন কবি নবীন চন্দ্র সেন। তিনি লিখেছেন,

ঝরিছে সহস্রধারা ধারা মনোহরা
উচ্চভীম শৃঙ্গ হতে সহস্র ধারায়
মরি যেন গিরিমূলে অনন্ত বরিষা।
আহা কি অপূর্ব দৃশ্য! আজি চতুর্দশী
আজি শিলাসনে বসি শুনিতে শুনিতে
কলকন্ঠে হুলুধবনি, ভীমকন্ঠে ঘোর
হর হর, বম্ বম্, বিরাম সময়
তরল সলিল, বন বিহঙ্গ সঙ্গীত।

কুর্করী নদীর ধারে কুমারী কুণ্ডের অপরূপ দৃশ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

কল্লোলে কুমারী কুণ্ড চারু নির্ঝরিনী
মধুর কুমারী কণ্ঠ তর তর তর
লইয়া কুর্করী নদী চলেছে সাগরে
চক্রে চক্রে শুনাইয়া ভুধর শৃঙ্খলে
নিরমল, সুশীতল সলিল সঙ্গীত।
সলজ্জকুমারী কুণ্ড আছে লুকাইয়া
নিবিড় অরণ্যময় পর্বত গহ্বরে
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ে শিব চতুর্দশী মেলার সময় বিশেষত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা এখানে আসেন। রাস্তার বাঁ দিকে কিছুদিন আগে গড়ে উঠেছে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। পাশেই রয়েছে 'গিরিশ ধর্মশালা'। সামনে আছে বিরাটকায় 'বৃন্দার মার দীঘি'। এরই ডানদিকে ১৯৯৮ সালে ননীগোপাল সাহার আর্থিক অনুদানে গড়ে উঠেছে 'এন জি সাহা তীর্থযাত্রী নিবাস'। 'বৃন্দার মার দীঘি'টি তৈরির ব্যবস্থা করেন ত্রিপুরার মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ এই চন্দ্রনাথ তীর্থে তাঁর বৃদ্ধা মাকে নিয়ে এসেছিলেন। এখানকার অন্যতম দর্শনীয় জায়গা হল 'শংকর মঠ'। এই মঠের সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃত কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, ব্রহ্মকুণ্ড। সামান্য দূরত্বে আছে 'নারায়ণ ছত্র'।

সড়ক বা রেলপথে এই মাতৃতীর্থে মোট চারটি পথে আসা যায়। প্রধান পথটি হচ্ছে, সীতাকুণ্ড রেল স্টেশন। এছাড়াও রয়েছে বাড়বকুণ্ড রেল স্টেশন, কুমিরা রেল স্টেশন। সীতাকুণ্ডের কাছে সহস্রধারা, লবণাক্ত কুণ্ডের পাহাড়ী পথ ধরে বিভিন্ন মঠ-মন্দির দর্শন করতে হয়। তবে বর্তমানে অনেকগুলি পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক জায়গাই পাহাড়ী পথ দিয়ে হেঁটে যেতে হয়।

চন্দ্রনাথ মন্দিরটি প্রথম তৈরি করান ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মানিক্য। ১৮৮৫ সালে মন্দিরটি ধবংস হয়ে গেলে তা আবার তৈরি করান সারোয়াতলী গ্রামের জমিদার রামসুন্দর

সেন। অনেক পরে মন্দিরের সংস্কার করান ময়মনসিংহের জমিদার রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি।

চন্দ্রনাথ ও বিরূপাক্ষ মন্দিরে ওঠা খুবই দুরূহ ব্যাপার। একসময় পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদার রামহরি বিশ্বাসের মা এখানে এসে ওপরে উঠতে পারেন নি। মায়ের নির্দেশে রামহরি ওরফে গঙ্গারাম বিশ্বাস আনুমানিক ১২৭০ বঙ্গাব্দে ওই পথে সাতশ বিরাশিটি সিঁড়ি তৈরি করান। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে চব্বিশ পরগনার জমিদার সূর্যকান্ত রায় চৌধুরি ওই সিঁড়িগুলির সংস্কার করান। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ঢাকার ইনাম গ্রামের গোপাল চন্দ্র সাহা ও মধুসূদন সাহা (দুই ভাই) চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এক মাইল পথে সিঁড়ি তৈরি করান। এছাড়াও চন্দ্রনাথ মন্দিরের ওঠার কিছু অংশে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে পাথরের ধাপ তৈরি করিয়ে দেন বাংলাদেশের পাবনা জেলার 'স্থল' গ্রামের অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী বসন্তকুমারী দেবী। তাঁদের উদ্যোগে উনিশটি পাথরের ধাপ তৈরি হয়।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরের দিকে বটগাছের তলায় যাওয়া আক্ষরিক অর্থে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান রাজা বিজয় চন্দ্র মহাতাব কিছু সিঁড়ি তৈরি করিয়ে দেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহের গোলকপুরের জমিদার উপেন্দ্রলাল চৌধুরির স্ত্রী যোগমায়া দেবী চৌধুরানী চন্দ্রনাথ মন্দিরের নাট মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন।

স্বয়ম্ভুনাথ মন্দিরে ওঠার পথে বাঁ পাশে আছে মা ভবানীর মন্দির। পুরাণে বলা হয়েছে, দেবাদিদেব চন্দ্রনাথে দেবী ভবানীর সঙ্গে অধিষ্ঠান করবেন। আগেই উল্লেখ আছে, মা ভবানী এখানে কালী মূর্তিতে বিরাজ করছেন। প্রতিদিন এখানে মায়ের পুজো, ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহের জমিদার বিন্দুবাসিনী চৌধুরানী টিনের চৌচালা ঘর তৈরির ব্যবস্থা করে মন্দিরের সংস্কার করান এবং একই সঙ্গে স্বয়ম্ভুনাথের পাথরের বেদীটি রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তাগাছার জমিদার বিদ্যাময়ী দেবী চৌধুরানী স্বয়ম্ভূনাথ মন্দিরের মেঝে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। ১৯০৩ সালে রংপুরের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ সেন এই মন্দিরের ভোগঘরটি তৈরি করান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার শিয়ারশোলের রাজা প্রমথ নাগ মালিয়া শম্ভুনাথ মন্দিরে যাওয়ার আটষট্টি সিঁড়ি তৈরির ব্যবস্থা করেন।

ভবানী মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দুলাল কান্তি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলকাতার বেহালার বাসিন্দা ঁগোবিন্দ চরণ বারিকের ছেলে হীরালাল দাস বারিক তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে মন্দিরের পাকা অংশটি তৈরির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছেন। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার গিরিলাল মোদী তাঁর বাবার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মূলত মন্দিরের বারান্দা ও কোলাপসিবল দরজা তৈরি করিয়ে দেন। শ্রীভট্টাচার্য আরও জানান, ভবানী মন্দিরের পাশেই রয়েছে জ্যোতির্ময় ও স্বয়ম্ভূনাথ মন্দির। সতীর দেহখণ্ড যেখানে পড়েছিল তার পাশেই এই মন্দিরের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

চন্দ্রনাথ মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দেবাশিস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এখানে নিত্য পুজো

হয় এবং শিব চতুর্দশীর দিন মহাসমারোহে এখানে হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে পুজো হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এই মন্দির পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। একশ পঁয়তাল্লিশ জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সুবাস চন্দ্র লালা ও সুকুমার চক্রবর্তী।

প্রাথমিকভাবে চন্দ্রনাথ ধামের অধীনে ৮০ দ্রোন (১ দ্রোন = ১২.৫০ একর) সম্পত্তি থাকলেও বর্তমানে মাত্র ২.৫০ দ্রোন সম্পত্তি মন্দির কমিটির দখলে আছে। মূলত পুকুর, গাছ ও জমি থেকে যে আয় তা মন্দিরের আয়ের উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শিব চতুর্দশীর দিন হাজার হাজার ভক্ত যে প্রণামী দেন তা থেকেও প্রচুর টাকা আয় হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চন্দ্রনাথ ও ভবানী মন্দির ছাড়াও এখানকার সাত-আটটি মন্দিরে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীচট্টেশ্বরী কালী মায়ের মন্দিরের অবস্থান

প্রাচীন চকবাজারে গুলজার সিনেমার সামনের মোড়, যে'টি পশ্চিমদিকে সোজা চলে এসেছে কাজির দেউড়ি সার্কিট হাউজ মোড় পর্যন্ত। এই রাস্তাকেই বলা হয় চট্টেশ্বরী রোড। মেহেদিবাগ হয়ে ওয়াসার মোড় হয়ে কাজির দেউড়ির মোড় হয়ে যে কোনও সুবিধাজনক পথে চট্টেশ্বরী কালীবাড়িতে আসা যায়।

সপ্তম ও অষ্টম শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে নানা অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে। কমতে থাকে ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করার মতো মানুষের। এ-হেন পরিস্থিতি তখন শঙ্করাচার্যকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্ন্যাস তৈরির জন্য বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই সুবাদেই তিনি ভারতবর্ষে চারটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শোনা যায়। সর্বভারতীয় সন্ন্যাসীরা পদাধিকার বলে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড চন্দ্রনাথ জাতীয় তীর্থ, মহেষখালির আদিনাথ তীর্থ ও ফটিক ছড়ির কাঞ্চ ননাথ তীর্থসহ অন্যান্য তীর্থ মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ হয়ে ধর্মীয় কাজ পরিচালনা করতেন। সীতাকুণ্ডের জাতীয় তীর্থ, মহেষখালির আদিনাথ তীর্থ ও ফটিকছড়ির কাঞ্চননাথ তীর্থের সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে যোগসূত্র রয়েছে চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টেশ্বরী কালী মায়ের মন্দিরের সঙ্গে। এই তথ্য জানা গেছে, সীতাকুণ্ড শ্রাইন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী সুখময় চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, ভারতে তীর্থ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন বাংলাদেশের উপরে উল্লিখিত তীর্থস্থানগুলিতে না গেলে তীর্থ পরিপূর্ণ হয় না।

প্রাচীনকালে মোহন্তরা ছিলেন নাগা সন্ন্যাসী। তাঁরা খুবই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, এরা এক একসময় বাঘের পিঠে চড়েও যাতায়াত করতেন। চট্টেশ্বরী কালী মন্দির তৈরির আগে নাগা সন্ন্যাসীরা এখানে ধূনী তথা যজ্ঞের বড় বড় কাঠ জ্বালিয়ে হোম যজ্ঞ করতেন নিমগাছের তলায়।

চট্টেশ্বরী কালীমায়ের মন্দিরের প্রথম কালী মূর্তির ব্যাপারে নানান কিংবদন্তী শোনা যায়। তথ্যভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এখানে প্রথম নিমকাঠের কালিমূর্তি তৈরি করেছিলেন

উত্তরবঙ্গে জয়ন্তী পীঠ

পুরাণ এবং তন্ত্রের মূল কথা হল, যিনি শিব তিনিই শক্তি। অর্থাৎ যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। শিব ছাড়া যেমন শক্তির কোনও অস্তিত্ব নেই, অন্যদিকে শক্তি ছাড়া শিব অসম্পূর্ণ। তাই প্রতিটি শক্তি পীঠেই শিব এবং শক্তি একই সঙ্গে বিরাজমান। পীঠ নির্ণয়ের মতে, একুশতম শক্তিপীঠ জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে। সেখানে বলা আছে,

'জয়ন্তাং বাম জঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বর ঃ বাংলা ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে পড়েছে সতীর বাম জঙ্ঘা। দেবীর নাম জয়ন্তী এবং ভৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর তথা মহাকাল।

অন্দদামঙ্গল-এর রচয়িতা লিখেছেন,

জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিল কেশব।

জয়ন্তী দেবতা, ক্রমদীশ্বর ভৈরব।।

'তন্ত্রচূড়ামণি' এবং 'শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী'র পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে,

'..... কালেশ্বরং মহাপীঠং মহাপীঠং জয়ন্তিকাম্'।

শাস্ত্রমতে, এখানে দেবীর বামজঙ্ঘা পড়েছে।

প্রশ্ন ওঠে, কোথায় এই পীঠের অবস্থান। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের ধারণা, জয়ন্তী পীঠ রয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাস একান্ন পীঠের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে উল্লেখ আছে, খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে জয়ন্তিয়া পরগনায় রয়েছে এই শক্তিপীঠ। অসমের জনৈক ঐতিহাসিক গেইট-এর লেখা বইতে উল্লেখ আছে, সতীর বাঁ পায়ের নিম্নাংশ পড়েছিল জয়ন্তিয়া পরগণার ফাজলুরে। কথিত আছে, দুর্গাপুজোর মহানবমীর দিন এখানে নরবলি হত। রাজা ও প্রজা উভয়েই এই নরবলির আয়োজন করতেন। পুত্র সন্তান হলে রাজা নরবলির ব্যবস্থা করতেন।

অন্যদিকে প্রজারা তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে এই প্রক্রিয়ার আয়োজন করতেন। আরও কথিত আছে, বলি হবার জন্য মানুষেরা নাকি নিজেরাই স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হতেন। তবে কোনও কোনও সময় বলি'র জন্য মানুষ চুরি করাও হোত।

তবে অধিকাংশের মত হল, জয়ন্তী পীঠ হল জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান সীমান্তে। আলিপুর দুয়ারের কাছে জয়ন্তী নদীর তীরে মহাকাল পর্বতে এই জায়গাটি আছে।

এই ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জায়গাটি এতই দুর্গম যে একমাত্র শিবরাত্রির সময় ছাড়া বছরের অন্য কোনও সময় সেখানে যাবার উপায় নেই। কারণ, জয়ন্তী নদীর চারিদিকে রয়েছে পাহাড় ও জঙ্গল। শুকনো নদী, কিন্তু বর্ষার সময় তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এমনকি কোনও কোনও বছর বৈশাখ থেকে কার্তিক মাস পুরো জায়গাটিতে যাবার সুযোগই থাকে না। নদীর ধার দিয়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার হাঁটলে এই পাহাড়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। সমগ্র এলাকায় জনবসতি না থাকায় নদীর পাড় দিয়ে কোনদিকে মহাকাল মন্দির তথা জয়ন্তী পীঠ, তা জানা খুবই দুষ্কর হয়ে যায়। তবে ইদানীংকালে সেখানে একটি থাকার জায়গা তৈরি হয়েছে তা খুবই দামী।

সেখানে যাওয়ার জন্য দিনে একটিমাত্র বাস সকাল সাতটার সময় ছাড়ে। আবার বিকেল চারটের সময় ফিরে আসে। এছাড়া অটোয় চড়ে যাওয়া যায়। আসা যাওয়ার জন্য ভাড়া হিসেবে ছ'শ টাকা নেয়। বাস বা অটো যায় জয়ন্তী নদীর তীর পর্যন্ত। শিবরাত্রির দু'দিন পরে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম, শিবরাত্রির সময় সেখানে মেলা বসে। কিন্তু সেদিন গিয়ে মেলার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি।

পথে পেয়ে গেলাম একটি বালি সংগ্রহকারী লরী। প্রায় তিন কিলোমিটার লরীতে করে গিয়ে পৌঁছালাম। চারিদিকে অপূর্ব পরিবেশ। অনেকটা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মতো। একই পাহাড়ী নদীকে বারবার পার হতে হয়। একসময় এলাম মহাকাল পাহাড়ের নীচে। সেখানে ঝর্ণা হয়ে নেমে আসছে নদী। সেখানে স্নান করা যায়। পাহাড়ে ওঠার জন্য লোহার সরু মই করা আছে। মই দিয়ে ওঠার পর এক জায়গায় সম্মুখীন হলাম খাড়াই জঙ্গলের। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার একটি লোহার মই রয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, অত্যন্ত কঠিন সেই যাত্রাপথ।

একসময় এসে পৌঁছালাম মনোরম পরিবেশে। মূল গর্ভমন্দিরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। অন্ধকার, শুধু সেখানে একটি প্রদীপের আলো জ্বলছে। একটি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী দর্শনার্থীদের পুজো করাচ্ছেন। কিছুদিন আগে একটি প্রথম সারির কাগজে বেরিয়েছিল, ওই তান্ত্রিক দণ্ডী কাটতে কাটতে মহাকাল মন্দির থেকে কামাখ্যা মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এটাই জয়ন্তী শক্তিপীঠ। দেবীর বাম নিম্নাঙ্গ যখন পড়েছিল তখন মহাকাল সেই প্রবল চাপ ধরে রেখেছিলেন। সেইজন্য সেখানে মহাকালের মান্যতা বেশি। সেই সন্ন্যাসীই বলেছিলেন বাংলাদেশে নয়, এখানেই পড়েছে সতীর বামজঙ্ঘা। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। চিতাবাঘ ও ভাল্লুকের প্রভৃত উপদ্রব প্রায়শই হয়ে থাকে। তাই দলবদ্ধভাবে সেখানে যাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী তথা পূজারী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেখান থেকে নেমে আসেন, আবার ফিরে যান মাঘ মাসে। পুজোর সামগ্রী নিয়ে আসতে হয় শহর থেকে। গুহাটাই মন্দির। পাশাপাশি রয়েছেন মহাকাল ও সতী।

যে সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১) সতীপীঠ পরিক্রমা— শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
২) মরুতীর্থ হিংলাজ— শ্রীকালিকানন্দ অবধূত
৩) শ্রী রাজমালা— শ্রীকালিপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
৪) কালীক্ষেত্র দীপিকা— শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫) কালীঘাট পুরাণ— শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়
৬) রাঢ়ের ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা— শ্রীসনৎকুমার চক্রবর্তী
৭) দেবী নন্দিকেশ্বরী উপাখ্যান ও বীরভূমের সতীপীঠ— শ্রীবিজয়কুমার দাস
৮) কঙ্কালী পীঠের কথা— শ্রীসাম্য মুখোপাধ্যায়
৯) বেদগর্ভা কঙ্কালী— শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য্য।

হিমাচলে চিন্তাপূর্ণী দেবী

গাড়োয়াল হিমালয় ও সংলগ্ন অঞ্চলে এই দেবীকে সবাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মান্য করেন। জ্বালামুখী ও কাংড়ার খুব কাছেই চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দির। কাংড়া থেকে চিন্তাপূর্ণীর দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। জ্বালামুখী থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। এখানে সতীর ডানপায়ের কিছু অংশ পড়েছে। শোনা যায়, সতী এখানে ছিন্নমস্তা হয়ে তাঁর দশমহাবিদ্যারূপ মহাদেবকে দেখিয়েছিলেন।

জ্বালামুখী বাস স্ট্যান্ড থেকে এক ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে চিন্তাপূর্ণীর উদ্দেশ্যে। পথের দূরত্ব খুব বেশি নয়। ভাড়া ২৫ টাকা। চিন্তাপূর্ণীর উচ্চতা ৩৯০০ ফুট। মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে ছোট্ট জনপদ। অন্যান্য ধর্মস্থানের মতো এখানেও রয়েছে দোকানপাট, ধর্মশালা। বাস স্ট্যান্ডের পিছন দিক দিয়েই মন্দিরে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের অবস্থান। প্রায় ১ কিলোমিটারের মতো পাহাড়ী পথ ভেঙে দেবীস্থানে পৌঁছতে হয়। পথের দু'পাশে অজস্র হোটেল, লজ আছে। জ্বালামুখীর চেয়েও অনেক বেশি ভক্ত এখানে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানানোর জন্য সমবেত হন।

উনা জেলার অন্তর্গত এই চিন্তাপূর্ণী মন্দির। প্রতি বছর বাসন্তী ও শারদ নবরাত্রে এখানে প্রচুর যাত্রী সমাগম হয়। বিশাল আকারের মেলা বসে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে।

পাহাড়ের মাথায় অনেকখানি প্রশস্ত ও ঘেরা জায়গার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন কল্পবৃক্ষকে কেন্দ্র করে মন্দিরের অবস্থান। দেবী এখানে ছিন্নমস্তা। এখানেই সতী নিজের খড়্গাঘাতে মাথা ছিন্ন করে মহাদেবকে মহাশক্তি দেখিয়েছিলেন। দেবী এখানে পিণ্ডিরূপা।

সুন্দর ছোট্ট মন্দির। এখানে সব সময়ই ভীড় লেগে থাকে। ভক্তদের দানে দেবীর মাথায় রয়েছে সোনা রুপোর বেশ কয়েকটি ছোট-বড়ো ছাতা। কথিত আছে, চিন্তাপূর্ণী মা সকলেরই চিন্তা দূর করেন। দেবীর কাছে মানত করলে কেউ ব্যর্থ হয় না। মন্দিরের গা থেকে চূড়া পর্যন্ত সবটাই সোনা দিয়ে মোড়া।

মন্দিরের একদিকে রয়েছে ধৌলাধারের মতো তুষারাবৃত পাহাড়। কল্পবৃক্ষকে ঘিরেও হাজারো মানুষের উন্মাদনা। গাছটির এখন আর অস্তিত্ব নেই। অবশিষ্ট রয়েছে গাছের গুঁড়ি। তার গা থেকে যে সব ডালপালা বেরিয়েছে তাতেই কামনা পূরণের আশায় সকলে মহা উৎসাহে চুনরি বাঁধে। তাই এই বটগাছের নিচের অংশ লাল হয়ে গেছে। একই সঙ্গে এখানে জ্বালা হয় প্রদীপ ও ধূপ।

অনেকদিন আগে মাইদাস নামে দেবী চণ্ডীর এক পরম ভক্ত এই স্থানটি আবিষ্কার করেন। মাইদাসের বাবা ছিলেন আঠারোনামী গ্রামের (রিয়াসত পাতিয়ালা) এক ব্যবসায়ী। তাঁর তিন ছেলে—দেবীদাস, দুর্গাদাস ও মাইদাস।

মাইদাস সবসময় দেবী চণ্ডীর পুজো ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নিজেদের পারিবারিক ব্যবসার দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র মন ছিল না। তাই দাদারা মাইদাসের প্রতি বিরূপই ছিলেন। একসময় তাঁরা ছোট ভাইকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। মাইদাস তাঁর জন্য দুঃখ তো পেলেনই না, বরং আরও গভীরভাবে দেবীর আরাধনায় মগ্ন হলেন। একদিন কাজের জন্য পাহাড়ের ঘন জঙ্গলপথের মধ্যে দিয়ে যাবার জন্য পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একটি বড়ো বটগাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বসলেন। সেই জায়গাটির নাম ছপরোহ। বসামাত্রই ক্লান্ত মাইদাসের চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন এক দিব্যজ্যোতিসম্পন্না কন্যা তাঁকে বলছেন, 'ভক্ত মাইদাস, তুমি এখান থেকেই আমার আরাধনা করো। এতেই তোমার মঙ্গল হবে।'

ঘুম ভাঙার পর তিনি চারপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি সেখান থেকে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আবার ফিরে যাবার সময় সেই জায়গাতেই এলেন। সেই বটগাছের নীচে বসে ভাবতে লাগলেন, কে তাকে স্বপ্নের মধ্যে এই নির্দেশ দিল। এইভাবে অহোরাত্র স্তুতি করতে করতে মাইদাস দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবী ভগবতী। মুহূর্তের মধ্যে মূর্চ্ছা গেলেন তিনি। দেবীর কৃপায় মূর্চ্ছাভঙ্গ হবার দেবী মাইদাসকে বললেন, 'ভক্ত মাইদাস! এই বটগাছের তলায় আমি অনন্তকাল ধরে আছি। আমি এখানে দাঁড়িয়েই পুরাকালে মহাদেবকে আমার ছিন্নমস্তা রূপ দেখিয়েছিলাম। তুমি আমার পরম ভক্ত। তাই এই ঘোর অরণ্যে বসে তোমাকে আমার আরাধনা করার আদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে কৃপা করব। আমি ছিন্নমস্তা হলেও মানুষের চিন্তা দূর করার জন্য চিন্তাপূর্ণী নামেই প্রসিদ্ধ হব'।

নতমস্তকে মাইদাস বললেন, 'এই ভয়ানক জঙ্গলে আমি একা থাকব কী করে? এখানে না আছে জল, না আছে খাবার, না আছে থাকার মতো আশ্রয়'। এখানে দিনের বেলাতেও ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। রাতে তো আরোই ভয়ঙ্কর অবস্থা'।

দেবী বললেন, 'আমার মায়ার প্রভাবে তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাকতে পারবে। আমার বাহন সিংহ সবসময় তোমায় রক্ষা করবে। "ওঁ এং ক্লীং হ্রিং শ্রী ভয়নাশিনী হুং হুং ফট স্বাহা"—এই মন্ত্র জপ করলে সমস্ত ভয় এবং বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। আর "ওঁ এং ক্লীং হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে"—এই মন্ত্রে পুজো করলেই আমি তুষ্ট হব। এই জায়গা থেকে একটু নিচে একটা বড় পাথর দেখতে পাবে। সেই পাথর সরালেই পানীয় জল পাবে। ওই জলেই আমার পুজো ও তোমার তৃষ্ণা দূর হবে। পরে আমি কোনও ভক্তের চিন্তা দূর করলে সেই আমার মন্দির গড়ে দেবে। সেই মন্দিরে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। ভক্তদের সেবা, পুজো ও দানেই তোমার সংসার চলবে। তোমার বংশধরেরাই পরবর্তীতে

আমার পুজোর অধিকারী হবে।' এই কথাগুলি বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাইদাস দেবীর নির্দেশমতো পাহাড়ের কিছুটা নিচে নামতেই একটি বড় পাথর দেখতে পেলেন। দেবীকে স্মরণ করে সেই পাথর একটু ঠেলা দিতেই তা সরে গেল। দেখা গেল, সেখানে বইছে নির্মল জলধারা। চরণামৃত জ্ঞানে তিনি সেই জল পান করলেন। তারপর সেখানেই কুটির তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। একই সঙ্গে সেই জলে দেবীর অভিষেক করে আরও বেশি করে আরাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি যে পাথরের তলা থেকে জলের সন্ধান পেয়েছিলেন তা পরে চিন্তাপূর্ণী মন্দিরে নিয়ে এসে পুজো করা হয়। ২০০টি সিঁড়ি নীচে নেমে এসে এই জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই জলেই আজও দেবীর অভিষেক হয়।

শিবালিক পাহাড়ে নয়নাদেবী

নয়নাদেবী জায়গাটি সমুদ্রতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের ওপর বাস স্ট্যান্ডে রয়েছে অনেক দোকানপত্তর। এখান থেকে মন্দিরের দূরত্ব আছে। একটি খাঁড়াই শৃঙ্গ উঠে গেছে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে। মন্দিরে পৌঁছানোর জন্য সম্প্রতি একটি রোপওয়ে তৈরি করা হয়েছে। ওঠার জন্য ৭৬১টি সিঁড়ি আছে। পথের দূরত্ব দু'কিলোমিটার। শিবালিক পাহাড়ের এই উঁচু জায়গাটিতে রয়েছে মনোরম পরিবেশ।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে সব মিলিয়ে সাড়ে বারো যোজন এই তীর্থের সীমানা। শোনা যায়, নয়নাদেবী দেবী চণ্ডীর রূপ ধারণ করে এখানে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরের নাম কেন মহিষাসুর হল তা নিয়েও কাহিনী প্রচলিত আছে।

পুরাকালে দৈত্যকুলে রম্ভ ও করম্ভ নামে দু'জন মহাপরাক্রমশালী অসুর ছিল। তারা দু'জনে সহোদর, কিন্তু তাদের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। সেই জন্য পুত্র সন্তান লাভের আশায় দু'জনে কঠোর তপস্যা শুরু করে। একজন পঞ্চনদতীর্থে জলের তলায় বসে তপস্যা শুরু করল। আর একজন তপস্যা শুরু করল প্রজ্জ্বলিত আগুনের মধ্যে। তাদের তপস্যার ধরন ও অগ্রগতি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তাঁর ধারণা হল, তপস্যার বলে তারা স্বর্গের আসন দখল করে নেবে। তিনি হাঙরের রূপ ধরে, পঞ্চনদতীর্থে পৌঁছে করম্ভকে বধ করলেন। ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন রম্ভ। আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবার সময় অগ্নিদেব স্বয়ং তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'মূর্খ দানব! আত্মহত্যা করলে কি তুমি পুত্র সন্তান লাভ করবে? পক্ষান্তরে এভাবে মৃত্যু হলে তোমার অনন্ত নরকবাস নিশ্চিত। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার বরে, তোমার এক মহা বলবান পুত্রলাভ হবে। তাই আর তপস্যার প্রয়োজন নেই। এখন আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করো।'

বর পেয়ে আনন্দিত হয়ে সে ঘরে ফিরে চলল। ফেরার সময় যক্ষদেশে এক বলবতী মহিষীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে তার সঙ্গে মিলিত হল। মহিষীর গর্ভজাত সন্তান বলেই তার নাম দেওয়া হল মহিষাসুর। নয়নাদেবী শৃঙ্গের দু'যোজন দূরে মহিষাসুরের রাজ্য ছিল, যা পরিচিত ছিল মহিষপুরী নামে। এই জায়গাটি পরবর্তী সময়ে মাখোপল

নামে পরিচিত হয়, বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুর বিলাসপুর নরেশের কাছে থেকে পাওয়ার জন্য এখানে দুর্গ তৈরি করে নাম দেন আনন্দগড়। এই আনন্দগড়ই বর্তমানে আনন্দপুর সাহিব নামে পরিচিত।

নয়নাদেবীর মন্দিরের চারদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেবী দর্শনের জন্য রেলিং-এর ব্যবস্থা করা আছে। শোনা যায়, নয়নাদেবীর পুরনো মন্দির অনেকদিন আগে বৌদ্ধযুগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বারোশো বছর আগে মধ্যপ্রদেশের চান্দেরি নগরের রাজা বীরচন্দ্র নতুন মন্দিরটি তৈরি করান। এই জায়গায় তিনি স্থাপন করেন কোহেনুর (অন্য নাম কহলুর) রাজ্য। বিধর্মীরা এখানে কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

এখানেও দেবী প্রকট রয়েছেন পিণ্ডিরূপে। মূল মন্দিরের কাছেই রয়েছেন ক্ষেত্রপাল ভৈরব। রয়েছেন গণপতি ও হনুমানজী। আরও রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্বেতবটুক। মন্দির থেকে সামান্য দূরে রয়েছে একটি অতিপ্রাচীন পিপল গাছ। অনন্তকাল ধরে এখানেই আছে ব্রহ্মপিণ্ডি বা শিলা। এখানে মস্তক মুণ্ডন, শ্রাদ্ধশান্তি সব কিছুই হয়।

সতীর দু'টি চোখ-ই এখানে পড়েছে বলে এখানে দেবীর নাম নয়না। নামকরণের আর একটি কারণ হল, স্থানীয় গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রায়ই 'জয় নয়নে, জয় নয়নে' ধ্বনি শোনা যেত। তৃতীয়ত, এখানকার পাহাড়ী অঞ্চলে গুর্জররা বাস করত। নৈনা নামে জনৈক গুর্জর ছিলেন দেবীর পরম ভক্ত। তিনি তাঁর গোরু, ছাগল প্রায়ই এখানে চরানোর জন্য নিয়ে আসতেন। এখন যেখানে পিপল গাছটি আছে, ঠিক সেখানে এসে নৈনার একটি গাভী দাঁড়িয়ে পড়ত। আর তখনই আপনা হতেই তার বৃন্ত থেকে দুধ ঝরে পড়ত। রোজ একই ঘটনা লক্ষ্য করে একদিন সেখানকার ঝরাপাতা সরিয়ে নৈনা দেখলেন, সেখানে মা ভগবতী পিণ্ডিরূপে বিরাজ করছেন। সেই রাতেই দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বললেন, আমি আদিশক্তি দুর্গা। এই জায়গাতেই আমি বিরাজ করছি। তুই এখানে আমার স্থান তৈরি করে দে। তোর নামেই এই জায়গা প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

মন্দির থেকে কিছুটা দূরে ব্রহ্ম সরোবর নামে একটি সরোবর আছে। মহিষাসুরকে বধ করার পর দেবী অসুরের কপাল ফাটিয়ে ব্রহ্মাকে দেন। ব্রহ্মা তা স্থাপন করেন বলে এই জায়গার নাম হল ব্রহ্মাকপালী। বিচিত্র ঘটনা হল, এই এলাকায় সিংহের কোনও অস্তিত্ব নেই কিন্তু মাঝে মাঝে গভীর রাতে নাকি এখানে তার গর্জন শোনা যায়।

কথিত আছে, নয়নাদেবীর চরণ থেকে বের হয়ে একটি জলের ধারা চরণগঙ্গা নামে আনন্দপুর সাহিবের উত্তরে শতদ্রু (সতলুজ) নদীতে মিশেছে। এখানে সারা বছরই যাত্রী সমাগম হয়। চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে 'জয় নয়না' ধ্বনিতে। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, স্থানীয় হবনকুণ্ডে আদিকাল থেকে যত হোম হয়েছে তার ভস্মরাশি কখনও বাইরে নিক্ষেপ করতে হয়নি। আস্তে আস্তে সবই কুণ্ডের মধ্যে মিশে গেছে।

মূল মন্দিরের চারটি দরজা আছে। বারো ক্রোশ দূরে দক্ষিণদিকে যে পাহাড় চোখে পড়ে যা 'জটাধর মহাদেব' নামে পরিচিত। উত্তরদিকে আর একটি পাহাড়ে ব্যোমগঙ্গা

রয়েছেন। জায়গাটি ‘বছরেট্ট’ নামে খ্যাত। এটিই নাকি দেবরাজ ইন্দ্রের তপস্যাক্ষেত্র। কেউ কেউ এই জায়গাকে ‘বরমোতী নামেও ডাকেন। বলা হয়, এখানে স্নান করলে সর্বরোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্বদিকের পাহাড়ে মা মহাকালীর অবস্থান। পশ্চিম দিকে ব্রহ্মাবতী দ্বার। শতদ্রু নদীর তীরে এক মনোরম জায়গায় ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র। মন্দির থেকে এর দূরত্ব প্রায় সওয়া যোজন।

মন্দিরের পিছনদিকে প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দূরত্বে দু'টি ঝরনা আছে। নাম ‘বম্ব কি বাউরি’। কথিত আছে, মহিষাসুরকে বধ করে দেবী ত্রিশূল দিয়ে তার দু'টি চোখ উপড়ে এখানে নিক্ষেপ করেন। তাই মহিষাসুরের চোখের জল ঝরনাধারা হয়ে নাকি আজও অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে। শুধু মহিষাসুর নয়, তার সঙ্গীসাথীদের এক-একজনের মুণ্ডু ছিঁড়ে দেবী যে জায়গাগুলিতে নিক্ষেপ করেন, সেগুলিই এখন কুণ্ড, বা, শিলাপিণ্ড রূপে বিরাজ করছে।

উত্তরপ্রদেশে শাকম্ভরী দেবী

শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে উত্তরপ্রদেশের সাহারণপুরের উত্তরে ঝরনার তীরে আছে 'শাকম্ভরী শক্তিপীঠ'। বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হওয়ার পরে দেবীর 'মাথা' এখানে পড়ে বলে কথিত আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখ আছে, "মধ্যমচরিতস্য বিষ্ণুঋষি-মহালক্ষ্ম ী-দেবতা, উষ্ণিক্ ছন্দঃ, শাকম্ভরী শক্তি-দুর্গাবীজং, বায়ুস্তত্ত্বং, মহালক্ষ্মী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ'। এখানে থাকার জন্য সবরকমের সুবিধাযুক্ত আশ্রম বা ধর্মশালা আছে। একটি ছোট পাহাড়ে ছিন্নমস্তার মন্দির। আর একটি পাহাড়ের পাদদেশে সামান্য উঁচু জায়গায় শাকম্ভরী শক্তিপীঠ। শোনা যায়, এই পীঠে যে শুধুমাত্র সতীপীঠ তাই নয়, এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা সবসময় বিরাজ করেন।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, 'পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা নামে, গয়াক্ষেত্রে চতুর্মুখ নামে, কাবেরী তটে সৃষ্টিকর্তা নামে এবং শাকম্ভরীতে রসপ্রিয় নামে তিনি বিদ্যমান'।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থকাণ্ডে বলা হয়েছে, 'এই তীর্থ ত্রিলোক বিখ্যাত'।

সেখানে উল্লেখ আছে,

'ততঃ শাকম্ভরী রীত্যৈব ত্যৈব নাম তস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম।
শাকম্ভরী সমাখ্যাতা ব্রহ্মচারিণী সমাহিত'।।

ইন্দ্রাণী স্তোত্রে বলা আছে,

'ইন্দ্রাক্ষী নাম সা দেবী দেবতে সমুদাহৃতা।
গৌরী শাকম্ভরী দেবী দুর্গানাম্নী তিবিশ্রুতা'।।

ভক্তদের বিশ্বাস, শিশুর গ্রহ দোষ লাগলে এই দেবীর সারণীলাভে শিশু গ্রহমুক্ত হয়। চাকরিক্ষেত্রে বা রাজদ্বারে কোথাও শত্রুরা বাধা দিলে বা বিরোধিতা করলে দেবীর কৃপায় তা দূর হয়ে যায়।

দেবী মাহাত্ম্যে আছে,

'শান্ত কর্মানি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্ন দর্শন
গ্রহ পীড়াসু চৌগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণয়াত্মম্'।

আশ্বিন মাসে শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। দেবী কিন্তু এখানে একা থাকেন না। মধ্যে দেবী শাকম্ভরী, সামনেই রয়েছেন গণপতি। ডানদিকে

যথাক্রমে রয়েছেন ভীমা ও ভ্রামরী। বাঁদিকে আছেন দেবী শতাক্ষী। একই দেবী ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন নামে এখানে পূজিতা হচ্ছেন।

দেবী শাকম্ভরী সম্পর্কে শ্রীশ্রী দুর্গা সপ্তশতিতে আছে—

'শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপল বিলোচনা
গম্ভীর নাভি ত্রিবলী বিভূষিত তনদুরী।"

বাংলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, শাকম্ভরী দেবীর আভা নীলবর্ণ, চোখ নীল পদ্মরাগের ন্যায়, গভীর নাভি এবং অতি সুন্দর ত্রিবলীযুক্ত সূক্ষ্ম কটিভাগ। দেবীর এক হাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল, অন্য হাতে বাণ ও নানাবিধ ফুল পল্লব, কন্দমূলাদি শাকসবজি। দেবীর দক্ষিণ দিকে আছেন ভীমা ও ভ্রামরী দেবী।

ভীমা দেবীর হাতে রয়েছে তলোয়ার, ডমরু ও পানপাত্র। তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে—

'ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রা দশন ভাসুরা
বিশাল লোচনা নারী বৃত পীত পয়োধরা'।।

ভ্রামরী দেবীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

'তেজো মণ্ডল দুর্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্ত ভূত
চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা'।।

ভ্রামরী দেবী মহামায়া নামে পরিচিতা। কথিত আছে, এই দেবীকে দর্শন করলে ব্রহ্মহত্যার পাপও দূর হয়।

দেবী শতাক্ষী, শীতলা নামে পরিচিতা।

শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে বীরখেত নামক জায়গায় দেবী চণ্ডী রক্তবীজকে দমন করে ভীমা ও ভ্রামরী নাম দিয়ে ঘোরতর যুদ্ধে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেন। পুরনো দিনের মানুষজন মনে করতেন, এই বীরখেত ময়দানেই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। রক্তবীজ বধের পরে পর্বতের চারদিক ঢেকে থাকা জঙ্গল থেকে ছুটে আসে দুই অসুর শুম্ভ ও নিশুম্ভ। তখন দেবতাদের সকলে দেবীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। ভূরাদেব (মহাদেব), তাঁর পাঁচ সঙ্গী মঙ্গল, চঙ্গল, বোরা, মানসিংহ ও ঝোড়াকে নিয়ে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের বজ্রবাণে একসময় ভূরাদেবের পাঁচ সঙ্গী পড়ে গেলে তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে একাই শত শত অসুরকে মেরে ফেলতে শুরু করলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ তখন ভূরাদেবকে লক্ষ্য করে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন 'জয় দেবী' বলে। অন্যদিকে দেবীর চক্র শুম্ভ ও নিশুম্ভকে দু'খণ্ড করে দিল। দেবী চণ্ডিকা অমৃতবারির সাহায্যে জাগিয়ে তুললেন ভূরাদেবকে। পাঁচ সঙ্গীও অমৃতের পরশে বলবীর্য ফিরে পেয়ে ওই জায়গাতেই দেবীর চরণে লীন হয়ে গেলেন। বলা হয়, যেখানে এই যুদ্ধ হয়েছিল সেইখানেই ভূরাবাবার মন্দির গড়ে উঠেছে। তাই প্রবাদ আছে, ভূরাবাবাকে দর্শন না করলে দেবী দর্শন সফল হয় না।

প্রাচীনকালে দুর্গম নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি এখানে দীর্ঘদিন তপস্যার পর ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে বর প্রার্থনা করে বলেন, তাঁর চারটি বেদ চাই এবং যুদ্ধে সে যেন অজেয় হতে পারে। তথাস্তু বললেন ব্রহ্মা। বুদ্ধিভ্রম হল দুর্গমের। চারটি বেদ লুকিয়ে রেখে সে ভীষণ উপদ্রব শুরু করল। একসময় দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করে দখল নিল স্বর্গরাজ্যের। বছরের পর বছর ধরে দেখা দিল অনাবৃষ্টি। দেবতা ও ব্রাহ্মণেরা বেদের তন্ত্রমন্ত্রের ক্রিয়াকর্ম ভুলতে শুরু করলেন। একসময় দেবতারা শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে এসে দেবী চণ্ডীকাকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করে বললেন, 'হে দেবী। যেভাবে তুমি চণ্ড, মুণ্ড, মহিষাসুর, রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছ, সেইভাবে দুর্গমকেও শাস্তি দাও। একশো বছর ধরে অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার মুখে। শুকিয়ে গেছে নদীনালা। তুমি আমাদের সবাইকে রক্ষা করো।'

দেবী শতচক্ষু হয়ে সহস্র ধারায় তাঁর করুণাবারি জলের আকারে বিতরণ করায় সারা পৃথিবীতে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল। আবার সুজলা, সুফলা হল পৃথিবী। দেবীর শরীর থেকে কন্দমূল প্রভৃতি শাক উৎপন্ন হল। তাই তাঁর এক নাম শতাক্ষী ও আর এক নাম শাকম্ভরী দেবী। যা আর এক অর্থে দেবী দুর্গার-ই প্রতিরূপ। তাই সংস্কৃত স্তব মন্ত্রে বলা হয়, 'শাকম্ভরী শতাক্ষী সা স এব দুর্গা প্রকীর্তিতাঃ'।

সাহারাণপুরের পথে 'বেহট' (বৃহৎবট) নামে বড় ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একসময়ে এখানে কিছুদিন ছিলেন। তিনি দেবীদর্শনে আসার পরে একটি মন্দির তৈরির ব্যবস্থা করেন। পরে কলিঙ্গ দেশের রাজবংশের সূর্যবংশীয় রাজপুত নরেশ পুণ্ডীর এখানে আসেন এবং দেবীতীর্থ থেকে পাঁচমাইল দূরে 'জসমোর স্টেটের' প্রবর্তন করেন। বিক্রমী সংবত ১৫১৫-তে রানা সাহেব প্রতাপ সিং বাহাদুর এই জসমোর স্টেটকে আরও উন্নতমানের করে গড়ে তোলেন। ১১২টি গ্রাম নিয়ে এই স্টেট গঠিত। ফলে সমগ্র অঞ্চলটি তীর্থক্ষেত্রের রূপ পায়। প্রায় ১২০০ বছর বংশপরম্পরায় এরাই সমগ্র অঞ্চলটির শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এই বংশের রানী ফুলদেবী স্বামী জীবনসিংহ-র সঙ্গে সহমরণে গিয়েছিলেন। সেই 'সতীবেদী' আজও আছে।

দেবীকে কেন্দ্র করে আরও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। উত্তরভারতে আনন্দপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে শ্যামদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুলেখনী। কিন্তু তাঁদের কোনও সন্তান ছিল না। সেইজন্য বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে সুলেখনীর কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না। দুঃখে দিন কাটছিল তাঁর। একদিন এক প্রতিবেশিনী তাঁকে বললেন, 'দুঃখ কোরো না। একসময় আমিও এই সমস্যায় পড়েছিলাম। তারপর আমার স্বামী উত্তরের পাহাড়ে দেবী শাকম্ভরীর শরণাপন্ন হন ও আমি পুত্রসন্তান লাভ করি। তুমিও দেবীর শরণ নিলে তাঁর কৃপা লাভ করবে। সন্তানের মা হতে পারবে।

পরদিনই সুলেখনী তাঁর স্বামীকে নিয়ে চললেন শাকম্ভরী তীর্থের দিকে। একসময় পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে 'জল জল' করে আর্তনাদ করতে লাগলেন। এমন সময় গভীর বনের

ভিতর থেকে কে যেন বলল, কষ্ট করে আর একটু গেলেই ঝরনা দেখতে পাবি। সেই ঝরনার জল পান করলে তোদের শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

এগিয়ে যেতেই তারা সেই ঝরনার সন্ধান পেল। সেখানে তখন অনেক সাধু-সন্ন্যাসী তপস্যা করছিলেন। এইভাবে পাঁচ-ছ'দিন দেবীর ধ্যানে মগ্ন থাকার পর দেবী শাকম্ভরী একটি নয়-দশ বছরের মেয়ের রূপ ধরে দেখা দিয়ে বললেন, আমিই দেবী শাকম্ভরী। তোরা যাঁর ধ্যান করছিস, আমিই সেই। কী চাস বল?

দু'জনেই বিহ্বল হয়ে বললেন, আমাদের কোনও সন্তান নেই। আমরা সন্তান চাইছি।

দেবী তখন বললেন, তা এইজন্য এত দূরে আসতে গেলি কেন? যে কোনও মাসের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী অথবা চতুর্দশীতে আমার ব্রত করলে ফল পাবি। যা ঘরে ফিরে যা। অবশ্যই ফল পাবি।

এক রাতে সুলেখনী স্বপ্ন দেখলেন দেবী তার ব্রতে প্রসন্ন হয়ে একটি ফল খেতে দিচ্ছেন। স্বপ্ন ভাঙার পর সত্যি সত্যিই তিনি একটি ফল পেলেন এবং সেটি খাওয়ার পর তাঁর গর্ভে সন্তান এল। তিনি পুত্রের মা হলেন। মা শাকম্ভরীর এইরকম আরও অনেক মাহাত্ম্য শোনা যায়। গোবিন্দপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে জয়বন্ত নামে জনৈক বৈশ্য বাস করত। সকলেই তাঁকে শেঠজি নামে সম্বোধন করত। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল শ্রীয়া। তাদের অনেক টাকা ছিল। কিন্তু কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। কন্যার অভাবে শ্রীয়া প্রায়শই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

একদিন শেঠজির সঙ্গে বাজারের মধ্যে একজন সাধুর দেখা হয়ে গেল। সাধু তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি এর উপায় বলে দেব। শেঠজি বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে সব কথা জানালেন।

অন্যদিকে শেঠজির এক ছেলে অত্যন্ত দুরাচারী হয়ে উঠেছিল। একদিন সে প্রচুর ধনরত্ন চুরি করে দেশত্যাগ করল।

স্বামী-স্ত্রী শরণাপন্ন হলেন সেই সাধুর। তিনি বললেন, তোমার ছেলে যে কাজ করেছে তার জন্য তোমার মঙ্গল হয়েছে। কারণ, ওইসব ধনরত্ন সৎ উপায়ে অর্জিত হয়নি। এবার তোমরা মা শাকম্ভরীর শরণ নাও। দেবী নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন। এই পাপার্জিত ধনক্ষয় হলেই ছেলে ঘরে ফিরে আসবে আর ব্রতের পুণ্যফলে এক পরমা সুন্দরী কন্যার জন্ম হবে।

সাধুর উপদেশমত শেঠ জয়বন্ত রায় এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীয়া, দেবীর ব্রত করে ছেলেকে ফিরে পান এবং শ্রীয়ার গর্ভে একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়।

এই সতীপীঠে উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুর হয়ে আসা যায়। দূরত্ব ২৬ মাইল। নিয়মিত বাস চলে। সাহারাণপুর চকরাতা রোড থেকে 'বেহট' হয়ে বনবিভাগের সমতল পথেও শাকম্ভরী আসা যায়। তবে এই পথে এলে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়। সঙ্গে চাল, ডাল নিয়ে আসা উচিত। তাহলে খাওয়ার কষ্ট হয় না।

কুরুক্ষেত্রে সাবিত্রী মা

কোনও কোনও বিদ্বজ্জনের মতে, শিব এবং শক্তি যেমন এক, পুরুষ ও প্রকৃতিও তেমনই এক এবং অভিন্ন। সেই কারণেই মাতৃশক্তির পাশেই বিরাজ করেন ভৈরবশক্তি। শৈব সাধকেরা এই শক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। তাঁদের মতে শিব যখন আত্মস্থ, তখন তিনি শিব। আবার যখন তিনি সপ্রকাশ, তখন তিনি শক্তি। শক্তি হল শিবের হৃদয়। এই জন্যই শিবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন কালী। শিবশক্তি সম্পর্কের এই অপার রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন বলেই তান্ত্রিক পদ্ধতিতে শক্তিপূজার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সূত্র ধরেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হয়েছিল তন্ত্রচূড়ামণি।

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলা হয়েছে,

'কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ
স্থানু নাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ'।।

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে সতীর গুল্‌ফ পড়েছিল। সেখানে সাবিত্রীরূপা দেবীর নাম স্থানু, ভৈরবের নাম অশ্বনাথ।

পীঠ নির্ণয় রচিত হয় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে উল্লিখিত আছে,

......কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ।
স্থানুর্নাম্না চ সাবিত্রী দেবতা....।।'

সেখানে বলা হয়েছে, ভৈরবের 'স্থানু'। দেবী বিরাজ করছেন সাবিত্রীরূপে।

বাঙালী কবি ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত 'অন্নদামঙ্গলে' বলেছেন,

'কুরুক্ষেত্রে ডানি পা'র গুল্‌ফ অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী, সংবর্ত্ত ভৈরব।।'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত শিবচরিতে বলা হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে পড়েছে সতীর ডান গুল্‌ফ। দেবীর নাম 'সম্বরী' বা 'বিমলা'।

ভৈরবের নাম 'সংবর্ত্ত'।

তবে তন্ত্রচূড়ামণিতে অন্য একটি ক্ষেত্রে 'স্থানু'কে তীর্থপতি বলা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত আছে,

'গুল্‌ফং মে চ কুরুক্ষেত্রে সাবিত্রী দেবতা তথা।
অশ্বনাথো ভৈরবশ্চ তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।।'

অর্থাৎ এখানে মহাপীঠের দেবী হলেন সাবিত্রী এবং ভৈরব হলেন অশ্বনাথ।

গ্রন্থকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে একান্নপীঠের তালিকায় বলেছেন, কুরুক্ষেত্রের দেবী হতে পারেন 'সম্বরী' বা 'বিমলা' মতান্তরে 'সাবিত্রী' এবং ভৈরব হতে পারেন 'সংবর্ত্ত' বা 'স্থানু'।

বিখ্যাত ভ্রমণ গবেষক সুলতান মামুদ পদব্রজে এই পুণ্যভূমি দর্শন করে এসেছেন। তাঁর মতে, সতীর দক্ষিণ গুল্‌ফ পড়েছে কুরুক্ষেত্রে। দেবীর নাম 'সাবিত্রী', ভৈরব 'স্থানু'। কেউ কেউ ভৈরবকে 'থানেশ্বর' নামে সম্বোধন করেন। শুদ্ধ নাম হল, 'স্থানীশ্বর' বা 'স্থানেশ্বর'। ভৈরব 'স্থানু' হলেন স্থানেশ্বরেরই দেবতা।

যেখানে নাদির শা পরাজিত করেছিলেন মোগলবাদশা মহম্মদ শাকে, সেই পাঞ্জাবের কারনালের জেলাই হল 'থানেশ্বর'। আগে এটি ছিল পাঞ্জাবে, বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত।

কুরুক্ষেত্র স্টেশন থেকে আনুমানিক এক ক্রোশ পশ্চিমে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে এই মহাপীঠ। বেদের ব্রাহ্মণভাগে এই তীর্থের নাম পাওয়া যায়। শতরূপ ব্রাহ্মণে আছে 'কুরুক্ষেত্রে হমী দেবা যজ্ঞং তন্বতে' (৪/১/৫/১৩)—এখানে দেবতারা যজ্ঞ করতেন। জাবালোপনিষদেও উল্লেখ করা হয়েছে, কুরুক্ষেত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্র। এটি হল, ব্রহ্মসদন ও দেবতাদের যজ্ঞভূমি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটি আর্য উপনিবেশের অন্যতম আদি স্থান। উত্তরে বয়ে চলেছে দৃশদ্বতী ও দক্ষিণে সরস্বতী। একদা এর মাঝের জায়গাটিকে ব্রহ্মর্ষি প্রদেশ বলা হত। বৈদিক দৃশদ্বতী নদী বর্তমানে ঘাঘরা নদী নামে পরিচিত। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে, সরস্বতী নদীর তটে স্বয়ং ব্রহ্মা বেদী স্থাপন করে প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। সেই সময় থেকে এই জায়গাটি পুণ্য ব্রহ্মবেদী হিসাবে পরিচিত।

মহাভারতের শল্য পর্বে বলা হয়েছে, কুরু নামে এক রাজর্ষি এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বয়ং হাতে চাষ করে একটি অনন্য যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। কুরুবাজার নাম থেকেই এই জায়গা কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জানা যায়, ব্রহ্মাসহ দেবতারা, মুনি ঋষি, সিদ্ধচারণ ও গন্ধর্বরা সবসময়েই এই তীর্থের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং সেবা করেছেন।

মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'হে রাজশ্রেষ্ঠ! তারপরে সর্বতোভাবে প্রশংসিত কুরুক্ষেত্রে যাবে। যেখানে দর্শনমাত্রেই সকল প্রাণী পাপ থেকে মুক্ত হয়। আমি কুরুক্ষেত্রে যাবো এবং কুরুক্ষেত্রে বাস করবো—এমন কথা যে সর্বদা বলে সেও পাপ থেকে মুক্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণাযুক্ত বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হয়ে পাপিষ্ঠ লোকেরও উত্তম গতি হয়ে থাকে। সরস্বতীর দক্ষিণ ও দৃশদ্বতীর উত্তরে এই কুরুক্ষেত্র স্থানে যারা বাস করে তারা স্বর্গে থাকে।'

কুরুক্ষেত্রের সমগ্র এলাকার মোট আয়তন কত? কারও কারও মতে, চুরাশি যোজন। হেমচন্দ্র বলেছেন, এখানকার আয়তন দ্বাদশ যোজন বা ৪৮ ক্রোশ। এখানকার মাটির রঙ লালচে। খুব শক্ত। স্থানীয় পাণ্ডাদের অনুমান, কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধ হওয়ার জন্য রক্তে মাটি লাল হয়ে গেছে। সমস্যা হল, এখানে তেমন কোনও ফসল হয় না। কারণ, জমি খুবই অনুর্বর।

ষড়বিংশতি শাক্তপীঠ হল, মনিবেদ—মতান্তরে কেউ বলেছেন, মণিবেদিক, আবার কারও মতে, মানবেদক। এ-বিষয়ে পীঠ নির্ণয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,

'....মণিবেদকে।
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্বানন্দস্তু ভৈরবঃ।।'

অর্থাৎ মণিবেদকে পড়েছে কব্জি, দেবীর নাম 'গায়ত্রী', ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'।

মণিবেদ সম্পর্কে কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অন্নদামঙ্গল লিখেছেন,

'মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থানু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর।।'

ভৈরবের নাম 'স্থানু', দেবীর নাম 'সাবিত্রী'। কিন্তু এই মণিবেদের জায়গাটি সম্পর্কে কোনও কিছু জানা যায় না। পীঠ নির্ণয়ে 'মণিবন্ধ' বলে কোনও শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় না, আছে 'মণিবেদক' বা 'মণিবেদ'।

থানেশ্বরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে একটি জায়গায় অভিমন্যু সপ্তরথী দ্বারা নিহত হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। এ প্রসঙ্গে কানিংহাম বলেছেন, অভিমন্যু ক্ষেত্রকেই সংক্ষেপে 'অমিন' বলা হয়। থানেশ্বরের আট মাইল পশ্চিমে 'ডোর' নামক জায়গায় অর্জুন সাত্যকিকে বাঁচানোর জন্য অন্যায়ভাবে ভুরিশ্রবার বাহু ছেদন করেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শনচক্র ধারণ করেছিলেন সেই জায়গাটি 'চক্রতীর্থ' নামে পরিচিত। যে জায়গায় কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে নিহত অসংখ্য বীরকে সৎকার করা হয়েছিল সেটি 'অস্থিপুর' নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পাণ্ডু বংশের শেষ রাজা ক্ষেমক নরপতি থাকার সময় পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধিকারে ছিল। পরে কান্যকুব্জাধিপতির দখলে আসে। বৌদ্ধযুগে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে স্থানেশ্বরে (থানেশ্বর) প্রভাকরবর্ধন রাজত্ব করতেন। এ-কথা জানা যায়, সমুদ্রগুপ্তের লৌহস্তম্ভের বর্ণনার মাধ্যমে। হিউ-এন-সাং কুরুক্ষেত্রে থানেশ্বর (মতান্তরে স্থানীশ্বর) দেখতে আসেন। তখনও থানেশ্বরের চারপাশের ১৬ ক্রোশ স্থান 'ধর্মক্ষেত্র' নামে অভিহিত হত। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন, কুরুক্ষেত্রে মৃত বীরদের অস্থি তিনি দেখেছেন। থানেশ্বরের আধমাইল উত্তরে 'স্থানু' নামে মহাদেবের মন্দির আছে। একাদশ শতকে অল্ বেরুণির দেওয়া তথ্যানুযায়ী এই তীর্থে বিশেষত 'গ্রহণ'-এর সময়ে অনেক যাত্রীরা আসতেন।

থানেশ্বরের পূর্ব-দক্ষিণে কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্তপঞ্চক তীর্থ নামে দ্বৈপায়ন হ্রদের

দূরত্ব আধমাইল দক্ষিণে। হ্রদের উত্তরদিকে বড় বড় অসংখ্য আমগাছ আছে। হ্রদটির দৈর্ঘ্য প্রায় আধ মাইল, চওড়ায় কম। দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫৪৬ ফুট, প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে ১৯০০ ফুট। এই হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দ্বীপ আছে। এরই নাম দ্বৈপায়ন হ্রদ।

এই দ্বীপের পশ্চিমদিকে 'চন্দ্রকূপ' নামে একটি পবিত্র কুণ্ড আছে। চন্দ্রগ্রহণের সময় এই কুণ্ডের পবিত্র জল স্পর্শ করার জন্য অনেকে এখানে আসেন। এর অপর নাম 'রামহ্রদ'। কথিত আছে, পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার পর হ্রদের জলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। এই হ্রদের তীরে বসে ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন বলে এর অন্য আরেক নাম 'ব্রহ্ম সরঃ'। ইন্দ্রের অনুরোধে দধীচি মুনি এখানে আত্মবিসর্জন করেন। তাই অনেকে এই জায়গাকে 'দধীচি তীর্থ' বলে অভিহিত করেন। এখানেই দুর্যোধন মায়া স্তম্ভ করে লুকিয়েছিলেন।

হ্রদের উত্তর ও পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি বাঁধানো ঘাট আছে। অনেকে এখানে পুজো ও শ্রাদ্ধাদির কাজ করেন। হ্রদের পাড়ে রয়েছে অনেক দেবদেবীর মন্দির। উত্তর পাড়ে রয়েছে ভৈরব অশ্বনাথ লিঙ্গের মন্দির। পশ্চিম পাড়ে রয়েছে পীঠেশ্বরী সাবিত্রী দেবীর মন্দির। ওপরে উঁচু মঠ। শিখদের অভ্যুদয়ের সময়ে কুরুক্ষেত্রে তীর্থ ও দেবমন্দিরগুলি পুনরুদ্ধার করা হয়।

মাধবাচার্যের 'কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্য' গ্রন্থ অনুযায়ী জানা যায়, কুরুক্ষেত্রের সীমার মধ্যে ৩৬৫টি তীর্থ আছে। থানেশ্বরের কাছে কন্যাদ্বার, সোমতীর্থ, দ্বৈপায়ন, রামতীর্থ-রামহ্রদ, স্থানীশ্বর পঞ্চবটী অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে, অমৃতকূপ, অগ্নিতীর্থ, অবানা সঙ্গম, ইন্দ্রবারি, কাম্যবন, কৌবের তীর্থ, কৌশলি সঙ্গম, দধীচি তীর্থ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্থ, যযাতিতীর্থ, বিষ্ণুপদতীর্থ।

দেবীপুরাণে (৩৭/৩০) উল্লেখ আছে, নিখিল অমরগণ যজ্ঞে সেই বিশুদ্ধভাব স্বরূপা দেবীকে পূজা করে থাকেন, তাই তাঁকে সকলে 'সাবিত্রী' বলেন। অগ্নিপুরাণে (২১৬/২) বলা হয়েছে, গায়মান গুরু যেহেতু শিষ্য, ভার্যা ও প্রাণ—সবাইকে ত্রাণ করেন, তাই তাঁর নাম 'গায়ত্রী'। যেহেতু তিনি সবিতাকে প্রকাশ করেন, তাই তার নাম 'সাবিত্রী'। বাক্‌রূপিনী বলে তাঁর অন্য নাম 'সরস্বতী'। স্কন্ধপুরাণের আবন্ত্য রেখাখণ্ডে (২০০/৩) বলা হয়েছে, এঁর তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্যসদৃশ, তাই তিনি সাবিত্রী।

অগ্নিপুরাণের ব্রাহ্মণ প্রশংসা নামাধ্যায়ে আছে, তিনি সর্বলোক প্রসব করেন, তাই তিনি হলেন 'সবিতা'। এই সবিতা যাঁর দেবতা, তিনিই সাবিত্রী বা যিনি নিখিল বেদ প্রসব করেছেন, পণ্ডিতেরা তাঁকেই সাবিত্রী আখ্যা দেন।

দেবী ভাগবতে (৯/৩৮/৯৫) আছে, যিনি সূর্যমণ্ডলাত্মক সবিতার অধিদেবী, যিনি গায়ত্রী মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি বেদের প্রসবকর্ত্রী, তিনিই 'সাবিত্রী' নামে চিহ্নিত হয়ে আছেন। সেখানে আরও বলা হয়েছে, সৃষ্টির সময়ে পরাপ্রকৃতি দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা—এই পঞ্চমূর্তিতে আবির্ভূত হন। সাবিত্রী চার বেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ সমূহের

মাতৃস্বরূপা। তিনি ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিরূপিণী, জপরূপা ও তাপসী। তিনি ব্রহ্মণ্য তেজ ও সর্বপ্রকার সংস্কারস্বরূপা। তিনি ব্রহ্মার প্রিয়া পবিত্ররূপা সাবিত্রী ও গায়ত্রী। তীর্থগণও আত্মশুদ্ধির জন্য তাঁর স্পর্শ প্রার্থনা করে। স্বয়ং নারায়ণ সাবিত্রী প্রসঙ্গে নারদকে বলেছেন,

'শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কশা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী।
পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী।।
পরমব্রহ্মস্বরূপা চ নির্বাণপদদায়িনী।
ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তি স্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।।

তাঁর বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের মতো, তিনি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপিণী। তিনি পরমানন্দস্বরূপিণী, সর্বশ্রেষ্ঠা ও সনাতনী। তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপিণী ও মুক্তিপদ প্রদায়িনী। তিনি ব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও ব্রহ্মতেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্না হয়ে সাবিত্রী তাঁকে পতিরূপে বরণ করেন। মদ্রদেশের মহারাজা অশ্বপতি এই স্তব পাঠ করে সাবিত্রী দেবীর দর্শন ও অভীষ্ট বর পেয়েছিলেন। দেবী ভাগবতে আছে, স্বয়ং নারায়ণ, নারদকে বলেছেন, বেদমাতা সাবিত্রীকে প্রথমে ব্রহ্মা, পরে দেবগণ ও তারপরে জ্ঞানীরা পুজো করেন। তারও পরে ভারতবর্ষে মহারাজ অশ্বপতি তাঁর অর্চনা করেন। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার বর্ণের মানুষজন তাঁকে পুজো করেন।

রাজা অশ্বপতির স্ত্রী মালতী ছিলেন বন্ধ্যা। মুনিবর বশিষ্ঠর পরামর্শে তিনি সাবিত্রীর আরাধনা করেন। দীর্ঘদিন আরাধনার পরেও যখন কোনও ফল হল না, তখন মহারাজ পুষ্করতীর্থে গিয়ে একশো বছর সংযত মনে তপস্যা করতে থাকেন। একসময় আকাশবাণী হয় দশলক্ষ বার গায়ত্রী জপ করতে। ওই সময় মহর্ষি পরাশর সেখানে উপস্থিত হয়ে, মহারাজকে গায়ত্রী জপের বিধি, সাবিত্রী জপবিধি, সাবিত্রী ব্রত বিধি, সাবিত্রীর ধ্যান ও স্তব সম্পর্কে উপদেশ দেন। অশ্বপতি অক্ষরে অক্ষরে সেই বিধি অনুযায়ী জপে মগ্ন হন। একসময় তিনি দেবীর দর্শন লাভ করেন এবং সাবিত্রী'র মতো কন্যারত্ন লাভ করেন। 'সাবিত্রী'র নামানুসারে মেয়ের নাম রাখেন সাবিত্রী। এই সাবিত্রীই এ-জগতে সত্যবানের স্ত্রী হিসাবে পরিচিত।

সাবিত্রীর ধ্যানে বলা আছে, 'যাঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনতুল্য, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিতা, যাঁর প্রভা গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালীন সহস্র সহস্র সূর্যের মতো, যাঁর মুখমণ্ডল মৃদুহাস্যে ভরা ও প্রসন্না, যিনি রত্নবসনে ভূষিতা, যিনি বহ্নি বিশোধিত বস্ত্র পরিহিতা, যিনি ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য সাকার মূর্তি ধারণ করেন, যিনি সুখ ও মুক্তিদায়িনী, যিনি শান্তা, যিনি জগতের বিধানকর্তা ব্রহ্মার ভার্যা, যিনি সর্বসম্পদরূপিণী এবং সর্বসম্পদ প্রদায়িকা, যিনি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও বেদশাস্ত্ররূপিণী, সেই বেদবীজ অর্থাৎ প্রাণস্বরূপা বেদমাতা সাবিত্রীকে ভজনা করি।'

সাবিত্রী উপনিষদে সবিতা ও সাবিত্রীকে শিবশক্তি, পুরুষ প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, অগ্নিই সবিতা, পৃথিবীই সাবিত্রী। তাঁরা এক মিথুন। তাঁদের মিলনেই সৃষ্টি। আবার বলা হয়েছে, বরুণই সবিতা, জল সাবিত্রী। বায়ু সবিতা, আকাশ সাবিত্রী। যজ্ঞ হল সবিতা আর ছন্দ হল সাবিত্রী। এইভাবে উভয়ের মিলনে যে সৃষ্টি হয়েছে তাই প্রতিভাত হয়েছে বিশ্বমঞ্চের আঙ্গিনায়।

যে স্থানে 'কুরু' 'কুরু' অর্থাৎ 'কর' 'কর' রব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাকেই বলে কুরুক্ষেত্র। মানুষের প্রবৃত্তি সর্বদা মানুষকে কর্মে নিযুক্ত করে। তাই মানবদেহকে যৌগিক কথায় কুরুক্ষেত্র বলে। সেইজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনক্ষেত্র হল মানুষের দেহ বলে চিহ্নিত করা হয়।

প্রণব বা সাবিত্রী হলেন আকর্ষণ শক্তি, নিবৃত্তি বা আত্মাভিমুখী শক্তি। আত্মশক্তি দেহের পঞ্চকোষে পাঁচভাগে বিভক্ত। তাদের বলে পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চপাণ্ডব হল পঞ্চ প্রাণ। তার মধ্যে যে অংশের মধ্যে প্রাণ, তার মধ্যেই জীবের আত্মশক্তি পূর্ণভাবে বিরাজিত। তাই জীবাত্মাকে অর্জুন বলে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রাম হল মনের সঙ্গে প্রাণ বা হৃদয়ের যুদ্ধ। জীব তার সংস্কারের জন্য প্রাণশক্তি স্রোতকে অবরুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু জীবের সংস্কাররূপ আবরণের মধ্যে নিজের যে প্রাণশক্তি আছে তার সাহায্যেই বিরাট প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করে। মন বা প্রবৃত্তি তা করতে দেয় না। প্রাণশক্তির আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়ে মানসিক বৃত্তি ফুলে ওঠে। অবশেষে এই জৈব মনের অবরোধ ভেঙে যায়। বিশ্বজননীর প্রাণশক্তিতে মিলিত হবার চেষ্টাকেই বলা হয়, কুরু পাণ্ডবের মহাসমর। তাই এই কুরুক্ষেত্রেই আছেন সাবিত্রী মা, যিনি বেদ মাতা এবং প্রণব।

যাতায়াতের ব্যবস্থা ঃ

দিল্লি থেকে আম্বালা জংশনের মধ্যে কুরুক্ষেত্র রেল স্টেশন। দূরত্ব ১৫৬ কিলোমিটার। চণ্ডীগড়। দিল্লি, আম্বালার সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগাযোগ আছে।

থাকার ব্যবস্থা

পূর্ত বিভাগের বিশ্রাম ভবন, থানেশ্বর (পিপলি) বিশ্রামভবন, বিড়লা ধর্মশালা, আগরওয়ালা ধর্মশালা, কালী কমলীওয়ালা ধর্মশালা, ভারত সেবাশ্রম ধর্মশালায় থাকা যায়। ইদানীং তৈরি হয়েছে কিছু আধুনিক রুচিসম্মত হোটেল।

বৈদ্যনাথধামে হৃদয় পড়েছে সতীর

পীঠনির্ণয়ের মতে সপ্তম সতীপীঠ হল বৈদ্যনাথধাম। সেখানে বলা হয়েছে,

'হার্দ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ
দেবতা জয়দুর্গাস্যা.......'

বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘর আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত জায়গা। দেওঘর কথার অর্থ দেবতার ঘর, যাকে হিন্দিতে বলা হয় দেওতা কি ঘর। শিবক্ষেত্র হিসেবেই এই জায়গার খ্যাতি। পুরাণে বলা হয়েছে, রাবণ শিবের খুবই ভক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত শিবপুজো করতেন। রাবণের শিবপুজো দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন শিব। বললেন, রাবণ, তুমি বলো কি বর চাও? প্রত্যুত্তরে রাবণ বললেন, তাহলে চলুন আমার সঙ্গে লঙ্কায়। শিব বললেন, তথাস্তু। যেখানে নামাবে, সেখানেই আমি থাকব স্থির হয়ে। যাত্রাপথে নামাতে পারবে না কোথাও। শর্ত মেনে নিলেন রাবণ। রাক্ষসরাজ মাথায় নিয়ে চললেন শিবকে। তা দেখে দেবতারা তো চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে শিবকে লঙ্কায় নিয়ে চলে যাবে রাবণ!

রাবণ যখন শিবকে মাথার ওপর তুলতে যাচ্ছেন, তখন পার্বতীর পরামর্শে আচমন করেছিলেন। সেই আচমনের সময় বরুণদেব ঢুকে পড়লেন রাবণের পেটে। ফলে হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। বৈদ্যনাথধামে পৌঁছানোর মুহূর্তে প্রসাব পেয়ে গেল রাবণের। রাবণ তো ভেবে অস্থির। কি করবে এখন! এমন সময় ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে এসে দাঁড়ালেন বিষ্ণু। রাবণের ধারণা হল, ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে প্রসাব করা যেতে পারে। তাহলে আর শর্ত অনুযায়ী মাটিতেও নামানো হল না। ব্রাহ্মণের হাতে শিবকে দিয়ে রাবণ প্রসাব করতে গেলেন। কিন্তু প্রসাব আর শেষ হয় না। এদিকে শিবকে মাটিতে রেখে বিষ্ণু চলে গেলেন।

প্রসাব সেরে শৌচ করে এসে রাবণ দেখলেন ব্রাহ্মণ শিবকে মাটিতে রেখে কোথায় চলে গেছেন। অনেক টানাটানি করেও শিবকে মাটি থেকে ওঠাতে পারলেন না রাবণ। স্তব, স্তুতি করেও কোনও ফল হল না। অগত্যা শিবের স্নানের জন্য একটা কুয়ো তৈরি করে রাবণ চলে গেলেন লঙ্কায়।

পুরাণের মতে, সেই থেকেই শিব রয়েছেন বৈদ্যনাথধামে। অনেকদিন তিনি পড়েছিলেন

গভীর অরণ্যে। সেখানে বৈজু নামে একজন গোয়ালা থাকত। শিব একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি এই জঙ্গলে পড়ে আছি। তুমি আমার পুজো করো।' বৈজু খুঁজে বের করলেন শিবকে। ফলমূল দিয়েই তিনি পুজো করেন তাঁর আরাধ্য দেবতাকে। পাত্রের অভাবে তিনি মুখে করে জল এনে দেন শিবকে, যা দেবাদিদেবের একেবারেই পছন্দ নয়। অথচ বৈজুর অপরাধ নিতে পারেন না। কারণ, তাঁর মনে কোনও পাপ নেই। বাধ্য হয়ে মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিলেন রাবণকে। রাবণ তখন পঞ্চতীর্থের জল এনে শিবের অভিষেক করলেন। বাকি জল ঢেলে দিলেন কুয়োর মধ্যে। সেই থেকে এই পবিত্র জলেই শিবের পুজো হয়।

বৈজুর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন শিব। বৈজু বললেন, আমার কোনও অভাব নেই। কি চাইব? একান্তই যদি বর দিতে চান তবে তা যেন এমন হয়, আপনার পুজোর আগে আমার নাম সবাই করে। রাবণের আরাধ্য দেবতা হিসেবে এখানে শিবের নাম হয় রাবণেশ্বর আর তারপর দেবাদিদেবের নাম হয় বৈজুনাথ, যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয় বৈদ্যনাথে।

যেখানে রাবণের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শিবকে বসানো হয়েছিল সেখানেই সতীর হৃদয় পড়েছে। তাই এটি শুধুমাত্র শৈবপীঠ নয়, শাক্তপীঠও। ভৈরবের নাম বৈদ্যনাথ, সতীর নাম জয়দুর্গা।

পূর্বরেলের ট্রেনে করে জসিদি চলে গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে, টাঙ্গা বা অন্যান্য যানবাহনে যেতে পারেন বৈদ্যনাথধামে। শিবগঙ্গায় স্নান করে দেবীদর্শন করার রীতি রয়েছে।

পঞ্চসাগরে বারাহী

পীঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে চৌত্রিশ স্থানে উল্লিখিত আছে এই পীঠস্থানের কথা। সেখানে বলা হয়েছে, 'অধোদন্ত মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে'। কথিত আছে, এখানে দেবীর অধোদন্ত পঙ্ক্তি পড়েছে। দেবী নাম 'বারাহী' এবং ভৈরবের নাম 'মহারুদ্র'। শিবচরিতে দেবীর বর্ণনা করা একাদশ পীঠ হিসেবে। তন্ত্রচূড়ামণিতে এর কোনও উল্লেখ নেই। দেবীভাগবত, কুব্জিকা তন্ত্রেও পঞ্চসাগরের কোনও উল্লেখ নেই।

ভারতচন্দ্র তাঁর লেখা অন্নদামঙ্গলে বলেছেন,

'পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্তসার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তাঁর।।'

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, বাস্তবে পঞ্চসাগর কোনও সাগর নয়। ছোটো ছোটো পাঁচটি কুণ্ড। এবং হরিদ্বারের কাছেই এই পীঠস্থান। অন্য মতে, মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের তিন কিলোমিটার দূরে কোটিতীর্থের কাছে পঞ্চনদীর সঙ্গমে যে মন্দির আছে সেখানেই দেবীর অধোদন্ত পড়েছে। গৌড়ীতন্ত্রের পরিশিষ্টে এর উল্লেখ আছে। কাহিনীর মাধ্যমে জানা যায়, বিরাট নাম্নী দেবী অভিশপ্তা হয়ে দেব হ্রদ নামে এক তীর্থ পরিবেষ্টন করে পূর্বদিকে বিরাজ করছেন। সেখানে নাকি সারাদিন-রাত সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। অর্থাৎ এই জায়গাটি দেশের পূর্বদিকে ওড়িশাতেও হতে পারে। ভিন্নমতের মানুষজনের মতে, জায়গাটি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে।

উজ্জয়িনীতে মঙ্গলচণ্ডিকা

পীঠনির্ণয়ের মতে ত্রয়োদশ শক্তিপীঠ আছে উজ্জয়িনীতে। সেখানে বলা হয়েছে,

'উজ্জয়িন্যাং কূর্পরশ্চ মাঙ্গল্য কপিলাম্বর।
ভৈরব সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা॥'

অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে ভৈরব হলেন কপিলাম্বর এবং দেবী হল মঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডিকা।

ইতিহাস এবং সাহিত্যে বারবার স্থান করে নিয়েছে উজ্জয়িনী। একদা অবন্তী বা পশ্চিম মালবের রাজধানী এখানে ছিল। বর্তমানে এই জায়গার নাম উজ্জইন। স্থান পশ্চিম ভারতের গোয়ালিয়রে। এখানে ভৈরবের নাম মহাকাল। বলা হয়, ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হলেন তিনি। কারও কারও মতে, এখানকার পীঠদেবীর নাম হরসিদ্ধি। তিনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের আরাধ্যা দেবী। মহাকাল মন্দিরের কাছে রুদ্রসাগরের তীরে হরসিদ্ধি দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে দেবীর কোনও প্রাকৃত মূর্তি নেই, শ্রীখণ্ডীকে প্রতীকী হিসেবে পুজো করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, অতি প্রত্যুষে নাকি সদ্য মৃত্যু হওয়া মানুষের ভস্ম শ্মশান থেকে সংগ্রহ করে মহাকালের গায়ে লেপন করা হয়।

তন্ত্রবচনের নানা পাঠান্তর আছে—কেউ বলেন, উজ্জয়িন্যাং কূর্পরশ্চ। আবার কেউ বলেন, উজ্জন্যাং কূর্পরশ্চৈব। এছাড়া কারও ভাষায়, উর্জয়িন্যাং কুপরশ্চ।

অন্নদামঙ্গলে বলা হয়েছে,

'উজানীতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥''

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'দূরে বহুদূরে
স্বপ্নালোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদীপারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে,

তনুদেহে রসম্বর নীবীকন্দে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধাআধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।
মহাকাল মন্দিরের মাঝে—
তখন গম্ভীর মন্ত্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা,
অন্ধকার হর্ম্য 'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।'

ভারতচন্দ্র উজ্জয়িনী না বলে 'উজানী' বলেছেন। এই উজানী বর্ধমান জেলার কোগ্রামে অবস্থিত। এখানেই জন্মেছেন মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত শ্রীমন্ত সদাগর। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

এই জায়গাটির বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, 'Am (ANNADA MANGAL) seems to refer to Ujani or Kogram in the Burdwan District, although Ujjaini (modern Ujjain) in the early list of pithas must be identified with famous city or Avanti or West Malwa, now lying in Gwalior state in West India'.

প্রচলিত আছে, উজানীতে সতীর কফোনি বা কনুই পড়েছে। পীঠদেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাশ্বর।

শিবচরিতেও উল্লেখ আছে, এখানে দেবীর কনুই পড়েছে।

কেতকাদাস ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে উজানীর উল্লেখ আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' বইতে এই সতীপীঠের ঠিকানা দেওয়া আছে কোগ্রাম।

কুনুর ও অজয়ের সংযোগস্থলে রয়েছে কোগ্রাম। সহানীয় বাসিন্দারা দেবীকে বলেন সর্বমঙ্গলা। মন্দির রয়েছে অজয় নদের তীরে। দেবী দশভুজা সিংহবাহিনীর মূর্তিটি অষ্টধাতুর। দেবীর বাঁদিকে আছেন ভৈরব কপিলাশ্বর। লিঙ্গমূর্তি পাথরে তৈরি। কোনও গৌরীপট্ট নেই। দুর্গাপুজোর সময় এখানে খুব বড় একটি মেলা বসে। ভৈরবের পাশে রয়েছে একটি ভাঙা বুদ্ধমূর্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সম্ভবত পাল যুগের।

অনেক পণ্ডিতের মতে, 'ওড্ডিয়ান মঙ্গলকোট'-এর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হল এই উজানী। এখানে শক্তিতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের এক ব্যতিক্রমী সম্মেলন ঘটেছে।

চৈতন্যদাস রচয়িতা লোচনদাসের বাড়ি এই গ্রামে। অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বাইরে বাইরে কাটানোর পর যখন তিনি শ্বশুরবাড়িতে আসেন তখন ঠিকমতো পথ চিনতে পারেননি। পথে এক যুবতীকে তাঁর শ্বশুরের নাম জিজ্ঞেস করে বলেন, মা ওখানে যাবার পথ বলে দিতে পারো? যুবতীর নির্দেশিত পথে তিনি শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছান। রাতে স্ত্রীকে দেখে চমকে ওঠেন। কারণ, সকালে তাকেই মা বলে ডেকেছেন। পরের দিন সকালেই

তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। ক্ষুব্ধ স্ত্রী লোচনের গ্রামের নাম দেন কু-গ্রাম। লোচনদাস একটু পরিবর্তন করে নাম দেন, কোগ্রাম।

বর্ধমান থেকে বাসে নূতন হাটে যাওয়া যায়। তারই প্রান্তে বয়ে চলেছে ছোট্ট কুনুর নদী। খেয়াতে নদী পার হলেই কোগ্রামে যাওয়া যাবে। এছাড়া গুসকরা স্টেশন থেকে উজানীর দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার।

অমরনাথে শাক্তপীঠ

পীঠনির্ণয়ের মতে চতুর্থ সতীপীঠ রয়েছে অমরনাথে। সেখানে বলা হয়েছে,

কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরব।
মহামায়া ভগবতী গুণবতীত বরপ্রদা।।

অর্থাৎ কাশ্মীরে পড়েছে সতীর কণ্ঠ। দেবীর নাম মহামায়া, ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর। সমুদ্রতল থেকে ১২৭২৯ ফুট উঁচুতে রয়েছে অমরনাথ গুহা। তুষারলিঙ্গের পাশে ছোট্ট ডিম্বাকৃতি যে বরফপিণ্ড আছে তিনিই হলেন মহামায়া। শ্রাবণী পূর্ণিমায় হাজার হাজার যাত্রী দর্শন করেন অমরনাথকে। একই সঙ্গে দর্শন করেন দেবী পার্বতীকে।

ষোড়শ শতাব্দীতেও ধারণা ছিল না, অমরনাথ একটি শাক্তপীঠ।

আবুল ফজল তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, 'মহামায়াকে লোকে বলে শিবের পত্নী। ... তাঁর সেই বিখণ্ডিত দেহখণ্ডগুলি ছড়িয়ে আছে দেশের চার অংশে। মস্তিষ্ক ও অন্যান্য কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়েছে কামরাজের কাছে উত্তর কাশ্মীরের পর্বতশীর্ষে। লোকপ্রবাদে অঙ্গের এই অংশগুলিকেই শারদা বলা হয়।'

শারদার আধুনিক নাম শার্দি। শারদা পরিচিতা শক্তি হিসেবেও। এই পথ অতি দুর্গম। সোপোর হয়ে গেলে শ্রীনগর যাবার পথ প্রায় ৯০ মাইল। সেখানকার পাহাড়ে থাকেন সঙ্কর জাতের মানুষ। গণেশগিরি বা গণেশঘাটি হল শারদাপীঠের আসল নাম। বৌদ্ধ কাশ্মীরের চিন্তাধারা পাল্টানোর উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য প্রথম এই তীর্থে এসেছিলেন। কথিত আছে, শারদামন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করলে দেবী নাকি তাঁকে সেখানে ঢুকতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, শঙ্করাচার্য যৌনজ্ঞান লাভের জন্য এক মৃত রাজার দেহের মধ্যে ঢুকে নারী সঙ্গম করেছিলেন।

কাশ্মীরের পণ্ডিতেরা শারদা মণ্ডলেই শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তর্কসভার আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁকে যুক্তিতর্কে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়নি। তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা। তর্কে জয়লাভ করে শঙ্করাচার্য কাশ্মীরকে বৌদ্ধ প্রভাব থেকে মুক্ত করেন।

পুরাণে বলা হয়েছে, কাশ্মীরের শারদা বনে শাণ্ডিল্য মুনি ত্রিশক্তি রূপে শারদা'র দর্শন

পেয়েছিলেন। শোনা যায়, শঙ্করাচার্যও শারদাপীঠের গহ্বর থেকে আবির্ভূতা সরস্বতী, শক্তি এবং দুর্গার সম্মিলিত রূপ দেখেছিলেন।

মূল শারদামন্দিরটি প্রাকারবেষ্টিত। মন্দিরের পিছনে উঁচু পাহাড় থেকে একটা ঝর্না এসে নিচে পড়েছে, যার নাম অমরকুণ্ড। প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথের সম্পর্কে অতীতে কারও কোনও ধারণা ছিল না। বর্তমানে পশ্চিম দিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়।

ঐতিহাসিক কল্‌হনের মতে, এই মন্দিরের বয়স দু'হাজার বছরেরও বেশি। শারদা মা'র নামের ওপর ভিত্তি করে কাশ্মীরের আর একটি নাম শারদাস্থান।

মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই। আছে একটি চতুষ্কোণ সিঁদুর লেপা শিলা। এই শিলা কষ্টিপাথর নয়, রুক্ষ। কয়েক ইঞ্চি পুরু। একসময় সেখানেও মূর্তি ছিল। অল্‌বিরুণী তাঁর বিবরণীতে বলেছেন, 'মহাসিন্ধুনদের পথে বোলর গিরিশ্রেণীর মধ্যে এক দারুমূর্তি, শারদা-সরস্বতী।' কাশ্মীরের একজন কবি বিল্‌হন একাদশ শতাব্দীতে শারদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজহংসেশ্বরীর মতো সুবিশাল মূর্তির পিছনে আছে স্বর্ণমণ্ডিত চালচিত্র। মধুমতী-গঙ্গার স্বর্ণরেণুকণায় বিধৌত সেই মূর্তি। তিনি জ্যোতির্ময়তা বিকীর্ণ করছেন বিশ্বভুবনের দিকে। স্ফটিক স্বচ্ছতায় নিত্য তিনি উজ্জ্বল।'

বৃন্দাবনে পড়েছে দেবীর কেশজাল

পীঠনির্ণয়ের মতে দ্বাত্রিংশৎ সতীপীঠ রয়েছে বৃন্দাবনে। পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে—

'বৃন্দাবনে কেশজাল মুমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ।।'

অর্থাৎ বৃন্দাবনে পড়েছে সতীর কেশজাল। দেবীর নাম 'উমা' এবং 'ভূতেশ'। এই পীঠ সম্পর্কে অন্যত্র ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। যেমন—

'বৃন্দাবনে কেশজালে কৃষ্ণনাথস্তু ভৈরব
কাত্যায়নী তত্র দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।'

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন,

'কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ।।'

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্থান হিসেবে বৃন্দাবনের পরিবর্তে দিয়েছেন কেশজালের নাম।

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে, 'বৃন্দাবন' হচ্ছে অন্যতম শাক্তপীঠস্থান। কিন্তু শিবচরিতে বৃন্দাবনকে 'কেশজাল' বললেও উপপীঠের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বৃন্দাবনে উমার মন্দির আছে যমুনার তীরে। 'কেশীঘাট'-ই সেই পীঠস্থান। উমাবনের কাছেই আছে উমার মন্দির।

বৃন্দাবন শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে? ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, রাধার অনেক বৃন্দ বা সখী ছিল, যা থেকে বৃন্দাবন নামটি এসেছে। অন্য মতে, কেদাররাজের কন্যা বৃন্দা এখানে তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন বলে এই জায়গার নাম হয়েছে বৃন্দাবন।

এই বৃন্দারই অপর নাম তুলসী, যিনি ছিলেন রাজা শুশধ্বজের মেয়ে।

পুরাণে বৃন্দাবনকে নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রজধামে তখন নানান সমস্যা চলছে। কৃষ্ণের মন্ত্রণায় নন্দরাজা ব্রজধাম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা নাকি এক রাতে এই জায়গাটি তৈরি করেন। মথুরা থেকে মাইল দশেক দূরে বৃন্দাবনের অবস্থান। এখানে যে কত বন তার সঠিক কোনও হিসেব নেই। শোনা যায়,

এখানে আছে দ্বাদশ বন, দ্বাদশ উপবন, দ্বাদশ প্রতিবন, দ্বাদশ অধিবন, দ্বাদশ সেবাবন, দ্বাদশ তপোবন, দ্বাদশ মোক্ষবন, দ্বাদশ কামবন, দ্বাদশ অর্থবন, দ্বাদশ ধর্মবন ও দ্বাদশ সিদ্ধিবন।

বৃন্দাবনের মদনমোহনের মন্দির। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণদাসের গল্প। প্রবাদ আছে, কৃষ্ণদাস যখন পণ্যবোঝাই করে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কালিয়দহ ঘাটের কাছে বালির চরে তাঁর নৌকা আটকে যায়। তিন দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও যখন নৌকা নড়ানো গেল না, তখন তিনি শরণাপন্ন হলেন কৃষ্ণদাস সনাতন গোস্বামীর। সনাতন গোঁসাই তাঁর একমাত্র আরাধ্য মদনমোহনের কাছে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য শরণাপন্ন হলেন। নৌকা সচল হল। তাই ফেরার পথে কৃষ্ণদাস অর্জিত সব অর্থ দিয়ে দিলেন মদনমোহনের মন্দির তৈরির জন্য।

আকবরের সভাসদ রায়সিংহ তৈরি করান বৃন্দাবনের গোপীনাথের মন্দির। ভাঙা মন্দিরটি নতুন করে সারানোর ব্যবস্থা করেছেন নন্দকুমার বসু।

রায়সিংহের বড় ভাই লোনকরণ তৈরি করিয়েছেন যুগলকিশোরের মন্দির। আর রাধাবল্লভজীর মন্দির তৈরি করিয়েছেন বৈষ্ণব কবি সুরদাস।

কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির আর শ্রীরঙ্গজীর মন্দির তৈরি করিয়েছেন যথাক্রমে লালাবাবু আর শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ।

কংসকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তার নাম বিশ্রান্তিঘাট, নন্দের কন্যা যোগনিদ্রাকে কংস যে ঘাটে আছড়ে ছিলেন তার নাম যোগঘাট, কালিয়নাগের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেখান থেকে জলে নেমেছিলেন তার নাম কালিয়দমন ঘাট। এগুলি আক্ষরিক অর্থে বৃন্দাবনের অন্যতম আকর্ষণ।

বংশীতটের ছায়ায় কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন। আর অক্ষয় বট—তার জন্ম কবে তা কারও জানা নেই।

নিকুঞ্জ বন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের জ্বলন্ত সাক্ষী। আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধারানী তখন কৃষ্ণের ভজনায় মত্ত। কালীভক্ত আয়ান। একজন গ্রামবাসী তাকে গিয়ে বলল, আয়ান দাদা তোমার রাধা নিকুঞ্জ বনে। ছুটে গেলেন স্বচক্ষে দেখবেন বলে। আয়ান দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণের দুই রূপ—অর্ধেক কালী, অর্ধেক কৃষ্ণ।

ছোট একটা মন্দির আছে বৃন্দাবনে। রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছেন দুই সখী—ললিতা ও বিশাখা। সন্ধ্যাবেলা আরতির পরে একঘটি জল আর দাঁতন সাজিয়ে রেখে পাণ্ডারা দরজা বন্ধ করে দেন। রাতে সেখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই। সকালে মন্দিরের দরজা খুললে দেখা যায়, শয্যার ব্যবহারের চিহ্ন তো রয়েছেই, কেউ দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে গেছে।

বিরহময় অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ অক্রুরঘাট। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,

'একদিন অক্রুর ঘাটের উপরে।
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে—
এই ঘাটে অক্রুর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক গোলক দর্শন পাইল॥
এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥
দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥

দেবর্ষি নারদ হাজির হলেন কংসের কাছে। কথায় কথায় জানালেন, রোহিণীর পুত্র বলরামই দেবকীর সপ্তম সন্তান। দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হয়নি। যশোদার পুত্র নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। বসুদেব কংসের ভয়ে নিজের ছেলেকে যশোদার কাছে রেখে, তাঁর মেয়েকে এনে কংসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কংস তখনই বসুদেবকে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু নারদ অনেক বুঝিয়ে কংসকে শান্ত করেন। কংস বসুদেবকে প্রাণে না মেরে তাঁকে সস্ত্রীক কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তারপর বলরাম ও কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কেশীদৈত্যকে বৃন্দাবনে পাঠান।

কেশীদৈত্য বৃন্দাবনে এসে অশ্বমূর্তি নিয়ে ভীষণ চিৎকার করে ব্রজবাসীদের ভয় দেখাতে লাগল। একদিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার সামনে এসে যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। কেশী পদাঘাত করল কৃষ্ণকে। কিছুই হল না। তারপর মধুসূদন তার পা দুটি ধরে কয়েকবার শূন্যে ঘুরিয়ে তাকে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। জ্ঞান হারাল কেশী। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে প্রচণ্ড বড় হাঁ করে কৃষ্ণকে গিলে খেতে এল। কৃষ্ণ তাঁর মুখের ভিতর বাঁ হাতটি ঢুকিয়ে দিলেন। দমবন্ধ হয়ে কেশী মারা গেল। সেই কেশীবধের স্মরণে জায়গাটি কেশীঘাট নামে চিহ্নিত। এখানেই পড়েছে দেবীর কেশজাল। এই জায়গাটি বৃন্দাবনের সবচেয়ে বড় ঘাট।

৪৫০

আজমীরে পড়েছে সতী'র মণিবন্ধ

ষড়বিংশতি শাক্তপীঠ হল; মণিবেদিক, আবার কারও মতে মানবেদক। পীঠনির্ণয়ের মতে,

'... মণিবেদকে।
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্বানন্দস্তু ভৈরবঃ।।'

বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়, মণিবেদকে পড়েছে সতী'র কব্জি (মণিবন্ধ), দেবীর নাম 'গায়ত্রী', ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ'।

মণিবেদ সম্পর্কে ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন,

'মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।
স্থাণু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর।।'

তিনি বলতে চেয়েছেন, 'মণিবেদ' নামক স্থানে সতীর মণিবন্ধ পড়েছে। ভৈরবের নাম 'স্থাণু', দেবীর নাম সাবিত্রী।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই পীঠের নাম দিয়েছেন 'মণিবন্ধ'। তিনি লিখেছেন,

'মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।
সর্বানন্দ ভৈরব, গায়ত্রী দেবী নাম।।'

যার অর্থ হল, সতীর বাম মণিবন্ধ পড়েছে মণিবন্ধে। ভৈরবের নাম 'সর্বানন্দ', দেবীর নাম 'গায়ত্রী'। প্রশ্ন হচ্ছে, জায়গাটি কোথায়? কারও কারও মতে, মণিবেদকের 'মণি' আছে, মণিপুরে। কিন্তু মণিবেদকের মণিবন্ধের ঠিকানা হল, রাজস্থানের আজমীরে। এখানে পুষ্কর হ্রদের পাড়ে আছে সাবিত্রী পাহাড়। মাটি থেকে পুষ্কর হ্রদের উচ্চতা হল ১৫৩৯ ফুট। সেখানেই দেবীর অবস্থান।

পুষ্কর তীর্থ হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ। কাছেই রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ আজমীর শরিফ।

ঈশ্বরের কি বিচিত্র রূপ। একদিকে রয়েছেন ভৈরব সর্বানন্দ, আর দেবী সাবিত্রী। মাঝখানে পুষ্কর। বহু হিন্দু পুণ্যার্থী এখানে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। তারপরই রয়েছে আজমীর শরিফ। যেখানে প্রার্থনা করার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমান মানুষজন একত্রিত হন। সাবিত্রী মন্দির আর পুষ্কর হ্রদকে ঘিরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণিমা অবধি মেলা বসে। থাকার জন্য অনেক বিশ্রামাগার, টুরিস্ট লজ আছে। যানবাহনের ব্যবস্থা বিশেষ অপ্রতুল নয়। সরাসরি দিল্লি থেকে এখানে যাওয়ার জন্য অনেক গাড়ি পাওয়া যায়।

